আশুরা ও কারবালা

বিষয়ক

প্রশ্নোত্তর

আশুরা ও কারবালা বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

মূল ফারসি : লেখকবৃন্দ

অনুবাদ : আবদুল্লাহ

মোঃ আনিসুর রহমান

মোঃ মোজাফফর হোসেন

মোঃ রফিকুল ইসলাম

মোঃ ফয়সল বারী

আবুল কাসেম

সম্পাদনাঃ এ কে এম আনোয়ারুল কবীর

প্রকাশনায় :

আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সংস্থা, ইরান ও বাংলাদেশ ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদ, ইরান।

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৬

Ashura O Karbala bishayak Prosnottor, Writer: A Group Of Writers, Translated into Bengali from Persian by Abdullah, Md. Anisur Rahman, Md. Mozaffor Hossain, Md. Rofiqul Islam, Md. Faysal Bary and Abul Kasem, Editor: A. K. M. Anwarul Kabir;publisher: World Assembly of Ahl-ul-Bayt & Bangladesh Islamic Cultural Association, Iran;Printed on January 2016.

আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সংস্থার মুখবন্ধ

মহানবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের (আ.) রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারটি তাঁদেরই প্রবর্তিত মতাদর্শে সংগৃহীত ও সঞ্চিত হয়েছিল এবং তাঁদের অনুসারীরা সেটিকে বিনাশ হতে রক্ষা করেছিলেন। এ মতাদর্শে ইসলামের সকল শাখা ও বিভাগের সমন্বয় ঘটেছে। তাই এটি ইসলামের একটি সামগ্রিক রূপ। এ মতাদর্শ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ও সত্য গ্রহণে প্রস্তুত অগণিত হৃদয়কে প্রশিক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিল যারা এর প্রবহমান জ্ঞানের সুপেয় পানির ধারা হতে দু'হাত ভরে গ্রহণ করেছে। এটি সেই ধারা যা ইসলামী উম্মাহকে আহলে বাইত (আ.)- এর পদাঙ্কানুসারী অনেক মহান মনীষী উপহার দিয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যখনই ইসলামী ভূখণ্ডের অভ্যন্তর ও তার বাইরের বিভিন্ন ধর্মমত ও চিন্তাধারার পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন ও নবচিন্তার উদ্ভব ঘটেছে তাঁরা তার বলিষ্ঠ জবাব ও সমাধান দিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সংস্থা, কোম, ইরান তার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই নবুওয়াতী মিশনের পবিত্র সত্য- সঠিক রূপ ও সীমার প্রতিরক্ষাকে তার অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছে যা সবসময়ই ইসলামের অমঙ্গলকামী বিভিন্ন দল, মত ও চিন্তাধারার আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। বিশেষভাবে এক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য ছিল আহলে বাইতের পবিত্র আদর্শিক পথ ও তাঁদের মতাদর্শের অনুসারীরা যারা এ শত্রুদের আক্রমণ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার আকাঙ্ক্ষায় সবসময়ই সামনের সারিতে থেকেছে এবং সবযুগেই কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রেখেছে।

এ বিশেষ ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের (আ.) মতাদর্শে প্রশিক্ষিত আলেমদের অর্জিত অভিজ্ঞতামালায় পূর্ণ গ্রন্থসমূহ সত্যিই অদ্বিতীয়। কারণ, এগুলোর শক্তিশালী জ্ঞানগত ভিত্তি রয়েছে যা বুদ্ধি ও যুক্তিভিত্তিক প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সকল প্রকার অন্যায় গোঁড়ামি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে দূরে। এ চিন্তাধারা সকল বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাবিদের প্রতি এমন আহ্বান রেখেছে যা যে কোন বুদ্ধিবৃত্তি ও সুস্থ বিবেকই মেনে নেয়।

আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সংস্থা নতুন পর্যায়ে অর্জিত এ অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার হতে সত্যানুসন্ধানীদের জন্য বিভিন্ন আলোচনা ও লেখা প্রকাশের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ নিয়েছে। এ সংস্থা এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ ও এ সম্পর্কিত গবেষণা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে আহলে বাইতের অনুসারী বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের মূল্যবান লেখা হতে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়াও তা যেন সত্যানুসন্ধানীদের জন্য সুপেয় পানির উৎস হয় সে ব্রতও নিয়েছে। এতে রাসূলের আহলে বাইতের মহান মতাদর্শ কর্তৃক বিশ্ববাসীর জন্য যে মহাসত্য উপস্থাপিত হয়েছে তা সত্যাকাঙ্ক্ষীদের কাছে প্রকাশিত হবে। বুদ্ধিবৃত্তির অনুপম পূর্ণমুখিতার ও হৃদয়সমূহের দ্রুত পরস্পর সংযুক্তির এ যুগে তা আরও ত্বরান্বিত হবে নিঃসন্দেহে।

আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সংস্থা এ গ্রন্থের অনুবাদদেরসহ এটি প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

আশা করছি এ গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে মহান প্রতিপালকের- যিনি তাঁর রাসূল (সা.)কে হেদায়াত ও সত্যদ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন যাতে সকল দ্বীনের ওপর ইসলামকে বিজয়ী করেন এবং সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট- পক্ষ হতে আমাদের ওপর অর্পিত মিশনের গুরুদায়িত্বের কিছু অংশ পালনে সক্ষম হয়ে থাকব।

সাংস্কৃতিক বিভাগ

আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সংস্থা

প্রথম অধ্যায় ইতিহাস ও জীবনী :

এক নজরে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলন [১]

মদীনার শাসক ওয়ালীদের পক্ষ থেকে এজীদের জন্য বাইআতের আহবানঃ	শুক্রবার, ২৭ রজব, ৬০ হিজরি।
ওয়ালীদের সাথে ইমাম হোসাইন (আ:)- এর দ্বিতীয় সাক্ষাতঃ	শনিবার ২৮ রজব, ৬০ হিজরী।
মদীনা থেকে ইমাম হোসাইন (আ:)- এর বহির্গমনঃ	শনিবার ২৮ রজব, ৬০ হিজরী (রাতে)।
ইমামের মক্কায় প্রবেশঃ	বৃহস্পতিবার (রাতে), ৩শাবন, ৬০ হিজরী।
মক্কায় অবস্থান :	৪ মাস, ৫ দিন।
মুসলিমের মক্কা থেকে যাত্রা:	সোমবার, ১৫ রমজান, ৬০ হিজরী।
মুসলিমের শাহাদাত :	মঙ্গলবার, ৮ জিলহজ্ব , ৬০ হিজরী।
মক্কা থেকে ইমামের বহির্গমন :	মঙ্গলবার, ৮ জিলহজ্ব , ৬০ হিজরী।
কারবালায় ইমামের প্রবেশ :	শুক্রবার, ৩ মুহাররাম, ৬১ হিজরী।
করবালায় উমর- বিন- সাদের প্রবেশ	শুক্রবার, ৩ মুহাররাম, ৬১ হিজরী।
উমর- বিন- সাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ও ইমামের সাথে কথোপকথন:	৩- ৬ মুহাররাম, ৬১ হিজরী।
ইমামের সঙ্গীদের জন্য পানি সরবরাহ বন্ধ :	মঙ্গলবার ৭ মুহাররাম, ৬১ হিজরী।
ইমামের বাহিনীর উপর প্রথম হামলা :	বৃহস্পতিবার, ৯ মুহাররাম, ৬১ হিজরী।
কারবালার ঘটনা :	শুক্রবার, ১০ মুহাররাম, ৬১ হিজরী।
কারবালা থেকে আহরে বাইতের (আ.) বন্দীদের বহির্গমন :	শনিবার, ১১ মুহাররাম, ৬১ হিজরী, জোহর নামাজের পর।

মুয়াবিয়ার শাসনামলে আন্দোলন না করার কারণ

১ নং প্রশ্ন : কেন ইমাম হোসাইন (আ.) মুয়াবিয়ার শাসনামলে আন্দোলন করেননি ?

উত্তর : ইমাম হোসাইন (আ.) ৫০ হিজরি থেকে ৬১ হিজরি পর্যন্ত ১১ বছর ইমামতের দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে ১০ বছর মুয়াবিয়ার শাসনামলে অতিবাহিত হয়। ঐ সময় ধরে তার সঙ্গে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। এ দ্বন্দ্বের কতগুলো নমুনা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর বিভিন্ন চিঠিতে লক্ষ্য করা যায়। ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁর চিঠিতে মুয়াবিয়ার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডগুলো (যেমন আল্লাহর রাসূলের সাহাবী আমর ইবনে হামেক ও হুজর ইবনে আদীকে হত্যা) তুলে ধরে মুসলমানদের ওপর মুয়াবিয়ার শাসনকে 'বড় ফিতনা' হিসেবে উল্লেখ করেন।[২] আর এভাবে ইমাম হোসাইন (আ.), মুয়াবিয়ার খেলাফতের বৈধতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলেন। ইমাম হোসাইন (আ.) মুয়াবিয়ার সাথে জিহাদ করাকে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল মনে করতেন। এছাড়া তিনি মনে করতেন, যদি কেউ তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তাকে অবশ্যই ইস্তিগফার করতে (আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে) হবে।[৩] কিন্তু এরপরও ইমাম হোসাইন (আ.) কেন মুয়াবিয়ার শাসনামলে আন্দোলন করেননি তার কতগুলো কারণ ইমাম হোসাইন (আ.)- এর বক্তব্যে পাওয়া যায়। যদি আমরা ঐ কারণগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই, তাহলে আমাদেরকে এ বিষয়ে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করতে হবে।

এক : মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধিচুক্তি

ইমাম হাসান (আ.)- এর সাথে মুয়াবিয়ার যে সন্ধিচুক্তি হয়েছিল, ইমাম হোসাইন (আ.) মুয়াবিয়ার কাছে দেয়া চিঠিতে সেই সন্ধিচুক্তির প্রতি তাঁর নিবেদিত থাকার কথা বলে তাঁর বিরুদ্ধে তা লঙ্ঘন করার যে অভিযোগ মুয়াবিয়া তুলেছিল তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[৪] কিন্তু প্রশ্ন হলো, মুয়াবিয়া যেখানে কুফায় প্রবেশ করার পর সন্ধিচুক্তির কালি শুকানোর আগেই তা লঙ্ঘন করেছিল এবং তার প্রতি নিবেদিত থাকা তার জন্য আবশ্যক নয় বলে ঘোষণা দিয়েছিল[৫] সেখানে কেন ইমাম হোসাইন (আ.) সন্ধিচুক্তি মেনে চললেন?

এ প্রশ্নের উত্তর কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেয়া যেতে পারে :

ক. যদি আমরা মুয়াবিয়ার বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে বুঝতে পারব যে, সে সুস্পষ্টভাবে সন্ধিচুক্তি লঙ্ঘনের কথা বলেনি। কারণ, সে বলেছিল : 'আমি হাসানকে কতগুলো বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছি।' আর হতে পারে সে যে ওয়াদার কথা বলেছে তা সন্ধিচুক্তির বহির্ভূত কোন বিষয় ছিল যার প্রতি নিবেদিত থাকা মুয়াবিয়ার মতে আবশ্যক ছিল না। আর অন্তত এর ভিত্তিতে সে অজুহাত দেখাত যে, তার পক্ষ থেকে সন্ধিচুক্তি লঙ্ঘিত হয়নি।

খ. রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেও ইমাম হোসাইন (আ.) এবং মুয়াবিয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ ছিল, ঠিক যে রকম তফাৎ ইমাম আলী (আ.)- এর সাথে মুয়াবিয়ার ছিল।

আসলে মুয়াবিয়া এমন একজন রাজনীতিবিদ ছিল, যে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে কোন অন্যায়- অবিচার, [৬] প্রতারণা ও ছল- চাতুরির

আশ্রয় নিত। এসব প্রতারণার কতক নমুনা ইমাম আলী (আ.)- এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়েও দেখা যায়। যেমন উসমানের রক্তকে বাহানা হিসেবে তুলে ধরা, তালহা এবং যুবায়েরকে ইমাম আলী (আ.)- এর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা, সিফফিনের যুদ্ধে বর্শার মাথায় কুরআন শরীফ তুলে ধরা এবং ইমাম আলী (আ.)- এর খেলাফতের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন শহরে অতর্কিত হামলা চালিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করা।

অপর দিকে ইমাম হোসাইন (আ.) এমন এক পবিত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সত্যের পরিপন্থী কোন পথে অগ্রসর হতেন না। যেভাবে ইমাম আলী (আ.) বলেছিলেন : 'আমি জোর- জবরদস্তি করে বিজয়ী হতে চাই না।'[৭]

অতএব, এটা স্বাভাবিক যে, ইমাম হাসান (আ.) মুয়াবিয়ার সাথে যে চুক্তি করেছিলেন ইমাম হোসাইন (আ.) কোনক্রমেই তা লঙ্ঘন করতে পারেন না। এমনকি মুয়াবিয়া তা লঙ্ঘন করলেও ইমামের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।

গ. অবশ্যই আমাদেরকে ঐ সময়ের অবস্থা বিবেচনা করে দেখতে হবে। আর এটাও দেখতে হবে যে, ইমাম যদি সন্ধির খেলাফ কাজ করতেন তাহলে কী ঘটত? কারণ, ঐ সময় মুয়াবিয়া মুসলমানদের একচ্ছত্র খলীফা ছিল। আর তার শাসনব্যবস্থা সিরিয়া থেকে শুরু করে

মিশর, ইরাক, আরব উপদ্বীপ ও ইয়েমেন তথা গোটা মুসলিম বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রতিটি এলাকাতে তার অনুচর ও দালালরা তার খেলাফতের বৈধতার পক্ষে জোর প্রচারণা চালাতো। এহেন পরিস্থিতিতে ইমামের পক্ষে সন্ধিচুক্তি লঙ্ঘন করা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না।

মুয়াবিয়া, হযরত আলী (আ.)- এর সাথে দ্বন্দ্বের সময় সিরিয়াবাসীদের কাছে নিজেকে উসমান দরদী এবং তাঁর খুনের একমাত্র দাবিদার (প্রতিশোধ গ্রহণকারী) হিসেবে তুলে ধরেছিল। যদিও উসমান হত্যার ঘটনায় সে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে কোন সাহায্যই করেনি।[৮] অতএব, এটা সুস্পষ্ট যে, ঐ সময় কেউ তার সঙ্গে মোকাবিলা করার সাহস করত না। এ পরিস্থিতিতে যদি ইমাম হোসাইন (আ.) সন্ধিচুক্তি লঙ্ঘন করতেন, তাহলে মুয়াবিয়া তাঁকে মুসলিম সমাজে চুক্তি লঙ্ঘনকারী ও বিদ্রোহী হিসেবে পরিচিত করাতো এবং উম্মাহর চিন্তাধারাকে তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করাতো। আর ঐ পরিস্থিতিতে ইমামের আহ্বান মুসলিম জাতির কাছে পৌঁছত না। ইমাম এবং তাঁর সাথিরা এ সময় মুয়াবিয়াকে প্রথম সন্ধি লঙ্ঘনকারী হিসেবে পরিচিত করানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা এতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

দুই. মুয়াবিয়ার শক্তিশালী অবস্থান

ঐ সময় মুয়াবিয়ার ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশেষ করে সিরিয়াবাসীদের কাছে তার জনপ্রিয়তা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করাটাকে কঠিন করে তুলেছিল। কারণ, সিরিয়াবাসী তাকে নবীর সাহাবা, ওহী লেখক এবং 'মুসলমানদের মামা' মনে করত। তাদের দৃষ্টিতে, সিরিয়া ও দামেশকে ইসলাম প্রচারে মুয়াবিয়ার ভূমিকাই ছিল মূখ্য।

এছাড়া মুয়াবিয়া একজন ধূর্ত রাজনীতিবিদ ছিল। আর তার বয়সও ইমাম হাসান ও হোসাইন (আ.) থেকে বেশি ছিল। এজন্য সে সবসময় ইমামদের কাছে দেয়া চিঠিতে এ দুটি বিষয় উল্লেখ করত এবং নিজেকে খেলাফতের জন্য বেশি উপযুক্ত মনে করত।[৯] অতএব, এটা স্বাভাবিক যে, ইমাম হোসাইন (আ.) সন্ধি লঙ্ঘন করলে মুয়াবিয়া ইমাম হোসাইন (আ.)- এর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগত।

তিন. মুয়বিয়ার রাজনৈতিক কূটচাল ও ধূর্ততা

সন্ধির পর যদিও মুয়াবিয়া বনি হাশেম, বিশেষ করে ইমাম আলী (আ.)- এর পরিবারকে কোণঠাসা করার জন্য সকল প্রকার প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিল, এমনকি বিষ প্রয়োগ করে ইমাম হাসান (আ.)- কে শহীদ করেছিল, [১০] কিন্তু সে বাহ্যত মানুষদের দেখাত যে, নবী- বংশের বিশেষ করে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সঙ্গে তার সুসম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মুয়াবিয়া প্রতি বছর এবং প্রতি মাসে ইমাম হাসান (আ.), ইমাম হোসাইন (আ.) এবং আবদুল্লাহ বিন জাফরের জন্য প্রচুর পরিমাণে উপঢৌকন পাঠাত। আর তারাও যেহেতু নিজেদেরকে বায়তুল মালের হকদার মনে করতেন তাই ঐসব উপঢৌকন গ্রহণ করতেন এবং উপযুক্ত জায়গায় সেগুলো খরচ করতেন।[১১]

মুয়াবিয়া নিজেকে নবীর পরিবারের ভক্ত হিসেবে দেখানোর জন্য মৃত্যুর সময়ে স্বীয় পুত্র ইয়াযীদকে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর ব্যাপারে অসিয়ত করেছিল যে, যদি ইমাম আন্দোলন করেন তাহলে যেন তাঁকে হত্যা করা না হয়।[১২]

মুয়াবিয়ার এ রকম রাজনীতির উদ্দেশ্য ছিল সুস্পষ্ট। কারণ, সে ইমাম হাসান (আ.)- এর সাথে সন্ধি করে নিজের খেলাফতকে বৈধতা না থাকার সংকট থেকে মুক্তি দান করে এবং মানুষের মাঝে নিজেকে বৈধ খলীফা হিসেবে পরিচিত করায়। আর সে চাইত না যে, ইমাম হোসাইন (আ.)- কে হত্যা করার মাধ্যমে সে মুসলিম সমাজে ঘৃণিত হোক। এর বিপরীতে সে চেষ্টা করত যে, নবীপরিবারের প্রতি লোকদেখানো ভালোবাসা প্রদর্শন করার মাধ্যমে মুসলমানদের কাছে নিজের সুনাম বজায় রাখা।

আর সে ভাবত যে, এভাবে সে নবীর বংশধরদের নিজের প্রতি ঋণী করছে। ফলে তারা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে তার অনুগত হয়ে যাবে এবং তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা থেকে বিরত থাকবে। একবার সে ইমাম হাসান (আ.) এবং ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কাছে বিপুল পরিমাণে উপঢৌকন পাঠিয়ে খোঁটা দিয়ে বলেছিল, ‘এ উপহারগুলো গ্রহণ কর, আর জেনে রাখ যে, আমি হিন্দার ছেলে। খোদার শপথ, এর আগে কেউ তোমাদেরকে এ রকমভাবে দান করেনি। আর আমার পরেও কেউ তোমাদেরকে এভাবে দান করবে না।’

ইমাম হোসাইন (আ.) মুয়াবিয়াকে দেয়া চিঠিতে তার উপঢৌকনগুলো যে করুণা প্রদর্শনের যোগ্যতা রাখে না তা উল্লেখ করে বলেছেন : 'খোদার শপথ, তোমার আগের এবং পরের কোন লোকের পক্ষে আমাদের থেকে

শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত কোন ব্যক্তির কাছে উপহার পাঠানো সম্ভব নয় (কেননা, নবুওয়াতের গৃহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন গৃহ নেই)।'[১৩]

মুয়াবিয়া জানত যে, সে যদি কঠোর নীতি গ্রহণ করে, তাহলে পরিস্থিতি তার প্রতিকূলে চলে যাবে। পরিশেষে মানুষ মুয়াবিয়ার শাসনের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠবে। আর স্বাভাবিক ভাবেই মুসলিম সমাজ আহলে বাইতের পাশে একত্র হবে।

ঐ সময়ে মুয়াবিয়া ইমাম হোসাইন (আ.)- এর পক্ষ থেকে বিপদের সম্ভাবনা আঁচ করত না। কিন্তু ভবিষ্যতে যেহেতু নবী- পরিবারের পক্ষ থেকে কোন বিপদ না আসতে পারে এজন্য এ রকম কলা- কৌশল অবলম্বন করে চলত যাতে অঙ্কুরেই বিপদের বীজ বিনাশ হয়ে যায়।

অপর দিকে ইমাম হোসাইন (আ.) মুয়াবিয়ার খেলাফতকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলার জন্য প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগাতেন। এর সুস্পষ্ট নমুনা হলো মুয়াবিয়াকে লেখা চিঠিতে মুয়াবিয়ার সৃষ্ট বেদআত ও তার কৃত অপরাধের বিবরণ তুলে ধরা[১৪] এবং যুবরাজ হিসেবে ইয়াযীদের মনোনয়নের বিরোধিতা করা। [১৫] অবশ্য ইমাম হোসাইন (আ.) ভালো করেই জানতেন যে, যদি তিনি মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তাহলে সাধারণ মানুষ মুয়াবিয়ার রাজনৈতিক কলা- কৌশলের কারণে তাঁর সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিবে না। উপরন্তু সরকারি অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে মুয়াবিয়াকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করবে।

চার. তৎকালীন সময়ের মুসলমানদের চিন্তাগত ও সামাজিক অবস্থা

যদিও একদল কুফাবাসী ইমাম হাসান (আ.) শহীদ হওয়ার পর সমবেদনা জ্ঞাপন করে ইমাম হোসাইন (আ.)- কে চিঠি লিখেছিল এবং নিজেদেরকে ইমামের নির্দেশের অপেক্ষাকারী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল[১৬], কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.) ভালোভাবেই জানতেন যে, সিরিয়ায় মুয়াবিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কুফা শহরও উমাইয়া গোষ্ঠীর হাতে চলে গিয়েছে। এছাড়া

কুফাবাসী ইমাম আলী (আ.) ও ইমাম হাসান (আ.)- এর সাথে অনেকবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। যখন সমগ্র ইসলামী ভূখণ্ডের ওপর মুয়াবিয়ার প্রভাব- প্রতিপত্তি বহাল হয়েছে তখন যদি তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তাহলে পরাজয় ছাড়া অন্য কিছু ঘটবে না। আর যে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য তাঁর সাথে রয়েছে তারাও অযথা নিহত হবে এবং তিনি বিদ্রোহী হিসেবে পরিচিত হবেন। পরিশেষে তিনি কোন ফলাফল ছাড়াই শহীদ হবেন এবং তাঁর রক্ত বৃথা যাবে। কিন্তু ইয়াযীদের শাসনামলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ এর বিপরীত ছিল।

মদীনায় বিদ্রোহ না করার কারণ

২ নং প্রশ্ন : কেন ইমাম হোসাইন (আ.) মদীনায় তাঁর আন্দোলন শুরু করেননি?

উত্তর : এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদেরকে ঐ সময়ের পরিবেশ- পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ, ইমাম হোসাইন (আ.) যখন মদীনায় ছিলেন, তখনও মুয়াবিয়ার মৃত্যুর খবর চারিদিকে ছড়ায়নি। এছাড়া মানুষ তখন পর্যন্ত মুয়াবিয়া এবং ইয়াযীদের খেলাফতের মধ্যে খুব একটা তফাৎ বুঝতে পারেনি। কারণ, যদিও বিশেষ কিছু ব্যক্তি, যেমন ইমাম হোসাইন (আ.), আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আবদুর রহমান বিন আবু বকর ইয়াযীদকে শরাবখোর এবং কুকুর ও বানর নিয়ে খেলাকারী হিসেবে জানতেন[১৭], তথাপি অধিকাংশ মানুষ মুয়াবিয়ার অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে অথবা উমাইয়া গোষ্ঠীর প্রলোভন ও হুমকির মুখে মুয়াবিয়ার জীবদ্দশায়ই তার ছেলে ইয়াযীদের হাতে বাইআত করেছিল। [১৮]

এছাড়া সমর্থকের দৃষ্টিতেও স্থান হিসেবে মদীনা আন্দোলন করার জন্য খুব একটা উপযুক্ত ছিল না। কারণ :

এক. যদিও মদীনায় অধিকাংশ মানুষ আহলে বাইতকে ভালোবাসত, তথাপি তাদের ভালোবাসা এ পর্যায়ে ছিল না যে, আহলে বাইতের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবে কিংবা কোন ক্ষতি স্বীকার করবে। আর তারা এর নমুনা খুব ভালোভাবে সকীফা এবং পরবর্তী ঘটনায় দেখিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় হলো হযরত আলী (আ.) যখন বাইআত ভঙ্গকারীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য

মদীনাবাসীদের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন, তখন তাদের অধিকাংশই হযরত আলী (আ.)- এর ডাকে সাড়া দেয়নি। ফলে হযরত আলী (আ.) চারশ'[১৯] অথবা সাতশ'[২০] সৈন্য নিয়ে বিরোধী দলের কয়েক হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

দুই. মহানবী (সা.)- এর ইন্তেকালের পর মদীনাবাসীরা তৎকালীন খলীফার অনুগত ছিল। তারা খলীফা আবু বকর ও উমরের এতই ভক্ত ছিল যে, নবীর সুন্নাতের পাশাপাশি উক্ত দুই খলীফার সুন্নাতের প্রতি খুবই স্পর্শকাতরতা দেখাতো। যেমন এ দলের প্রতিনিধি আবদুর রহমান বিন আউফ, উমরের গঠিত শুরা'য় (খলিফা মনোনয়ন পরিষদ) উক্ত দুই খলিফার সুন্নাত অনুসরণ করাকে হযরত আলী (আ.)- এর খলীফা হওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আলী (আ.) এ শর্ত মেনে নেননি। [২১] হযরত আলী (আ.) যখন খলীফা হন তখন তাঁর খলীফা হওয়ার পেছনেও মদীনাবাসীদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না; বরং বিভিন্ন শহর থেকে আগত মুসলমানরাই প্রথম হযরত আলী (আ.)- কে খলীফা করার জন্য চাপ দিয়েছিল।

তিন. ঐ সময়ে মদীনায় কুরাইশ বংশের বিভিন্ন শাখার বিশেষ করে উমাইয়া শাখার মারওয়ান ও তার অনুগতদের প্রভাব ছিল খুব বেশি। আর এটা সুস্পষ্ট ছিল যে, ইমাম হোসাইন (আ.) যদি আন্দোলন শুরু করতেন, তাহলে তারা দ্রুত তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিত।

চার. ঐ সময়ে মদীনার জনসংখ্যা খুব কম ছিল। অপর দিকে কুফা, বসরা ও সিরিয়ার জনসংখ্যা ছিল খুবই বেশি। এজন্য মদীনায় অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে একটা বড় আন্দোলন শুরু করা সহজ ছিল না।

পাঁচ. ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য মদীনা খুব একটা উপযুক্ত জায়গা ছিল না। কারণ যেসব বিদ্রোহ এ শহরে সংঘটিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি পরাজয়ের শিকার হয়েছে। যেমন- ৬৩ হিজরিতে মদীনাবাসী ইয়াযীদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেছিল, তা কঠোর হস্তে দমন করা হয়। [২২] একই রকম ভাবে ১৪৫ হিজরিতে[২৩] মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহর (নাফেস যাকিয়া) আন্দোলন ও ১৬৯ হিজরিতে[২৪] হোসাইন বিন আলী (ইবনে হাসান মুসাল্লাস ইবনে হাসান মুসান্না ইবনে হাসান ইবনে আলী- যিনি শহীদে ফাখ বা ফাখের শহীদ

নামে প্রসিদ্ধ) আন্দোলনে মদীনার অল্পসংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করার কারণে দুটি আন্দোলনই পরাজয়ের শিকার হয়।

ছয়. উমাইয়া শাসনামলে মদীনাবাসী দেখিয়েছিল যে, তারা কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে এবং আহলে বাইতের পক্ষে অবস্থান নিতে রাজী নয়। এর প্রমাণ হলো মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে হযরত আলী (আ.)- কে গালি- গালাজ করার যে রীতি চালু হয়েছিল মদীনাবাসী তার কোন প্রতিবাদ করেনি; বরং এ শহরের প্রত্যেকটা মসজিদে মিম্বারের ওপর বসে হযরত আলী (আ.)- কে গালি- গালাজ করা হতো। আর মদীনাবাসী মুয়াবিয়ার এ অন্যায় কর্মকে চোখ বুঁজে সহ্য করত। শুধু ইমাম হোসাইন (আ.) এটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন, কিন্তু কেউ তাঁকে সহযোগিতা করত না। [২৫]

সাত. মদীনা শহরে উমাইয়া গভর্নর ওয়ালীদ বিন উতবার খুব প্রভাব ছিল। এজন্য একটা ছোট- খাট আন্দোলনের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা তার হাত থেকে কেড়ে নেয়া সম্ভব ছিল না।

মক্কায় গমন

৩ নং প্রশ্ন : কেন ইমাম হোসাইন (আ.) আন্দোলনের শুরুতেই মদীনা থেকে মক্কা গেলেন?

উত্তর : ইয়াযীদ মদীনার গভর্নর ওয়ালীদ বিন উতবার কাছে চিঠি লিখে নির্দেশ দিয়েছিল যে, বিরোধীদের কাছ থেকে যেন বাইআত নেয়া হয়। আর বাইআত ব্যতিরেকে তাদেরকে যেন ছাড়া না হয়। [২৬]

ওয়ালীদ চেয়েছিল ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সাথে নরম ব্যবহার করতে এবং তাঁর রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত না করতে। [২৭] কিন্তু মদীনায় বসবাসকারী উমাইয়া গোষ্ঠী বিশেষ করে মারওয়ান বিন হাকাম, যে ছিল ওয়ালীদের প্রধান উপদেষ্টা সে ওয়ালীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করলো যে, ইমাম হোসাইন (আ.)- কে যেন হত্যা করা হয়। প্রথম ওয়ালীদ যখন ইয়াযীদের চিঠি পেল, তখন সে মারওয়ানের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলো। মারওয়ান বলল : ‘আমার মত হলো, এ মুহূর্তে আলোচ্য ব্যক্তিদেরকে যেন হাজির করা হয় এবং ইয়াযীদের পক্ষে আনুগত্যের শপথ নেয়ার জন্য

বাধ্য করা হয়। আর যদি তারা বিরোধিতা করে তাহলে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর খবর জানার আগেই যেন তাদেরকে হত্যা করা হয়। কারণ, তারা যদি মুয়াবিয়ার মৃত্যুর খবর জানতে পারে, তাহলে তারা প্রত্যেকে বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের বিরোধিতার কথা প্রকাশ করবে এবং মানুষকে নিজেদের চারপাশে একত্র করবে।'[২৮]

অতএব, ইমাম হোসাইন (আ.) মদীনার পরিস্থিতি ভালো না থাকায় নিজের বিরোধিতার কথা প্রকাশ এবং আন্দোলন শুরু করার জন্য মদীনা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। আর মদীনায় বিপদের আশঙ্কা থাকায় সেখানে কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকেন। আর মদীনা ত্যাগের সময় ইমাম হোসাইন (আ.) যে আয়াত তেলাওয়াত করেছিলেন তা থেকে বোঝা যায়, তাঁর মদীনা ত্যাগের গুরুত্বপূর্ণ করণ ছিল নিরাপত্তার অভাব।

আবু মিখনাফের মতে, ইমাম হোসাইন (আ.) ২৭ রজব অথবা ২৮ রজব স্বীয় আত্মীয় স্বজনকে সাথে নিয়ে মদীনা ত্যাগের সময় সেই আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলেন যা মূসা (আ.) নিরাপত্তার অভাবে মিশর ত্যাগের সময় তেলাওয়াত করেছিলেন[২৯]:

(فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين)

“তাকে পশ্চাদ্ধাবন করা হবে এ ভীতি ও আশঙ্কা নিয়ে তিনি শহর থেকে বের হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন : ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এ অত্যাচারী জাতির হাত থেকে রক্ষা করুন।’”[৩০]

ইমাম হোসাইন (আ.) এমন এক অবস্থায় মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যখন অধিকাংশ মানুষ মুয়াবিয়ার মৃত্যু সম্পর্কে ছিল অনবহিত (কেননা, মুয়াবিয়া ১৫ অথবা ২২ রজব মারা যায় আর ইমাম হোসাইন ২৭ রজব মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন)। আর তাই ইয়াযীদের বিরুদ্ধে তখনও প্রকাশ্যে বিরোধিতা শুরু হয়নি এবং কোন শহর থেকে, এমনকি কুফা থেকেও (পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাপেক্ষে) কোন চিঠি ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কাছে পৌঁছেনি। এজন্য ইমাম হোসাইন (আ.)- কে হিজরতের জন্য এমন একটি জায়গা বাছাই করতে হতো যেখানে তিনি প্রথমত কিছুটা হলেও স্বাধীনভাবে এবং নিরাপত্তার মধ্যে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন।

আর দ্বিতীয়ত ইসলামী ভূখণ্ডের প্রতিটি অঞ্চলে নিজের চিন্তাধারা পৌঁছে দেয়ার জন্য ঐ জায়গাটি কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

উপরিউক্ত দুটি বৈশিষ্ট্যই মক্কা শহরের ছিল।

কারণ, তখনও পর্যন্ত মক্কা ছিল তাঁর জন্য আপাত নিরাপদ স্থান। এছাড়া এ শহরে কাবা শরীফ থাকায় এবং হজ ও উমরা পালন করার জন্য ইসলামী ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানদের আগমনের কারণে ইমাম হোসাইন (আ.) খুব সহজে বিভিন্ন দলের সাথে দেখা করে তাদেরকে উমাইয়া শাসকদের সাথে নিজের বিরোধিতার কথা জানাতে পারতেন। আর এভাবে ইসলামী শহরসমূহ বিশেষ করে কুফা ও বসরার[৩১] বিভিন্ন দলের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতেন।

ইমাম হোসাইন (আ.) ৬০ হিজরির ৩ শাবান শুক্রবার রাতে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং ৮ই যিলহজ পর্যন্ত এ শহরে স্বীয় কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখেন। [৩২]

মক্কা থেকে প্রস্থান

৪ নং প্রশ্ন : কেন ইমাম হোসাইন (আ.) হজ সম্পন্ন না করেই হজের প্রাক্কালে মক্কা থেকে বের হয়ে গেলেন?

উত্তর : এ প্রশ্নের ঐতিহাসিক পর্যালোচনার পূর্বে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। সেটি হলো- ইমাম হোসাইন (আ.) সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি হজের কাজ অর্ধেক সম্পন্ন করেই চলে যান। এ কথাটি ফিকাহসম্পন্ন নয়। কারণ, ইমাম হোসাইন (আ.) ৮ই যিলহজ 'তারবিয়ার দিন' মক্কা থেকে বের হন। [৩৩] আর হজের কাজ ৯ই যিলহজের রাত থেকে মক্কায় ইহরাম বাঁধা এবং আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের দ্বারা শুরু হয়। অতএব, ইমাম হোসাইন (আ.) কার্যত হজের কাজ শুরুই করেননি যে বলা যাবে, হজ অসম্পন্ন রেখেই চলে যান।

এটা সুনিশ্চিত যে, ইমাম হোসাইন (আ.) মক্কায় প্রবেশের সময় উমরা হজ পালন করেছিলেন। ইমাম হোসাইন (আ.) যে কয়েক মাস মক্কায় ছিলেন, সম্ভবত এ সময়কালে বেশ কয়েক বার উমরা পালন করেন। কিন্তু উমরা পালন করার অর্থ এটা নয় যে, তিনি হজের কাজ শুরু করেছিলেন। বেশ কয়েকটি হাদীসে শুধু উমরা পালন করার কথা এসেছে। [৩৪]

তারপরও ইতিহাসে এ প্রশ্ন থেকে যায় যে, যদি মক্কাকে বেছে নেয়ার একটি কারণ এটা হয়ে থাকে যে, নিজের মতামত ব্যক্ত করার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা, তাহলে কেন ইমাম হোসাইন (আ.) ঐ পরিস্থিতিতে, যখন ইসলামী ভূখণ্ডের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ মক্কা, আরাফা ও মিনায় একত্র হলো এবং তাবলীগের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো তখন তিনি হঠাৎ করে মক্কা ত্যাগ করলেন? সংক্ষিপ্ত ভাবে এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো :

এক. জীবননাশের আশঙ্কা

যেসব লোক ইমাম হোসাইন (আ.)-এর মক্কা থেকে কুফা যাওয়ার বিরোধী ছিল, তাদের মতামতের জবাবে ইমাম হোসাইন (আ.) যা বলেছিলেন তা থেকে বোঝা যায়, তিনি বেশিদিন মক্কায় অবস্থান করাটাকে ভালো মনে করেননি। কারণ, দিন দিন বিপদের আশঙ্কা বাড়ছিল এবং যে কোন মুহূর্তে দুশমনের হামলার সম্ভাবনা ছিল। যেমন ইমাম হোসাইন (আ.) আবদুল্লাহ ইবনে

আ2ব্বাসের প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘মক্কায় নিহত না হয়ে বরং অন্য জায়গায় নিহত হওয়াটাকে আমি বেশি পছন্দ করি।’[৩৫]

ইমাম হোসাইন (আ.) আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘আল্লাহর শপথ! মক্কার এক হাত ভিতরে নিহত হওয়ার থেকে মক্কার এক হাত বাইরে নিহত হওয়াটাকে আমি বেশি পছন্দ করি। আল্লাহর শপথ! আমি যদি কোন প্রাণীর বাসস্থানে গিয়েও আশ্রয় নিই তবুও তারা আমাকে সেখান থেকে টেনে বের করবে যাতে আমার থেকে যা চায় তা অর্জন করতে পারে।’[৩৬]

ইমাম হোসাইন (আ.)স্বীয় ভ্রাতা মুহাম্মাদ হানাফিয়াকে বলেছিলেন যে, ইয়াযীদের ইচ্ছা হলো মক্কার হারাম শরীফে আমাকে হত্যা করা। [৩৭] এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, ইয়াযীদ ইমাম হোসাইন (আ.)-কে হত্যা করার জন্য কিছু লোককে অস্ত্র দিয়ে মক্কায় পাঠিয়েছিল। [৩৮]

দুই. হারাম শরীফের সম্মান বিনষ্ট হওয়া

উপরিউক্ত আলোচনার সাথে আরেকটি বিষয় যুক্ত হয়েছে, আর সেটি হলো ইমাম হোসাইন (আ.) চাইতেন না যে, তাঁর রক্তের দ্বারা কাবা শরীফের সম্মান বিনষ্ট হোক। যদিও এক্ষেত্রে হত্যাকারীরা এবং উমাইয়া বংশের অপরাধীরা অনেক বড় গোনাহের ভার বহন করতো।

ইমাম হোসাইন (আ.) আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরের সাথে সাক্ষাতের সময় আপত্তির সুরে এবং সুস্পষ্টভাবে এ বিষয়টি বলেছিলেন যে, পরবর্তীকালে আবদুল্লাহ যখন মক্কায় বিদ্রোহ করবে তখন ইয়াযীদের সৈন্যরা তাকে হত্যার মাধ্যমে হারাম শরীফের সম্মান বিনষ্ট করবে। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘আমার পিতা আলী (আ.) আমাকে বলেছিলেন যে, মক্কায় এক বলির পাঁঠা আছে যার মাধ্যমে হারাম শরীফের সম্মান বিনষ্ট হবে। আর আমি সেই বলির পাঁঠা হতে চাই না।’[৩৯]

কুফাকে নির্বাচন

৫ নং প্রশ্ন : কেন ইমাম হোসাইন (আ.) আন্দোলন করার জন্য কুফাকে বেছে নিলেন?

উত্তর : ইসলামের ইতিহাসের পর্যালোচনায় শিয়া, সুন্নি ও প্রাচ্যবিদ নির্বিশেষে প্রত্যেক গবেষক এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন এবং সবাই নিজ নিজ জ্ঞানের পরিধি অনুযায়ী এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। যে বিষয়গুলো এ প্রশ্নটিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে তা হলো-

১. ইমাম হোসাইন (আ.) এ রাজনৈতিক ও সামরিক অভ্যুত্থানে বাহ্যিকভাবে পরাজয়ের শিকার হন এবং তাঁর এ পরাজয়ের অন্যতম কারণ হলো কুফাকে বিপ্লবের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেয়া।

২. ঐ সময়ের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা, যেমন তাঁর চাচাত ভাই ও ভগ্নিপতি আবদুল্লাহ বিন জাফর[৪০], আবদুল্লাহ বিন আব্বাস[৪১], আবদুল্লাহ বিন মুতি[৪২], মিসওয়ার বিন মাখরামা[৪৩] এবং মুহাম্মাদ হানাফিয়া[৪৪] ইমাম হোসাইন (আ.)- কে ইরাক ও কুফায় যেতে নিষেধ করেছিলেন। আর তাঁদের কেউ কেউ কুফাবাসীদের অতীত বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার কথা তুলে ধরেছিলেন যা তারা ইমাম আলী (আ.) এবং ইমাম হাসান (আ.)- এর সাথে করেছিল।

কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁদের নিষেধ সত্ত্বেও- যদিও এগুলো পরবর্তীকালে বাহ্যিকভাবে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল- নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং কুফার দিকে রওয়ানা দেন। আর এখানেই কতিপয় ঐতিহাসিক বিশেষ করে ইবনে খালদুন সুস্পষ্ট বলেন যে, ইমাম হোসাইন (আ.) এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেননি। [৪৫]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসসহ কতিপয় ব্যক্তিত্বের কথা থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সামনে কুফা ছাড়াও অন্যান্য জায়গা, যেমন ইয়েমেনের পথ খোলা ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইমাম হোসাইন (আ.)- কে বলেন : 'যদি নিতান্তই মক্কা থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করেন তাহলে ইয়েমেনের দিকে যান। কারণ, সেখানে সুরক্ষিত উপত্যকা ও দুর্গ আছে, আর তা বিস্তৃত এক এলাকা। অতএব, সেখানে থেকে আপনি আপনার আহ্বায়ক ও প্রচারকদেরকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতে পারবেন।'[৪৬]

কিন্তু কেন ইমাম হোসাইন (আ.) ঐ পথগুলা বেছে নিলেন না?

এ প্রশ্নের জবাবে শিয়া আলেমরা ছাড়া অন্য ব্যক্তিবর্গ, যেমন সুন্নি আলেম ও প্রাচ্যবিদগণ সাধারণ দৃষ্টিতে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করেছেন। আর তাঁরা এ ক্ষেত্রে শিয়াদের আকীদা- বিশ্বাস বিশেষ করে ইমামদের গায়েবের জ্ঞান থাকা এবং ভুল- ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার বিষয় দু'টিকে দৃষ্টিতে রাখেননি; বরং তাঁরা বিপ্লবের সামরিক ফলাফলের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলেছেন যে, ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁর সিদ্ধান্তে ভুলের শিকার হয়েছেন।

কিন্তু শিয়ারা নিজেদের আকীদা- বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইমামের পদক্ষেপকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। তাঁদের মতামতগুলো সাধারণত দু'টি মৌলিক মতের মধ্যে সীমাবদ্ধ যা নিম্নরূপ :

এক. শাহাদাতের দৃষ্টিভঙ্গি

এ মতটি নিম্নোক্ত মৌলনীতিগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত :

১. শিয়াদের প্রত্যেক ইমাম ইমামতের দায়িত্ব লাভের সময় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একটি বই খোলেন এবং তার মধ্যে লিখিত নির্দেশনা থেকে স্বীয় ঐশী দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হন। আর তাতে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী তাঁরা কাজ করেন। [৪৭]

২. ইমাম হোসাইন (আ.) যখন নিজের কর্মসূচির পাতা খোলেন তার মধ্যে নিজের দায়িত্ব এভাবে লক্ষ্য করেন- 'যুদ্ধ কর, হত্যা কর এবং জেনে রেখ যে, নিহত হবে। একদল লোক নিয়ে শাহাদাতের জন্য নিজের এলাকা ত্যাগ করে চলে যাও এবং জেনে রেখ যে, তারা তোমার সাথেই শাহাদাত বরণ করবে।'[৪৮]

অতএব, প্রথম থেকেই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল যে, ইমাম হোসাইন (আ.) শাহাদাত বরণ করুন। আর ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আল্লাহর এ ইচ্ছা বাস্তবায়ন করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না। ইমাম হোসাইন (আ.) যখন ইরাক অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছিলেন তখন একবার স্বপ্নে মহানবী (সা.)- এর মাধ্যমে তিনি শাহাদাতের বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। যখন মুহাম্মাদ হানাফিয়া কুফা যাওয়ার কারণ সম্পর্কে ইমাম হোসাইন (আ.)- কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন তিনি জবাবে

বলেছিলেন : “মহানবী (সা.) স্বপ্নে আমার কাছে আসেন এবং আমাকে বলেন : ‘হে হোসাইন! বের হও, কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাকে শহীদ অবস্থায় দেখতে চান।’”[৪৯]

উপরিউক্ত মতামতের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে,[৫০] কুফার দিকে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর যাত্রা আসলে শাহাদাত লাভের উদ্দেশ্যে ছিল। আর ইমাম হোসাইন (আ.) ভালোভাবেই তাঁর এরূপ নিয়তির কথা জানতেন। অতএব, এটি ছিল ইমাম হোসাইন (আ.)- এর বিশেষ দায়িত্ব যে ক্ষেত্রে তিনি কোনক্রমেই অন্য কোন ব্যক্তি, এমনকি পূর্ববর্তী দুই ইমামের অনুসরণ করতে পারেন না।

অতএব, এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নের অবকাশ থাকতে পারে না। আর বড় বড় ব্যক্তিত্বের মতকে উপেক্ষা করে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কুফা যাওয়ার বিষয়টিও সমাধান হয়ে যায়। কারণ, শিয়াদের দৃষ্টিতে, ইমাম হোসাইন (আ.) কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা সম্পর্কে অন্যদের থেকে ভালো জানতেন। তিনি এটাও জানতেন যে, পরিশেষে কুফাবাসী তাঁকে পরিত্যাগ করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তাঁকে শহীদ করবে। এ বিষয়টি জানা সত্ত্বেও তিনি কুফার উদ্দেশে রওয়ানা হন যাতে স্বীয় শাহাদাতের স্থানে পৌঁছেন এবং শহীদ হন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো- এ শাহাদাতের উদ্দেশ্য কী ছিল?

এক. এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ বলেন : শাহাদাতের উদ্দেশ্য ছিল সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন। আর তাঁর রক্তের মাধ্যমে ইসলামের চারাগাছে পানি সিঞ্চন করা এ দায়িত্বের সর্বোচ্চ পর্যায় ছিল। পরিশেষে এ রক্ত ইসলামের পুনরুজ্জীবন এবং ইয়াযীদ ও বনি উমাইয়ার মুখোশ উন্মোচনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলশ্রুতিতে ৭০ বছর পর উমাইয়া শাসনের কবর রচিত হয়।

আবার কেউ কেউ, যাঁরা সাধারণত আবেগপ্রবণ এবং যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী নন তাঁরা কোনরূপ দলিল উপস্থাপন ছাড়াই শাহাদাতের উদ্দেশ্যকে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর অনুসারীদের গুনাহের কাফফারা এবং শিয়াদের জন্য ইমামের শাফাআত হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। ঠিক যে রকম হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে খ্রিস্টানরা মনে করে।[৫১]

শাহাদাতের উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গিটি যে সকল বর্ণনার ভিত্তিতে বলা হয়েছে সেগুলোর সনদের সমস্যা (বর্ণনাকারীদের দুর্বলতা) ছাড়াও আরও কতগুলো সমস্যা রয়েছে যা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. ইমাম হোসাইন (আ.)- এর বিশেষ কোন দায়িত্ব থাকার বিষয়টি তাঁর এবং অন্য ইমামদের সকলের জন্য আদর্শ হওয়ার মৌলনীতিকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। অথচ ঐ ইমামদের অনুসরণীয় আদর্শ হওয়া এবং শিয়াদের জন্য তাঁদের আনুগত্যের আবশ্যকতা যুগ যুগ ধরে শিয়াদের নিকট একটি সুনিশ্চিত বিষয় হিসেবে চলে এসেছে।

২. এ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর বক্তব্যের সুস্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। কারণ, তিনি বলেছেন : 'আমি তোমাদের আদর্শ।'[৫২]

৩. যদিও ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শাহাদাত সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবিগণ, মহানবী (সা.), ইমাম আলী (আ.) ও ইমাম হাসান (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কতগুলো বক্তব্য থেকেও স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, তিনি নিজের শাহাদাত সম্পর্কে অবগত ছিলেন, কিন্তু তাঁর কোন বক্তব্য থেকেই এটা বোঝা যায় না যে, ইমামের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল শাহাদাত বরণ করা। তাই আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সামগ্রিক বক্তব্য থেকে উদঘাটন করতে হবে। ইমাম হোসাইন (আ.) স্বীয় ভ্রাতা মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়ার কাছে লিখিত অসিয়তনামায় সুস্পষ্টভাবে আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন-

'. . . আমি আমার নানার উম্মতের মধ্যে সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। আমি চাই সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতে। আর আমার নানা মুহাম্মাদ (সা.) এবং আমার পিতা আলী বিন আবী তালিব (আ.) যে পথে চলেছেন, আমিও সেই পথে চলতে চাই।'[৫২]

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর এই অসিয়তনামায় তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো হলো : সংস্কার সাধন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং মহানবী (সা.) ও ইমাম আলী (আ.)- এর সুন্নাতের অনুসরণ। ইমাম তাঁর এ অসিয়তনামায় শাহাদাত সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

দুই. ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিভঙ্গি

কতিপয় লেখকের মতে[৫৪], এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রথমবার শিয়াদের মধ্যে বিশেষ করে সাইয়্যেদ মুরতাজা আলামুল হুদার (৩৫৫-৪৩৬ হি.) লেখনীর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইমাম হোসাইন (আ.)-এর কুফা রওয়ানা দেয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে বলেন : '. . . আমাদের মাওলা আবু আবদুল্লাহ (আ.) কেবল তখনই খেলাফত লাভের জন্য কুফার দিকে যান যখন তিনি কুফাবাসীদের পক্ষ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পান এবং বিজয় সুনিশ্চিত দেখেন। ...'[৫৫] সাইয়্যেদ মুরতাজার পর কোন শিয়া আলেম এরকম দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেননি; বরং অধিকাংশ আলেম, যেমন শেখ তূসী (র.), সাইয়্যেদ বিন তাউস (র.) ও আল্লামা মাজলিসি (র.) কোন কোন সময় এ দৃষ্টিভঙ্গির চরম বিরোধিতা করেছেন। [৫৬]

সমসাময়িক কালে কতিপয় লেখক পুনরায় এ দৃষ্টিভঙ্গি পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন, যাতে আহলে সুন্নাত এবং প্রাচ্যবিদদের সন্দেহ-সংশয় নিরসনের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি উপযুক্ত জবাব দিতে পারেন। চিন্তাশীল মহলের ওপর এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব থাকার কারণে আলেমসমাজ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ চরমভাবে এর বিরোধিতা করেছেন। এমনকি শহীদ মোতাহহারী এবং ডক্টর শরিয়তীর মতো পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেননি। [৫৭] কারণ, এ দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো, এতে ইমামের (আ.) ইলমে গায়েবের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়নি।

কিন্তু এ মতের সার কথাটি হলো ইমাম হোসাইন (আ.)-এর আন্দোলন ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল; আর এ কাজ ইয়াযীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং উমাইয়া গোষ্ঠীর মুখোশ উন্মোচন করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সম্ভব ছিল না। ইমাম খোমেইনী (র.) সহ আরো অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি তা সমর্থন করেছেন। ইমাম খোমেইনী (র.) বিভিন্ন সময় এ বিষয়ের প্রতি ইশারা করেছেন এবং বলেছেন : 'ইমাম হোসাইন (আ.)-এর আন্দোলনের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি ছিল ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা। যেমন:

ক. ৬/৩/১৩৫০ ফারসি (১৯৫২ খ্রি.) তারীখে নাজাফ শহরে ইমাম খোমেইনী (র.) তাঁর বক্তৃতায় বলেন : 'ইমাম হোসাইন (আ.) কুফাবাসীদের থেকে বাইআত নেয়ার জন্য মুসলিম বিন

আকীলকে পাঠান, যাতে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন এবং ইয়াযীদের অবৈধ সরকারকে উৎখাত করতে পারেন।'[৫৮]

খ. 'ইমাম হোসাইন (আ.) যখন মক্কায় আসেন এবং হজের মওসুমে মক্কা থেকে বের হন তখন সেটা ছিল একটা বড় রাজনৈতিক পদক্ষেপ। ইমামের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল ইসলামী ও রাজনৈতিক। ইমাম হোসাইন (আ.)- এর এসব ইসলামী ও রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলোই উমাইয়া শাসনের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি তিনি এসব পদক্ষেপ না নিতেন তাহলে ইসলামই ধ্বংস হয়ে যেত।'[৫৯]

গ. 'ইমাম হোসাইন (আ.) খেলাফত লাভের জন্য এসেছিলেন। তাঁর আন্দোলনে নামার আসল উদ্দেশ্য ছিল এটাই। আর এটা ছিল তাঁর গৌরব।

যারা মনে করে তিনি খেলাফত লাভের জন্য আসেননি তাদের ধারণা ভুল; বরং ইমাম এসেছিলেন খেলাফত লাভের জন্য। তিনি চেয়েছিলেন খেলাফত যেন ইমাম হোসাইন (আ.) এবং তাঁর অনুসারীদের মতো ব্যক্তিদের হাতে থাকে।'[৬০]

এ দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে কতগুলো দলিল নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. সবচেয়ে বড় দলিল হলো, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সেই বক্তব্য যা তিনি মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় প্রদান করেছিলেন। আর এতে তিনি স্বীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হিসেবে তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন : সংস্কার সাধন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ এবং মহানবী (সা.) ও হযরত আলী (আ.)- এর সুন্নাতের অনুসরণ।[৬১] আর এটা সুস্পষ্ট যে, সংস্কার সাধন ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়। এছাড়া সর্বোচ্চ পর্যায়ে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ কেবল এমন ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্ভব, যে সরকারের শাসক হবেন ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ এবং যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মহানবী (সা.) ও ইমাম আলী (আ.)- এর সুন্নাতের অনুসরণের কথা, যার মাধ্যমে ইমাম এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের শাসন পরিচালনার পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর নিজের উদ্দেশ্য হিসেবে

ঐ মহান ব্যক্তিদের সুন্নাতের অনুসরণের কথা বলার অর্থ হলো তিনি তাঁদের ন্যায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে চান।

২. কুফাবাসীরা তাদের চিঠিতে লিখেছিল, আমাদের যোদ্ধা ও সৈন্যরা প্রস্তুত, কিন্তু তাদেরকে নেতৃত্ব দেয়ার মতো কোন ইমাম নেই।[৬২] তাদের চিঠির ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, তারা ইয়াযীদের সরকারকে অবৈধ মনে করে। তাই তারা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কাছে চেয়েছিল যে, তিনি যেন কুফায় এসে ইমাম হিসেবে শাসনভার গ্রহণ করেন। ইমাম কুফাবাসীদের এ মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে আন্দোলন শুরু করেন। উদাহরণস্বরূপ : কুফা থেকে আগত একটি চিঠিতে- যেটি কুফার বড় বড় ব্যক্তিত্ব, যেমন সুলায়মান বিন সুরাদ খুজায়ী, মুসাইয়্যেব বিন নাজাবাহ্ ও হাবীব বিন মাজাহের লিখেছিলেন- বর্ণিত হয়েছে : 'আমাদের কোন ইমাম নেই। অতএব, আমাদের কাছে আসুন। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে সত্যের ওপর একত্র করবেন।'[৬৩]

৩. কুফাবাসীদের দাওয়াতের প্রথম জবাবে ইমাম হোসাইন (আ.) মুসলিম বিন আকীলকে কুফায় পাঠান। আর এটা ছিল ইমামত এবং ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার নিদর্শন। মুসলিম বিন আকীলকে কুফায় পাঠানোর সময় ইমাম কুফাবাসীদেরকে সম্বোধন করে একটি চিঠি লিখেন- 'তোমরা যা বলেছ তা বুঝতে পেরেছি, তোমাদের চিঠির সারমর্ম হলো তোমাদের কোন ইমাম নেই।'[৬৪]

এ চিঠি দ্বারা ইমাম নিজের কুফা যাওয়াটাকে শর্তসাপেক্ষ করে তোলেন। আর সে শর্ত হলো- মুসলিমের দ্বারা কুফাবাসীর দাবির সত্যতা প্রত্যয়ন। [৬৫]

৪. ইমাম হোসাইন (আ.) স্বীয় চিঠিতে কতগুলো শর্ত উল্লেখ করেছিলেন। আর সেগুলো যে কেবল ইমাম হোসাইন (আ.)- এর ওপরই প্রযোজ্য হয় তা সুস্পষ্ট। এ শর্তগুলো উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রমাণ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। ইমাম (আ.) তাঁর এ চিঠিতে ইমামতের ধারায় রাষ্ট্র- পরিচালনার দিকগুলো নিয়েই বেশি আলোচনা করেছেন। আর শরীয়তের আহকাম বর্ণনা সংক্রান্ত কোন আলোচনা তিনি করেননি। যদিও পরবর্তীকালে কেউ কেউ ইমামতকে আহকাম

(শরীয়তের বিধিবিধান) বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন- যা একটি আংশিক ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি।

এ সম্পর্কে ইমাম হোসাইন (আ.) স্বীয় চিঠিতে বলেন : 'আমার আত্মার শপথ! শুধু ঐ ব্যক্তিই ইমাম হতে পারেন যিনি পবিত্র কুরআনের পূর্ণ জ্ঞান রাখেন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী, সত্যের ওপর আমলকারী এবং নিজের সমস্ত চেষ্টা- প্রচেষ্টাকে আল্লাহর পথে কাজে লাগান (আল্লাহর জন্য নিজেকে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত রাখেন)।'[৬৬]

৫. মুসলিমের কর্মকাণ্ডগুলো ছিল কুফায় ইমাম হোসাইন (আ.)- এর পক্ষ থেকে খেলাফত প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট আলামত। তাঁর কর্মকাণ্ডগুলো ছিল নিম্নরূপ:

ক. ইমাম হোসাইন (আ.)- কে সাহায্য করার জন্য দেয়া প্রতিশ্রুতির ওপর আমল করার জন্য কুফাবাসীদের থেকে বাইআত গ্রহণ।[৬৭]

খ. বাইআতকারীদের তালিকা তৈরি করা। বলা হয়েছে যে, বাইআতকারীদের সংখ্যা ১২ হাজার থেকে ১৮ হাজারের মধ্যে ছিল।[৬৮]

৬. বনি উমাইয়ার অনুসারীরা ইয়াযীদকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল যে, দিন দিন মুসলিমের অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ থেকে বলা যায়, তারা বুঝতে পেরেছিল যে, মুসলিমের কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকলে কুফা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। নিচের বাক্য থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়- 'যদি কুফার প্রয়োজন থাকে, তাহলে কঠোর শাসক সেখানে নিয়োগ কর, যে তোমার নির্দেশ পালন করবে এবং তোমার দুশমনের সাথে তোমার মতো আচরণ করবে।'[৬৯]

৭. এ দাবির পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো- ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কাছে প্রেরিত মুসলিমের প্রতিবেদন। মুসলিম ইমাম হোসাইন (আ.)- কে সাহায্য করার জন্য কুফাবাসীদের আগ্রহ এবং পদক্ষেপকে সমর্থন করে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন যা কুফা অভিমুখে ইমামের রওয়ানা হওয়ার কারণ হয়।[৭০] ইমাম (আ.) মাঝপথে কুফাবাসীদের উদ্দেশে চিঠি লেখেন এবং তা কায়েস বিন মুসাহহার সায়দাভীর মাধ্যমে কুফায় প্রেরণ করেন। ইমাম সেই চিঠিতে মুসলিমের পত্রের ভিত্তিতে ৮ই যিলহজকে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার তারীখ হিসেবে ঘোষণা করেন। আর তিনি কুফা

শহরে পৌঁছা পর্যন্ত তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে বলেন। ইমাম স্বীয় চিঠিতে বলেন : ‘মুসলিমের পত্র আমার কাছে পৌঁছেছে যা তোমাদের সঠিক সিদ্ধান্তের পরিচায়ক। আর তোমরা যে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত এবং দুশমনদের থেকে আমাদের অধিকার আদায় করার জন্য তৈরি তা আমি বুঝতে পারলাম। মহান আল্লাহর কাছে চাই, তিনি যেন আমাদের কাজকে সুন্দর করে দেন এবং তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। এ চিঠি প্রেরণের পরই মঙ্গলবার ৮ই যিলহজ ‘তারবিয়ার দিন’ মক্কা থেকে তোমাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। তোমাদের কাছে আমার দূত পৌঁছা মাত্রই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রস্তুত হয়ে যাও এবং সত্যের পথে অটল থাক। আমিও খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছে চলে আসছি।’[৭১]

কয়েকটি সমস্যা

উপরিউক্ত দাবির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দু’টি সমস্যা রয়েছে, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. এ দৃষ্টিভঙ্গির শিয়াদের কালামশাস্ত্রের মৌলিক ভিত্তির সাথে বৈপরীত্য রয়েছে। কারণ, কালামশাস্ত্রের মতে, ইমামদের অদৃশ্যের জ্ঞান আছে।

২. এ দৃষ্টিভঙ্গি ইমামের ভুল কাজ করার প্রতি ইশারা করে যা ইমামের নিষ্পাপ হওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বলা যেতে পারে যে, এ সমস্যার কারণেই শিয়া সমাজ এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

এ সমস্যার উত্তর দিতে গেলে আমাদেরকে শিয়াদের কালামশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে হবে যেখানে ইমামের অদৃশ্যের জ্ঞান ও নিষ্পাপ হওয়া এবং ঐগুলো প্রমাণ করার দলিল এবং ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সেগুলোর গরমিল পরিলিক্ষিত হলে তা দূর করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের কাজ যেহেতু ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা সেহেতু কালামশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকব। তবে, এটুকু বলতে চাই যে, কালামশাস্ত্রের ভিত্তিতেও এ দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক প্রমাণ করা সম্ভব। যেমন ইমাম খোমেইনী (র.)- এর মতো বড় ব্যক্তিত্বের মতও এ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করা একটি দ্বীনি দায়িত্ব। আর তা অবশ্যই পরিকল্পনা, চূড়ান্ত দলিল উপস্থাপন (যাতে কারো কোন

অজুহাত দেখানোর অবকাশ না থাকে), বিচক্ষণতা এবং অন্যদের সহযোগিতা নিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু ফলাফল আল্লাহর কাছে এবং সেটার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এমনকি ফলাফল জানা থাকলেও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে কোন বাধা নেই। কেননা, যে ব্যক্তি সত্যের পথে অগ্রসর হয় তার পরাজয় সাময়িক, আর কালক্রমে চূড়ান্ত বিজয় অবশ্যই সত্যপন্থীদের হয়ে থাকে।

তদুপরি এ সমস্যা থেকে যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলন যে পরাজয়ের শিকার হয় তা প্রমাণ করে যে, কুফাবাসীদের সম্পর্কে ইমামের ধারণা সঠিক ছিল না; বরং ঐ সময়ের অন্যান্য ব্যক্তিত্ব, যেমন ইবনে আব্বাসের ধারণাই ছিল সঠিক।

ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ও বাস্তবভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ সমস্যাটির সমাধান করা যায়।

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলনের যৌক্তিকতা

যদি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব একটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যথেষ্ট পর্যালোচনা ও বিভিন্ন অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখার পর কোন একটা ফলাফলে পৌঁছে এবং সেই ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়, আর এর মাঝে সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা সংঘটিত হয়ে তার সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে, তাহলে সে ব্যক্তিকে কোনক্রমেই দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

আমরা বিশ্বাস করি, ঐ সময় ইমাম হোসাইন (আ.) কুফার অবস্থা খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি মুয়াবিয়ার খেলাফতকালে কুফাবাসীদেরকে কোন জবাব দেননি এবং সুস্পষ্টভাবে তাদের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন[৭২], এমনকি স্বীয় ভ্রাতা মুহাম্মাদ হানাফিয়াকে তাদের আহ্বানে সাড়া দিতে নিষেধ করেছিলেন।[৭৩]

আর এ সময়ও কুফাবাসীদের চিঠি পৌঁছামাত্রই তাদের প্রতি বিশ্বাস করেননি; বরং তাদের দাবির যথার্থতা ও সত্যতা জানার জন্য স্বীয় চাচাত ভাই মুসলিম বিন আকীলকে সেখানে পাঠান। মুসলিম সেখানে এক মাসেরও বেশি সময় অবস্থান করেন এবং খুব নিকট থেকে ঐ এলাকার

অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন, আর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আগমনের জন্য কুফার অবস্থা অনুকূলে। মুসলিম স্বীয় চিঠিতে কুফার অনুকূল অবস্থার কথা ইমামকে জানান। এ সময় ইমাম হোসাইন (আ.) কুফার দিকে রওয়ানা হন। অবশ্য ইমাম যে হজের মওসুমে তাড়াতাড়ি করে মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন তার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল তাঁর জীবননাশের আশঙ্কা।

এর মাঝে যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা সংঘটিত হয় তা হলো, কুফার গভর্নরের পদ থেকে নোমান বিন বশীরের অপসারণ এবং উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে তাঁর স্থলাভিষিক্তকরণ যা কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ছিল না। বরং বাহ্যিক অবস্থা পুরোপুরি এর বিপরীত ছিল। কারণ, ইয়াযীদ ও উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে এরকম বলা হয়েছে যে, ইয়াযীদ তার ওপর খুব রাগান্বিত ছিল।[৭৪] এজন্য তাকে বসরার গভর্নরের পদ থেকে অপসারণের চিন্তায় ছিল।[৭৫] এমনকি কোন কোন গ্রন্থে এসেছে, ইয়াযীদ উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের সবচেয়ে বড় দুশমন ছিল।[৭৬]

এ বাধা থাকা সত্ত্বেও যদি মুসলিম এবং তাঁর সাথিরা ইবনে যিয়াদের মতো ভীতি প্রদর্শন, হুমকি, চাপ প্রয়োগ, লোভ দেখানো ইত্যাদি অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে বাইআতকারীদেরকে সংগঠিত রাখতেন এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন উপাদান ও নিয়ামক কাজে লাগাতেন, যেমনটা ইবনে যিয়াদ করেছিল, তাহলে কুফায় তাঁদের বিজয়ের সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

এমনকি মুসলিম যদি শারীক বিন আত্তার ও আম্মারা বিন আবদুস সলূলের প্রস্তাব অনুযায়ী সুবর্ণ সুযোগটাকে কাজে লাগাতেন এবং হানীর গৃহে ইবনে যিয়াদকে হত্যা করতেন[৭৭] তাহলে খুব ভালোভাবে কুফার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন।

এখানে আমরা বলতে পারি, কুফার জনগণ সম্পর্কে ইমাম হোসাইন (আ.) অন্য ব্যক্তিবর্গ, যেমন ইবনে আব্বাসের থেকে বেশি ভালো করে জানতেন। কারণ, প্রথমত, ইবনে আব্বাসের ধারণা

ইমাম আলী (আ.) ও ইমাম হাসান (আ.)- এর যুগকেন্দ্রিক ছিল। কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.)- এর ধারণা বর্তমান যুগকেন্দ্রিক ছিল।

দ্বিতীয়ত, কুফাবাসীদের সম্পর্কে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর ধারণা শিয়াদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, যেমন সুলাইমান বিন সুরাদ ও হাবীব বিন মাজাহেরের চিঠি ছাড়াও স্বীয় প্রতিনিধি মুসলিমের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল; কিন্তু ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য ব্যক্তির হাতে এরকম কোন মাধ্যমই ছিল না যাতে কুফার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন।

উল্লেখ্য যে, কুফার বর্তমান অবস্থা বিশ বছর আগের অবস্থার সাথে পুরোপুরি ভিন্ন ছিল এবং ইমাম হোসাইনের সাথে আন্দোলন করার জন্য কুফাবাসীদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। আর তাদের পশ্চাদপসরণ ও বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। কারণ :

এক. কুফা ইসলামী জাহানের কেন্দ্র হওয়ার দিক থেকে সিরিয়ার সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি। ফলে কেন্দ্র কুফা থেকে সিরিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। যেহেতু উমাইয়া শাসকরা সব সময় কুফাকে অনুন্নত করে রাখার চেষ্টা করত, সেহেতু কুফাবাসীরা তাদের অতীত গৌরব, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ফিরিয়ে পাওয়ার প্রচেষ্টায় রত ছিল।

দুই. এ সময় কুফাবাসী বিশেষ করে শিয়াদের ওপর উমাইয়া শাসকদের যুলুম- অত্যাচার তাদেরকে শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে বাধ্য করেছিল।

তিন. ইয়াযীদের ব্যাপারে কুফাবাসীদের ধারণা এবং ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সাথে তার তুলনা তাদেরকে ইয়াযীদের শাসন গ্রহণ না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিল।

এখন অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, বিশেষ কতগুলো কারণ যেমন: ইয়াযীদের অদক্ষতা ও মুয়াবিয়ার মতো ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যক্তিত্ব না থাকার কারণে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা, অপরদিকে কুফার প্রাদেশিক গভর্নরের দুর্বলতার করণে ইমাম হোসাইনের বিজয়ের সমূহ সম্ভাবনা ছিল এবং কুফায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সিরিয়ার কেন্দ্রীয় শাসনের সাথে মোকাবিলা করাও তাঁর পক্ষে সহজ ছিল।

অতএব, বলা যায় যে, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর প্রভাব, কুফার অবস্থা, কুফাবাসীর মনোভাব এবং সিরিয়ার কেন্দ্রীয় শাসনের অবস্থা অনুসারে কুফাকে বেছে নেয়ার ব্যাপারে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সঠিক ছিল। আর অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যদি না ঘটত তাহলে নিশ্চিতভাবে ইমাম হোসাইন (আ.) বাহ্যিক বিজয়ও লাভ করতেন।

ইয়েমেনকে বাছাই না করার কারণ

৬ নং প্রশ্ন : কেন ইমাম হোসাইন (আ.) ইয়েমেনকে স্বীয় আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেননি, যদিও সেখানে শিয়াদের উপস্থিতি ছিল?

উত্তর : গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ইমাম হোসাইন (আ.)- কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তিনি যেন ইয়েমেনের দিকে যান এবং সেখান থেকে প্রচারকদেরকে বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করেণ এবং ইয়াযীদের মোকাবিলা করার জন্য স্বীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। [৭৮]

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় যে, কেন ইমাম হোসাইন (আ.) এ ধরনের প্রস্তাবে মোটেই গুরুত্ব দেননি?

এর উত্তর দেয়ার জন্য নিচের বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে :

১. যদিও মহানবী (সা.)- এর আমলে ইয়েমেনে হযরত আলী (আ.)- এর উপস্থিতির কারণে ইয়েমেনবাসী সুখময় স্মৃতির অধিকারী ছিল[৭৯] এবং হযরত আলী (আ.)- এর প্রতি তাদের খুব ভালোবাসা ছিল; কিন্তু কোন ক্রমেই সেসময়ে এ ভূখণ্ডকে কুফার তুলনায় শিয়াদের ঘাঁটি হিসেবে উত্তম বলে বিবেচনা করা যায় না।

২. অতীত অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, দুর্যোগকালে ইয়েমেনবাসীর ওপর কোন ক্রমেই ভরসা করা যায় না। কারণ, ইমাম আলী (আ.)- এর খেলাফতকালে এ ইয়েমেনবাসী মুয়াবিয়ার দুর্বল সেনাবাহিনীর মোকাবিলায়[৮০] অক্ষমতার পরিচয় দেয় এবং গভর্নর উবায়দুল্লাহ বিন আব্বাসকে ত্যাগ করে। উবায়দুল্লাহ নিরুপায় হয়ে কুফার দিকে পলায়ন করে। আর মুয়াবিয়ার পাষাণহৃদয়

সেনাবাহিনী বুসর বিন আবী আরতাতের নেতৃত্বে খুব সহজেই শহর দখল করে নেয় এবং উবায়দুল্লাহ বিন আব্বাসের দুই শিশুসহ অনেক মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। [৮১]

৩. এ সময়ে ইয়েমেন ইসলামী ভূখণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় শহর হিসেবে গণ্য হতো না এবং বসরা, মাদায়েন ও অন্য শহরগুলোর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন শহরও তাঁর কাছে ছিল না যাতে ইমাম একটি শক্তিশালী সেনাদল গড়ে তুলতে পারেন এবং অন্যরা তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে পারে।

৪. মহানবী (সা.)- এর ইন্তেকালের প্রাক্কালে ইয়েমেনের কয়েকটি গোত্রের মুরতাদ হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের মনে তাদের ব্যাপারে খুব একটা ভালো ধারণা ছিল না। আর এ সম্ভাবনা ছিল যে, ইমাম হোসাইন (আ.) স্বীয় আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে ঐ জায়গা বাছাই করলে মানুষ হুকুমাতের বিরুদ্ধে এ আন্দোলনকে ইয়েমেনবাসীর অতীত কার্যকলাপের ধারাবাহিকতা হিসেবেই মনে করত, বিশেষ করে উমাইয়া শাসক গোষ্ঠী খুব সহজেই এ ক্ষেত্রে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলনকে বিকৃত করার মাধ্যমে ফায়দা লুটত।

৫. ইয়েমেন অন্যান্য ইসলামী শহর থেকে দূরে থাকার কারণে সেখানে কোন বিদ্রোহ ঘটলে উমাইয়া শাসকদের পক্ষে খুব সহজেই সেটাকে দমন করার সম্ভাবনা ছিল।

৬. এ সময়ে ইয়েমেনবাসীর পক্ষ থেকে ইমামের কাছে কোন পত্র আসেনি। অতএব, ইয়াযীদের মোকাবিলায় ইমাম হোসাইন (আ.)- কে রক্ষা করার জন্য তাদের মধ্যে খুব একটা আগ্রহ ছিল না। আর ইমাম হোসাইন (আ.)- কে দাওয়াত দেওয়ার জন্য কুফাবাসীর মধ্যে যে উৎসাহ- উদ্দীপনা ছিল তার শতভাগের এক ভাগও ইয়েমেনবাসীর মধ্যে ছিল না। কুফাবাসীর উৎসাহের মূল কারণ ছিল বনি উমাইয়ার যুলুম- অত্যাচার থেকে মুক্তি, সিরিয়ার মোকাবিলায় কুফার কেন্দ্রীয় শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, কুফায় ন্যায়ের ভিত্তিতে আলী- বংশের শাসনের পুনরুদ্ধার এবং আহলে বাইতের প্রতি বিশ্বাসের প্রতিরক্ষা।

কুফাবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা

৭ নং প্রশ্ন : যে কুফাবাসী যথেষ্ট উৎসাহ- উদ্দীপনা নিয়ে ইমাম হোসাইন (আ.)- কে দাওয়াত দিল তারাই কেন পরবর্তীকালে ইমামকে সাহায্য না করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে অন্য দু'টি প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দিতে হবে।

এক. কুফাবাসীর চিঠি লেখা এবং ইমাম হোসাইন (আ.)- কে দাওয়াত করার কারণ কী ছিল?

দুই. উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ কুফার আন্দোলন দমন করার জন্য কী ব্যবস্থা নিয়েছিল?

এক. প্রথমে এ বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মক্কায় অবস্থানকালে কুফাবাসীরা তাঁকে পত্র প্রেরণ শুরু করে।[৮২] তাদের পক্ষ থেকে প্রেরিত পত্রের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, ঐ অবস্থাকে পত্রের মাধ্যমে প্রতিবাদ আন্দোলন বলা যেতে পারে। কয়েক দিনের মধ্যে এত ব্যাপকভাবে পত্র আসা শুরু হয় যে, প্রতিদিন গড়ে ৬০০ চিঠি ইমামের কাছে আসত। পরিশেষে চিঠির পরিমাণ প্রায় ১২ হাজারে পৌঁছে।[৮৩] ঐ চিঠিসমূহের যেগুলো পাওয়া গেছে তার কতিপয় চিঠিতে উল্লিখিত নাম ও স্বাক্ষরসমূহের ব্যাপারে সার্বিক গবেষণা করে দেখা গেছে, চিঠি লেখকগণ নির্দিষ্ট কোন দল বা গোত্রের ছিল না; বরং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী বিভিন্ন দল চিঠি লেখকদের মধ্যে ছিল। আর তাদের মধ্যে বিশিষ্ট শিয়া ব্যক্তিবর্গ, যেমন, সুলাইমান বিন সুরাদ খূজায়ী, মুসাইয়্যাব বিন নাহবা খাজারী, রোফাআ বিন শাদ্দাদ ও হাবীব বিন মাজাহের প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও ছিলেন।[৮৪]

অপরদিকে, কুফায় বসবাসকারী উমাইয়া গোষ্ঠীর কতিপয় ব্যক্তি, যেমন শাবাস বিন রিবয়ী (যে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের পর খুশি হয়ে মসজিদ নির্মাণ করেছিল)[৮৫], হাজ্জার বিন আবজার (যে আশুরার দিন উমর বিন সাদের দলে ছিল এবং ইমামের কাছে প্রেরিত চিঠির কথা অস্বীকার করেছিল)[৮৬], ইয়াযীদ বিন হারেস বিন ইয়াযীদ (সেও আশুরার দিন ইমামকে দেয়া চিঠির কথা অস্বীকার করেছিল)[৮৭], আজরা বিন কায়েস (উমর বিন সাদের অশ্ববাহিনীর সেনাপতি)[৮৮] এবং আমর বিন হাজ্জাজ জাবিদী (যে ইমাম হোসাইন (আ.)- কে ফোরাত নদীর পানি নেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য ৫০০ সৈন্য দ্বারা গঠিত একটি দলের সদস্য ছিল)[৮৯] প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও ইমাম

হোসাইন (আ.)- কে চিঠি দিয়েছিল। ঘটনাক্রমে উৎসাহ- উদ্দীপনামূলক পত্রগুলো এরাই দিয়েছিল এবং ইমামকে বলেছিল- ‘কুফার সেনাবাহিনী আপনার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।’[৯০]

কিন্তু মনে হয়, অধিকাংশ পত্র লেখক সাধারণ মানুষ ছিল যাদের নাম ইতিহাসে লেখা হয়নি এবং তারা দুনিয়াবি স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই পত্র লিখেছিল। আর তারা যেদিকে বাতাস প্রবাহিত হয় সেদিকে চলত। যদিও দুর্যোগকালে তা প্রবাহিত করার ক্ষমতা এদের নেই তবুও এদের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, প্রচণ্ড এক শক্তি বলে বিবেচিত হতো- যাদেরকে ব্যবহার করে এক অভিজ্ঞ ও সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি ফায়দা লুটতে এবং নিজ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।

সম্ভবত মুসলিমের কাছে বাইআতকারী ১৮ হাজার লোকের মধ্যে অধিকাংশই এরা ছিল। এরা যখন (উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কুটচক্রের কারণে) নিজেদের পার্থিব স্বার্থ হুমকির মুখে দেখে তখন মুসলিমের দল থেকে বের হয়ে যায় এবং তাঁকে কুফায় অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করে।

অতএব, এটা স্বাভাবিক যে, এদেরকে কারবালার ময়দানে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর অল্প সংখ্যক সৈন্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে দেখা যাবে। কারণ, উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ তাদের দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে বহু ওয়াদা দিয়েছিল। এছাড়া, তারা মনে করত ইমামের সঙ্গী-সাথি কম থাকায় উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের বিজয়ের সম্ভবনা বেশি। এ সম্ভাবনা তাদের মনে যথেষ্ট আশার উদ্রেক করেছিল। আবার এরা এমন লোক ছিল যাদের অন্তরে নবীর দৌহিত্র এবং ইমাম আলী (আ.)- এর সন্তান হিসেবে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। এদের সম্পর্কে মাজমা বিন আবদুল্লাহ আয়েজী ইমাম হোসাইন (আ.)- কে সম্বোধন করে বলেন : ‘অধিকাংশ মানুষের অন্তর তোমার দিকে, কিন্তু আগামীকাল তাদের তরবারি তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে।’[৯১]

এদেরই একটি দল কারবালার ময়দানে এক কোনায় দাঁড়িয়ে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শাহাদাতের দৃশ্য দেখছিল, চেখের পানি ঝরাচ্ছিল এবং দোয়া করছিল এ বলে যে, ‘হে আল্লাহ! ইমাম হোসাইন (আ.)- কে সাহায্য করুন।’[৯২]

উপরিউক্ত ভূমিকার পর এ ফলাফলে পৌঁছি যে, পত্র লেখকদের মধ্যে বিভিন্ন দল থাকায় কোন ক্রমেই তাদের উদ্দেশ্য এক ছিল বলে মনে করা যায় না; বরং বিভিন্ন দলের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। যেমন-

১. হাবীব বিন মাজাহের এবং মুসলিম বিন আওসাজার মতো খাঁটি শিয়ারা খেলাফতকে আহলে বাইতের ন্যায্য অধিকার এবং উমাইয়াদের যুলুম- অত্যাচারের রাজত্বকে অবৈধ মনে করতেন। তাঁরা খেলাফতের পুনরুদ্ধার এবং উপযুক্ত জায়গায় তা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য চিঠি লিখেছিলেন। তবে তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম ছিলেন।

২. কুফার অনেক লোক বিশেষ করে মধ্যবয়স্ক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিরা, যারা কুফায় হযরত আলী (আ.)- এর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার কথা মনে রেখেছিল এবং মুয়াবিয়ার বিশ বছরের শাসনামলে উমাইয়া গোষ্ঠীর যুলুম- অত্যাচার দেখেছিল তারা এ অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় ইমাম আলী (আ.)- এর সন্তানের প্রতি মুখ চেয়ে ছিল যাতে তাঁর মাধ্যমে উমাইয়া শাসনের যাঁতাকল থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

৩. একদল লোক কুফায় রাজধানী ফিরিয়ে আনার জন্য একজন যোগ্য নেতা খুঁজছিল, যিনি এ কাজ সম্পাদন করতে পারেন। কারণ, কুফার সাথে সিরিয়ার প্রতিযোগিতা ছিল এবং মুয়াবিয়ার বিশ বছরের শাসনামলে রাজধানী কুফা থেকে সিরিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। এদের দৃষ্টিতে এ সময়ে ইমাম হোসাইন (আ.) ছিলেন একজন উপযুক্ত ব্যক্তি যিনি একদিকে কুফাবাসীকে নেতৃত্ব দেয়ার মতো ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, অপরদিকে উমাইয়াদের শাসনকে অবৈধ মনে করেন। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এ দল ইমাম হোসাইন (আ.)- কে কুফায় আসার জন্য দাওয়াত করেন।

৪. শাবাস বিন রাবয়ী ও হাজ্জার বিন আবজারের মতো গোত্রপতিরা একদিকে নিজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার চিন্তায় ছিল, অপরদিকে নবী- বংশের সাথে তাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। যখন তারা দেখল, কুফাবাসী ইমাম হোসাইন (আ.)- কে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত, তখন তারা ধারণা করল ভবিষ্যতে অবশ্যই কুফায় ইমাম হোসাইন (আ.)- এর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। ঐ সময় তারা যেন কাফেলা থেকে পেছনে পড়ে না থাকে

এবং ইমামের খেলাফতকালে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয় এজন্য পত্র লেখকদের অন্তর্ভুক্ত হয়। [৯৩]

৫. সাধারণ মানুষ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উৎসাহ- উদ্দীপনা দেখে চিঠি লিখতে আগ্রহী হয় এবং বিদ্রোহের আগুনকে উস্কে দেয়।

দুই. উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কুফায় প্রবেশের ফলে গোত্রপতিরা ও উমাইয়া গোষ্ঠীর অনুসারীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। খুব দ্রুত তার চারিদিকে সমবেত হয় এবং কুফার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনা তার সামনে বর্ণনা করে। উবায়দুল্লাহ কুফায় প্রবেশের সাথে সাথে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর প্রতি কুফাবাসীর ভালোবাসা এবং আন্দোলনের পরিধি সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত হয়; কারণ, সে মাথায় কাল পাগড়ি ও নেকাব পরিহিত অবস্থায় কুফায় প্রবেশ করে। আর এদিকে, ইমামের জন্য প্রতীক্ষারত কুফাবাসী তাকে ইমাম হোসাইন (আ.) মনে করে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। [৯৪] আর এভাবে উবায়দুল্লাহ খুব ভালোভাবে বিপদের গভীরতা আঁচ করে এবং বসরায় স্বীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যে দক্ষতা ছিল তার ওপর ভিত্তি করে ও স্বীয় অনুসারীদের সহযোগিতায় কুফাবাসীর আন্দোলন দমন করার জন্য খুব দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী রাজনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নেয়। তার এ রাজনীতিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা:- মনস্তাত্ত্বিক কৌশল, সামাজিক কৌশল ও অর্থনৈতিক কৌশল। নিম্নে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো:

১. মনস্তাত্ত্বিক কৌশল : ইবনে যিয়াদ কুফায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভীতি প্রদর্শন ও প্রলোভনের অপকৌশল হাতে নেয়। কুফার জামে মসজিদে সে তার প্রথম বক্তৃতায় নিজেকে অনুগতদের জন্য দয়ালু পিতা হিসেবে উল্লেখ করে, আর অবাধ্য ব্যক্তিদের জন্য তরবারি ও চাবুকের কথা বলে। [৯৫] সে আরেকটি কৌশল কাজে লাগায়। আর তা হলো, সে কুফাবাসীকে জানায় যে, সিরিয়ার বিশাল বাহিনী বিদ্রোহীদেরকে দমন করার জন্য কুফার দিকে আসছে। তার এ ঘোষণার পর কুফার বিদ্রোহ, বিশেষ করে যারা মুসলিমের সাথে 'দারুল ইমারাহ' অবরোধ করে রেখেছিল তাদের উৎসাহ- উদ্দীপনা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। [৯৬] কুফাবাসী সিরিয়ার বাহিনীর সাথে তাদের সর্বশেষ

সংঘর্ষের- অর্থাৎ ইমাম হাসান (আ.) যখন সন্ধি করেছিলেন- পর থেকে সিরিয়ার বাহিনীকে প্রচণ্ড ভয় পেত এবং সমসময় মনে করত ঐ বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার কোন শক্তি তাদের নেই। কুফার মহিলারাও এ রকম মনোভাব পোষণ করত। এজন্য ইবনে যিয়াদের ঘোষণার পর পরই মহিলারা তাদের স্বামী, ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়- স্বজন যারা মুসলিমের সাথে ছিল তাদের কাছে যায় এবং তাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। [৯৭]

পরিশেষে এ ধরনের কৌশলের ফলেই যে মুসলিম দুপুরে চার হাজার কুফাবাসীকে সাথে নিয়ে দারুল ইমারাহ অবরোধ করে রেখেছিল এবং উবায়দুল্লাহকে পতনের সম্মুখীন করে তুলেছিল সেই মুসলিম রাতের প্রথম প্রহরে কুফার গলিতে একাকী ঘুরতে থাকেন। [৯৮]

২. সামাজিক কৌশল : যেহেতু তখন পর্যন্ত গোত্রীয় ঐক্য ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল সেহেতু গোত্রপতিরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সামাজিক দিক থেকে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারকারী ছিল। এজন্য তাদের অনেকেই (যেমন : শাবাস বিন রাবয়ী, আমর বিন হাজ্জাজ ও হাজ্জার বিন আবজার) পত্র প্রেরণের আন্দোলনে কার্যকর ভাবে যোগ দিয়েছিল এবং স্বাভাবিক ভাবেই মুসলিমের কুফায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাথে মিলিত হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশই যেহেতু নিজের পদ ও দুনিয়ার স্বার্থ রক্ষার চিন্তায় ছিল সেহেতু উবায়দুল্লাহ্ কুফায় প্রবেশের পর তারাও তার হুমকির মুখে পড়ে মুসলিমের কাছ থেকে সরে গিয়ে উবায়দুল্লাহর বাহিনীতে যোগ দেওয়াটাকেই তাদের দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিলের জন্য বেশি উপযুক্ত মনে করে। এ জন্য তারা খুব দ্রুত বিদ্রোহ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কারণ, উবায়দুল্লাহ খুব ভালোভাবে জানত যে, তাদেরকে কিভাবে নিজের পাশে একত্র করা যায়। সে হুমকি ও মোটা অংকের ঘুষের রাজনীতিকে কাজে লাগিয়ে গোত্রপতি ও বিভিন্ন অঞ্চলের সম্মানী ব্যক্তিদেরকে নিজের পাশে জড়ো করতে সক্ষম হয়। মুজতামা বিন আবদুল্লাহ আয়েজী, যে কুফার অবস্থা ভালোভাবে জানত এবং সবেমাত্র কুফা থেকে বের হয়ে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, সে ইমামের নিকট কুফার গোত্রপতিদের সম্পর্কে বলে : 'কুফার গোত্রপতি ও সম্মানী ব্যক্তিদেরকে মোটা অংকের ঘুষ দেয়া হয়েছে, তাদের গোডাউনগুলোকে গম আর যব দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে, তাদের ভালোবাসাকে টাকা- পয়সা দিয়ে

কিনে নেয়া হয়েছে, তারা শুধু নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে এবং আপনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে...।'[৯৯]

সামাজিকভাবে প্রভাব বিস্তারকারী দ্বিতীয় যে দলটিকে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ব্যবহার করে সেটি হলো অভিভাবক দল। পরিভাষায় অভিভাবক সেই ব্যক্তিকে বলা হতো যার ওপর কয়েক ব্যক্তিকে দেখাশুনা করার ভার ন্যস্ত ছিল। তাদের অনেকেই সরকার থেকে বাৎসরিক এক লক্ষ দিরহাম লাভ করত। [১০০] তবে বিভিন্ন অভিভাবকের আয়ের পরিমাণ ছিল বিভিন্ন রকম। আর তাদের অধীনে বসবাসরত লোকদের সংখ্যা বিশ থেকে একশ'র ওপর ছিল। [১০১]

যখন কুফায় গোত্রবাসীরা শহরে বাস করা শুরু করে তখন এ পদ একটি সরকারি পদে রূপান্তরিত হয় এবং এ পদের অধিকারীদেরকে কুফার ওয়ালী ও আমীরের কাছে জবাবদিহি করতে হতো। [১০২] আর তাদের নিয়োগ এবং অপসারণও গোত্রপতির মাধ্যমে না হয়ে ওয়ালীর (গভর্নর) মাধ্যমে হতো। এ পদ সরকার এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করত। আর এ পদের অধিকারীদের অধীনে বসবাসরত লোকদের সংখ্যা যেহেতু গোত্রপতির অধীনে বসবাসরত লোকদের সংখ্যার থেকে অনেক কম ছিল সেহেতু তারা খুব সহজেই স্বীয় অধীনস্থ লোকদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত।

অভিভাবকদের প্রধান দায়িত্ব ছিল রেজিস্ট্রি খাতায় স্বীয় অধীনস্থ লোকদের স্ত্রী ও সন্তানসহ নামের তালিকা তৈরি করা। যখনই কেউ জন্মগ্রহণ করত তখনই তার নাম এ খাতায় লিপিবদ্ধ হতো, অপরদিকে কেউ মারা গেলে তার নাম মুছে ফেলা হতো। এভাবে তারা স্বীয় অধীনস্থ লোকদের অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল থাকত। কিন্তু দুর্যোগময় মুহূর্তে অভিভাবকদের কাজ কয়েক গুণ বেড়ে যেত। কারণ, স্বীয় অধীন এলাকায় শান্তি- শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব- যেটাকে অভিভাবকত্ব বলা হতো- তাদের ওপর ন্যস্ত ছিল। আর সরকার নির্দেশ দেয়া মাত্রই বিদ্রোহী দলকে খুব দ্রুত শাসকদের কাছে পরিচিত করাতে হতো। [১০৩]

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ কুফায় প্রবেশ করার পরই চতুরতার সাথে সামাজিক দিক থেকে শক্তিশালী এ দলটিকে ব্যবহার করা শুরু করে। সম্ভবত উবায়দুল্লাহ্ এ কাজের অভিজ্ঞতা স্বীয়

পিতা যিয়াদের কাছে তার কুফায় শাসনকালে শিখেছিল। সে কুফার জামে মসজিদে প্রথম বক্তৃতা করার পর রাজপ্রাসাদে আসে এবং অভিভাবকদেরকে একত্রিত করে তাদের উদ্দেশে বলে : ‘তোমরা অবশ্যই তোমাদের অধীনস্থ এলাকায় বসবাসরত অস্থানীয় এবং আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদের বিরোধী লোকদের তালিকা তৈরি করে আমাকে দেবে। তেমনি খারেজী সম্প্রদায় এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তি যারা বিরোধ সৃষ্টি করতে চায় তাদের ব্যাপারেও আমার কাছে প্রতিবেদন দেবে। যে ব্যক্তি আমার এ নির্দেশ পালন করবে তার সাথে আমার কোন বিরোধ নেই, কিন্তু যে ব্যক্তি তালিকা তৈরি করবে না সেও যেন স্বীয় এলাকার ব্যাপারে এ দায়িত্ব গ্রহণ করে যে, তার এলাকার কোন বিদ্রোহী বা বিরোধী ব্যক্তি আমাদের সাথে বিরোধিতা না করে। আর যদি এ রকম না করে তাহলে আমাদের নিরাপত্তা তার ওপর থেকে তুলে নেয়া হবে এবং তার জান ও মালের কোন নিরাপত্তা থাকবে না। আর যে অভিভাবকের এলাকায় আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদের কোন বিরোধীকে পাওয়া যাবে সে অভিভাবককে তার বাড়ির দরজার ওপর ফাঁসিতে ঝুলানো হবে এবং ঐ এলাকায় কোন বাৎসরিক বাজেট প্রদান করা হবে না। [১০৪]

অতএব, বলা যেতে পারে যে, কুফায় মুসলিমের আন্দোলন নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল উবায়দুল্লাহর এ ধরনের নীতি অবলম্বন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যমসমূহের ব্যবহার। কারণ, অভিভাবকগণ ইবনে যিয়াদের হুমকিকে সত্য বলে মনে করেছিল এবং খুব দ্রুত তার চাওয়া- পাওয়াগুলো পূরণ করেছিল আর কঠিনভাবে স্বীয় এলাকাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল।

৩. অর্থনৈতিক কৌশল : ঐ সময় জনগণের গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস ছিল সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্য গ্রহণ। তারা ইরানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের শর্ত হিসেবে যুদ্ধের শুরুতে এ সাহায্য গ্রহণ করত। তাদের শহুরে জীবন শুরু হওয়ার পর এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও আগের রীতি মোতাবেক তাদেরকে সেই সাহায্য প্রদান করা হতো। এ কারণে আরব জনগণ শিল্প, কৃষিকাজ ও ব্যবসা- বাণিজ্যে খুব কম মনোযোগ দিত। সাধারণত এ কাজগলো মাওয়ালীরা (যেসব অনারব আরবদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল) করত। এ অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মূলত ঐ

সময়ে আরবগণ শিল্প ও যে কোন পেশায় রত হওয়াটাকে নিজের পদ- মর্যাদার পরিপন্থী বলে মনে করত। [১০৫]

সরকারি ‘সাহায্য’ নগদ পরিশোধযোগ্য একটি পরিমাণ ছিল যা কুফার শাসকদের পক্ষ থেকে এককালীন অথবা কয়েক কিস্তিতে জনগণকে প্রদান করা হতো। এছাড়া খেজুর, গম, যব ও তেলসহ বিভিন্ন জিনিস রেশন হিসেবে প্রতি মাসে তাদেরকে দেয়া হতো। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ রকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধিকাংশ আরবকে প্রচণ্ডভাবে সরকারের প্রতি নির্ভরশীল করে রাখত এবং স্বৈরাচারী শাসকগণও এ দুর্বল দিকটি ভালো করে জানত; ফলে এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত।

উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ অভিভাবকদেরকে ভয়- ভীতি দেখানোর সময় এ হাতিয়ারের ওপর নির্ভর করে এবং কোন অভিভাবকের এলাকায় বিদ্রোহী ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে ঐ এলাকার সকল লোকের সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার মতো কঠিন পরিণিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই অভিভাবকগণ ছাড়াও দুনিয়াকামী অন্য ব্যক্তিরাও বিদ্রোহ দমনে মাঠে নেমেছিল।

যখন মুসলিম এবং তাঁর সাথিরা উবায়দুল্লাহর প্রাসাদ অবরুদ্ধ করে রেখেছিল তখন তার এক সফল অনুচর মুসলিমের সাথিদেরকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে ব্যস্ত ছিল এবং তাদেরকে এ বলে লোভ দেখাচ্ছিল যে, যদি তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাহলে তাদের রেশন ও অন্যান্য সাহায্য বাড়িয়ে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে, যদি বিদ্রোহ অব্যাহত রাখে তাহলে তাদের রেশন বন্ধ করে দেয়া হবে। [১০৬]

ইবনে যিয়াদ এ অর্থনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহার করে এবং রেশন বৃদ্ধির ওয়াদা দিয়ে কুফার জনগণের মধ্য থেকে ৩০ হাজার[১০৭] সৈন্য সম্বলিত এক বিশাল বাহিনী তৈরি করে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাতে সক্ষম হয়; যে বাহিনীর অনেকের হৃদয় ছিল ইমাম হোসাইন (আ.)- এর দিকে। [১০৮]

ইমাম হোসাইনও এ হাতিয়ারের প্রভাব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। আর এজন্য তিনি আশুরার দিন স্বীয় বক্তৃতায় তাঁর বিরুদ্ধে কুফাবাসীর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটি কারণ হিসেবে সেটিকে উল্লেখ করেছিলেন : 'তোমরা সবাই আমার বিরোধিতা করছ এবং আমার বক্তব্য শুনছ না; কারণ, হারাম মাল থেকে তোমাদেরকে সাহায্য দেয়া হয়েছে এবং তোমাদের পেট হারামে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আর এটা তোমাদের অন্তরের ওপর মোহর পড়ে যওয়ার কারণ হয়েছে।'[১০৯]

কারবালায় পিপাসা

৮ প্রশ্ন নং : কারবালায় কী রকম পিপাসা ছিল?

উত্তর : নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে যা পাওয়া যায় তা হলো, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শাহাদাতের তিন দিন পূর্বে অর্থাৎ সাতই মুহররম উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ সেনাপতি উমর বিন সাদকে নির্দেশ দিয়েছিল যে, ইমাম হোসাইন (আ.)- কে পানি নেয়া থেকে বিরত রাখ এবং তাঁকে এক ফোঁটা পানি পান করার সুযোগ দিও না। আর সে উসমানের ওপর পানি বন্ধ করার প্রতিশোধ নেয়ার মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে এ কাজ করে![১১০]

উমর বিন সাদ এ নির্দেশ পাওয়া মাত্র আমর বিন হাজ্জাজকে ৫০০ অশ্বারোহী সাথে দিয়ে ফোরাত নদীর তীর বন্ধ করার হুকুম দেয় যাতে ইমাম হোসাইন (আ.) এবং তাঁর সাথিরা পানি নিতে না পারে।[১১১] এ দুই তিন দিন ইমাম এবং তাঁর সাথিরা বিভিন্ন পন্থায় পানি আনার চেষ্টা করছিলেন; কারণ, ঐ উত্তপ্ত মরুভূমিতে পিপাসার কষ্ট সহ্য করা বিশেষ করে শিশু ও নারীদের সাধ্যের বাইরে ছিল।

কোন কোন গ্রন্থে এ রকম এসেছে : ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁর শিবিরে পানির জন্য কূপ খনন করা শুরু করেছিলেন; কিন্তু ইবনে যিয়াদের কাছে যখন এ খবর পৌঁছল তখন সে উমর বিন সাদকে নির্দেশ দিল, অবরোধ যেন কঠোর করা হয় এবং কূপ খনন করতে বাধা দেয়া হয়।[১১২]

আবার কোন কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এসেছে, হযরত আব্বাস (আ.) ৩০ জন অশ্বারোহী এবং ২০ জন পদাতিক সৈন্য নিয়ে পতাকাবাহী নাফে বিন হেলালের সাথে রাতের বেলায় ফোরাতের তীরে হামলা করেন। তারা আমর বিন হাজ্জাজের বাহিনীর সাথে লড়াই করার পর ২০ মশক পানি নিয়ে আসতে সক্ষম হন। [১১৩]

উপরিউক্ত ঘটনার সুনির্দিষ্ট কোন সময় উল্লেখ করা হয়নি। তবে এ বাক্যটি বর্ণিত হয়েছে : 'যখন ইমাম হোসাইন (আ.) এবং তাঁর সাথিদের পিপাসার কষ্ট চরম আকার ধারণ করেছিল।'

কোন কোন জায়গায় বলা হয়েছে : ইমাম হোসাইন (আ.) আশুরার দিনে তাঁর বোন যায়নাবের চেহারার ওপর পানি ছিটিয়ে দিয়েছিলেন; কারণ, তিনি যখন শাহাদাত নিকটবর্তী হওয়া সম্পর্কিত ইমামের কবিতা শ্রবণ করেন তখন বেহুশ হয়ে যান। [১১৪]

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, আশুরার রাতে ইমামের শিবিরে পানি ছিল। আল্লামা মাজলিসী (র.) 'বিহারুল আনওয়ার' গ্রন্থে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যে, আশুরার দিন সকাল বেলাতেও খাওয়ার পানির কোন সমস্যা ছিল না।

এ সম্পর্কে এভাবে বলা হয়েছে : "অতঃপর ইমাম হোসাইন (আ.) স্বীয় সাথিদেরকে বললেন : 'ওঠ, পানি পান কর; কারণ, এটা হচ্ছে তোমাদের সর্বশেষ খাদ্য। ওজু কর এবং গোসল কর। আর নিজেদের কাপড়গুলোকে পানি দিয়ে ধৌত কর যাতে ঐগুলো তোমাদের কাফন হতে পারে।' ঐ সময় ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁদের সাথে ফজরের নামায জামাতে আদায় করেন।'[১১৫]

'এটা তোমাদের সর্বশেষ খাদ্য' এই বাক্য এবং আশুরার দিবস সম্পর্কিত অন্যান্য বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, সঞ্চিত পানি শেষ হওয়ার পর পুনরায় পানি সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। আর ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁর পরিবার এবং সঙ্গীদেরকে নিয়ে কারবালার ঐ উত্তপ্ত মরুভূমিতে শাহাদাতের মুহূর্ত পর্যন্ত একদিকে দুশমনদের সাথে কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, অপরদিকে কঠিন পিপাসায় কাতর ছিলেন।

আল্লামা মাজলিসী (র.) স্বীয় বর্ণনায় তামীম বিন হাসীন খাজারী নামে উমর বিন সাদের এক সৈন্যের উপহাসের কথা উল্লেখ করেন। সে ইমাম হোসাইন (আ.)- কে লক্ষ্য করে বলছিল : 'হে

হোসাইন! হে হোসাইনের সাথিরা! ফোরাত নদীর পানি দেখতে পাচ্ছ, কিভাবে সাপের পেটের মতো জ্বলজ্বল করছে; খোদার শপথ! মৃত্যুর আগে এক ফোঁটা পানি সেখান থেকে পান করতে পারবে না।’[১১৬]

হুর ইবনে ইয়াযীদ আশুরার দিন কুফাবাসীকে নসীহত করার সময় ইমাম হোসাইন (আ.) এবং তাঁর সাথিদের ওপর ফোরাত নদীর পানি বন্ধ রাখার জন্য তাদেরকে খুব তিরস্কার করেন। [১১৭]
কোন কোন গ্রন্থে এসেছে, ইমাম (আ.) পানি নিয়ে আসার জন্য খুব চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু শিমার বাধা দিয়েছিল এবং ইমামকে উপহাস করেছিল। এ কারণে ইমাম তাকে অভিসম্পাত করেন। [১১৮]
আল্লামা মাজলিসী (র.) একটি হাদীস বর্ণনা করেন যার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্বাস যুদ্ধ করার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন আর ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁকে শিশুদের খাওয়ার পানি নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দেন। প্রসিদ্ধ মতে, হযরত আব্বাস (আ.) পানি নিয়ে আনতে সক্ষম হননি; বরং ফেরার পথে শাহাদাত বরণ করেন। [১১৯]

পানির জন্য আবেদন

৯ নং প্রশ্ন : ইমাম হোসাইন (আ.) কি শত্রুদের কাছে নিজের জন্য পানির আবেদন করেছিলেন?
উত্তর : আশুরার দিন সকাল বেলায় যদিও ইমাম হোসাইন (আ.), তাঁর পরিবার ও সঙ্গী- সাথিরা কঠিন পিপাসায় কাতর হয়ে গিয়েছিলেন, তবুও কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে আসেনি যে, তিনি শত্রুদের কাছে পানির আবেদন করেছিলেন।
মূলত কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থেই পিপাসার বিষয়টি এতটা গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়নি, তবে সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোর কোন কোন কিতাবে এবং বক্তাদের মাঝে এ বিষয়টি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যুদ্ধের ময়দানে ইমাম হোসাইন (আ.) এবং তাঁর সাথিদের বীরত্বপূর্ণ কবিতায় পিপাসার প্রতি কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

এর বিপরীতে আশুরার দিন ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কবিতা ও বক্তব্যে যা দেখতে পাওয়া যায় তা আত্মসম্মান, মর্যাদা এবং বীরত্বগাথায় পরিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ ঐ বিখ্যাত বাক্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে যা আশুরার দিনে ঘোরতর যুদ্ধের সময় ইমাম হোসাইন (আ.) পাঠ করেছিলেন : 'জেনে রাখ, জারজের সন্তান জারজ ইবনে যিয়াদ আমাকে দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি মানতে বলেছে: হয় তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে, আর না হয় অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে ইয়াযীদের হাতে বাইআত করতে হবে। কিন্তু অপমান ও লাঞ্ছনা আমাদের থেকে দূরে। আর আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, ঈমানদারগণ, পবিত্র ক্রোড়ে লালিত ব্যক্তিগণ, পৌরুষের অধিকারী এবং আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ আমাদের জন্য বৈধ মনে করেন না যে, নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের আনুগত্যের লাঞ্ছনাকে সম্মানের সাথে মৃত্যুবরণ করার ওপর প্রাধান্য দেই।'[১২০]

কোন কোন আলোচনা সভা ও শোকানুষ্ঠানে ইমাম হোসাইনের আন্দোলনের সম্মান- মর্যাদা ও বীরত্বপূর্ণ দিকটা নিয়ে খুব একটা আলোচনা করা হয় না, বরং ইমামের ওপর দয়া ও অনুকম্পার বিষয়টি আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়। একদল কারবালার ঘটনাকে বেশি করুণ করে তোলার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কিস্সা- কাহিনীর আশ্রয় নেয় এবং কোন কোন সময় ইমামের চেহারাকে কলঙ্কিত করে তুলে ধরে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, এসব মিথ্যা কিসসা- কাহিনীর একটিতে এসেছে, ইমাম হোসাইন (আ.) উমর বিন সাদের কাছে গিয়ে তিনটি আবেদন করেন যার দ্বিতীয়টি ছিল, 'আমাকে একটু পানি পান করাও, কারণ, তৃষ্ণায় আমার কলিজা ফেটে যাচ্ছে', [১২১] কিন্তু উমর বিন সাদ বেহায়ার মতো এ আবেদন নাকচ করে।

যদিও এ ঘটনাগুলো পাথরের চোখেও পানি প্রবাহিত করতে সক্ষম, কিন্তু অন্যদিকে আশুরা এবং ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সম্মানিত চেহারার ওপর কালিমা লেপন করে। আর চিন্তাশীল শিয়াদেরকে বিচার- বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মৌলিক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি করে। পরিশেষে, দুশমনদের হাতে বাহানা তুলে দিয়ে শিয়াদের সম্মান ও মর্যাদার ওপর বড় ধরনের আঘাত হানে। [১২২]

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মাথার সমাধিস্থল

১০ নং প্রশ্ন : ইমাম হোসাইন (আ.)- এর পবিত্র মাথা কোথায় দাফন করা হয়?

উত্তর : ইমাম হোসাইন (আ.) এবং অন্যান্য শহীদের মাথা কোথায় দাফন করা হয় তা নিয়ে শিয়া ও সুন্নিদের ইতিহাস গ্রন্থে এবং শিয়াদের হাদীস গ্রন্থে প্রচুর মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে এ ব্যাপারে যেসব মতামত উল্লেখ করা হয়েছে তা যথেষ্ট বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বর্তমানে শিয়াদের কাছে গ্রহণযোগ্য মত হলো ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শাহাদাতের কয়েকদিন পরে তাঁর পবিত্র মাথা দেহের সাথে সংযুক্ত করে কারবালার মাটিতে দাফন করা হয়। বিস্তারিত জানার জন্য বিভিন্ন মত নিচে উল্লেখ করা হলো :

এক. কারবালা

শিয়া আলেমদের মধ্যে এ মতটি হলো সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ। আল্লামা মাজলিসি (র.) এ মতের প্রসিদ্ধির কথা ব্যক্ত করেছেন। [১২৩]

সাদুক (র.) হযরত আলী (আ.)- এর মেয়ে এবং ইমাম হোসাইন (আ.)- এর বোন ফাতেমা থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ করেন, কারবালায় দেহ মোবারকের সাথে মাথা সংযুক্ত করা হয়েছিল। [১২৪] তবে মাথা সংযুক্ত করার পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করা হয়েছে।

সাইয়্যেদ বিন তাউসসহ কেউ কেউ এটিকে একটি অলৌকিক বিষয় হিসেবে মনে করেন এবং বলেন, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতাবলে অলৌকিকভাবে এ কাজটি করেন। আর এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। [১২৫]

আবার কেউ কেউ বলেন, ইমাম সাজ্জাদ (আ.) সিরিয়া থেকে ফেরার সময় চল্লিশতম দিনে[১২৬] অথবা অন্য কোন এক দিনে ইমামের পবিত্র মাথা কারবালায় তাঁর দেহের পাশে দাফন করেন।[১২৭] কিন্তু ইমামের মাথা একেবারে তাঁর দেহ মোবারকের সাথে সংযুক্ত করে নাকি তাঁর দেহের পাশে দাফন করা হয়েছে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। এছাড়া সাইয়্যেদ ইবনে তাউসও এ ব্যাপারে বেশি প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। [১২৮]

একদল বলেন, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর পবিত্র মাথা ইয়াযীদের আমলে তিন দিন দামেশকের প্রধান দরজায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। অতঃপর সেখান থেকে নামিয়ে সরকারি মূল্যবান বস্তুর সংরক্ষণাগারে রাখা হয়। উমাইয়া শাসক সুলায়মান বিন আবদুল মালেকের শাসনকাল পর্যন্ত ইমামের পবিত্র মাথা সেখানেই থাকে। এরপর সুলায়মান ঐ মাথাকে কাফন পরিয়ে দামেশকে মুসলমানদের গোরস্তানে দাফন করে। অতঃপর সুলায়মানের উত্তরাধিকারী উমর বিন আবদুল আজীজ (খেলাফত : ৯৯- ১০১ হি.) গোরস্তান থেকে ঐ পবিত্র মাথাকে বের করে নিয়ে আসেন এবং সেটাকে কী করেন তা কারো জানা নেই! কিন্তু তিনি যেহেতু শরীয়তের বাহ্যিক আমলের প্রতি অনুগত ছিলেন সেহেতু যথাসম্ভব ঐ পবিত্র মাথাকে কারবালা পাঠিয়েছিলেন। [১২৯]

পরিশেষে বলতে চাই, কোন কোন সুন্নি মনীষী, যেমন, শাব্লানজী এবং সিবত ইবনে জাওজীও এক রকম স্বীকার করেছেন যে, পবিত্র মাথা কারবালায় দাফন করা হয়েছে। [১৩০]

দুই. নাজাফে হযরত আলী (আ.)- এর মাযারের পাশে

আল্লামা মাজলিসি (র.)- এর বক্তব্য থেকে এবং কতগুলো হাদীস বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় যে, ইমামের মাথা নাজাফে হযরত আলী (আ.)- এর মাযারের পাশে দাফন করা হয়েছে। [১৩১] কিছু কিছু হাদীসে এসেছে, ইমাম জাফর সাদিক (আ.) স্বীয় সন্তান ইসমাইলকে সাথে নিয়ে নাজাফে ইমাম আলী (আ.)- এর যিয়ারত করে নামায পড়ার পর ইমাম হোসাইন (আ.)- কে উদ্দেশ্য করে সালাম দিতেন। অতএব, এসব হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ইমাম জাফর সাদিক (আ.)- এর সময়কাল পর্যন্ত ইমাম হোসাইন (আ.)- এর পবিত্র মাথা নাজাফেই ছিল। [১৩২]

অন্যান্য হাদীসও এ মতটিকে সমর্থন করে। এমনকি শিয়াদের গ্রন্থসমূহে ইমাম আলী (আ.)- এর মাযারের পাশে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর পবিত্র মাথা যিয়ারত করার জন্য দুআ'ও উল্লেখ করা হয়েছে। [১৩৩]

ইমামের পবিত্র মাথা নাজাফে স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেন : 'আহলে বাইত (আ.)- এর একজন ভক্ত সিরিয়ায় ইমামের পবিত্র মাথা চুরি করে ইমাম আলী (আ.)- এর মাযারের পাশে নিয়ে আসে।'[১৩৪] অবশ্য এ মতের ব্যাপারে একটি ত্রুটি পরিলক্ষিত

হয়। আর তা হলো, ইমাম জাফর সাদিক (আ.)- এর সময়কাল পর্যন্ত ইমাম আলী (আ.)- এর মাযার সবার কাছে পরিচিত ছিল না।

অন্য এক হাদীসে এসেছে, ইমামের পবিত্র মাথা দামেশ্কে কিছু দিন রাখার পর কুফায় ইবনে যিয়াদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সে জনগণের বিদ্রোহের ভয়ে এ নির্দেশ দেয় যে, ইমামের পবিত্র মাথা যেন কুফা থেকে বের করে নাজাফে হযরত আলী (আ.)- এর মাযারের পাশে দাফন করা হয়। [১৩৫] পূর্ববর্তী মতের ব্যাপারে যে ত্রুটি উল্লেখ করা হয়েছে এখানেও সে ত্রুটি প্রযোজ্য।

তিন. কুফা

সাবত ইবনে জাওজী এ মতের প্রবক্তা। তিনি বলেন : 'আমর বিন হারিস মাখজুমী, ইবনে যিয়াদের কাছ থেকে ইমামের পবিত্র মাথা নেয় এবং গোসল দেয়ার পর কাফন পরিয়ে ও সুগন্ধি মাখিয়ে স্বীয় বাড়িতে দাফন করে।'[১৩৬]

চার. মদীনা

'তাবাকাতে কুবরা'র লেখক ইবনে সা'দ এ মতটি গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন : 'ইয়াযীদ ইমামের মাথাকে মদীনার শাসক আমর বিন সাঈদের জন্য পাঠায়। আমর ঐ পবিত্র মাথাটিকে কাফন দেওয়ার পর বাকী গোরস্তানে হযরত ফাতেমা (সা.)- এর মাযারের পাশে দাফন করে। [১৩৭]

এ মতটিকে আহলে সুন্নতের কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তি (যেমন খাওয়ারেজমী 'মাকতালুল হোসাইন (আ.)' গ্রন্থে এবং ইবনে এমাদ হাম্বালী 'শুজুরাতুত যাহাব' গ্রন্থে) গ্রহণ করেছেন। [১৩৮]

এ মতের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো, হযরত ফাতেমা যাহরা (আ.)- এর কবর ছিল অজ্ঞাত। অতএব, কিভাবে সম্ভব যে, তাঁর কবরের পাশে দাফন করা হতে পারে।

পাঁচ. সিরিয়া

সম্ভবত বলা যেতে পারে, অধিকাংশ সুন্নি আলেমের মতে, ইমামের পবিত্র মাথা সিরিয়ায় দাফন করা হয়েছে। এ মতে বিশ্বাসীদের মধ্যেও মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। সেসব মতামত নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক. ফারাদীস শহরের প্রধান গেটের পাশে দাফন করা হয়। পরবর্তীকালে সেখানে 'মাসজিদুর রাস' তৈরি করা হয়।

খ. উমাইয়া জামে মসজিদের পাশে একটি বাগানে দাফন করা হয়।

গ. দারুল ইমারায় দাফন করা হয়।

ঘ. দামেস্কের একটি গোরস্তানে দাফন করা হয়।

ঙ. তুমা শহরের দরজার পাশে দাফন করা হয়। [১৩৯]

ছয়. রিক্কা

ফোরাত নদীর তীরে একটি শহরের নাম হলো রিক্কা। কথিত আছে, ইয়াযীদ ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মাথা আবু মুহিতের বংশধরের কাছে পাঠায়। (আবু মুহিতের বংশধর উসমানের আত্মীয় ছিল এবং ঐ সময় রিক্কা শহরে বাস করত)। তারা ইমামের পবিত্র মাথা একটি বাড়িতে দাফন করে যা পরবর্তীকালে মসজিদে রূপান্তরিত হয়। [১৪০]

সাত. মিশর (কায়রো)

বর্ণিত হয়েছে, ফাতেমী খলীফাগণ যারা চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু করে সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মিশরে রাজত্ব করেন এবং শিয়া ইসমাঈলী মাযহাবের অনুসারী ছিল তারা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর পবিত্র মাথা সিরিয়ার ফারাদীস শহর থেকে আসকালান, অতঃপর কায়রোতে নিয়ে যায়। এরপর সেখানে ৫০০ বছর পর ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মুকুট নামে একটি মাযার তৈরি করে। [১৪১]

মাকরীযী মনে করেন, ৫৪৮ সালে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মাথা আসকালান থেকে কায়রোতে স্থানান্তরিত হয়। তিনি বলেন : 'আসকালান থেকে পবিত্র মাথা বের করার সময় দেখা যাচ্ছিল যে, তার রক্ত টাটকা এবং এখনো শুকায়নি। আর মেশকের মতো একটি সুগন্ধি ইমামের পবিত্র মাথা থেকে বের হচ্ছিল।'[১৪২] আল্লামা সাইয়্যেদ মুহসিন আমিন আমেলী (গত শতাব্দীর প্রসিদ্ধ শিয়া আলেম) আসকালান থেকে মিশরে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মাথা স্থানান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে বলেন : 'মাথার সমাধিস্থলে একটি বড় মাযার তৈরি করা হয়েছে। আর তার পাশে একটি

বড় মসজিদও তৈরি করা হয়েছে। ১৩২১ হিজরিতে ঐ জায়গা আমি যিয়ারত করি। আর বহু নারী- পুরুষকে সেখানে যিয়ারত করতে ও কান্নাকাটি করতে দেখতে পাই।' তিনি আরো বলেন :

'একটি মাথা আসকালান থেকে মিশরে স্থানান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে ঐ মাথাটি ইমাম হোসাইন (আ.)- এর নাকি অন্য কোন ব্যক্তির এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।'[১৪৩]

আল্লামা মাজলিসী (র.) মিশরের একটি দলের বরাত দিয়ে সেখানে 'মাশহাদুল কারীম' নামে একটি বড় মাযার থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেন।[১৪৪]

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সঙ্গী- সাথি

১১ নং প্রশ্ন : আশুরার রাতে ইমামের কোনো সাথি কি তাঁকে ছেড়ে চলে যান? আসলে কারবালার ময়দানে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সাথিদের সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর : এ প্রশ্নের দু'টি অংশ রয়েছে, এজন্য এর উত্তরও আলাদাভাবে দিতে হবে।

প্রথম অংশ : সাথিদের বিশ্বস্ততা

ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলি আশুরার রাতের ঘটনাগুলো বর্ণনা করার সময় এ বিষয়টি উল্লেখ করেছে যে, যখন ইমাম হোসাইন (আ.) স্বীয় সঙ্গী- সাথিদেরকে তাঁকে শত্রুদের সামনে ফেলে রেখে চলে যাওয়ার কথা বললেন তখন তাঁরা সবাই মিলে বীরত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ কথা বলে ইমামের সাথে থেকে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার কথা বললেন, আর তাঁদের কেউই তাঁকে ছেড়ে যেতে প্রস্তুত হলেন না। এ সময় ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁদের সম্পর্কে তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছিলেন-

فانی اعلم اصحابا اولی و لا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ابر ولا اولاصل من اهل بیتی

'আমি আমার সাথিদের থেকে উত্তম কোন সাথি দেখতে পাইনি। আর আমার বংশধর থেকে অন্য কোন বংশধরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে বেশি কল্যাণকামী ও উপকারী দেখতে পাইনি।'[১৪৫]

অপরদিকে এ গ্রন্থগুলোতেই পাওয়া যায় যে, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর অনেক সাথি জাবালা'র মন্জিলে তাঁর দুধভাই আবদুল্লাহ বিন ইয়াক্তের শাহাদাতের খবর শুনে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়। হতাশাব্যঞ্জক খবরসমূহ শোনার পর ইমাম হোসাইন (আ.) মুসলিম, হানী ও আবদুল্লাহর শাহাদাতের খবর ঘোষণা করে বলেন,

وقد خذلتنا شيعتنا فمن احب منكم الانصراف فلينصرف ليس عليه منا ذمام

'আমাদের অনুসারীরা আমাদেরকে অপমানিত করলো, অতএব, যার ইচ্ছা সে যেন আমাদেরকে ছেড়ে চলে যায়। আমি তোমাদের ওপর থেকে আমার বাইআত উঠিয়ে নিলাম।'[১৪৬]

এ সময় ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সেনাবাহিনী থেকে কয়েকটি দল আলাদা হয়ে গেল। পরিশেষে, অল্প কিছুসংখ্যক ব্যক্তি ইমামের সাথে থাকলেন। এরা ছিলেন ঐসব ব্যক্তি যাঁরা মদীনা থেকে ইমামের সাথে রওয়ানা হয়েছিলেন!

যারা ইমাম হোসাইন (আ.)- কে পরিত্যাগ করেছিল তারা ছিল বেদুঈন। তারা মনে করেছিল, ইমাম একটি শান্ত ও অনুগত শহরে যাচ্ছেন এবং সেখানে গিয়ে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করবেন, তাই তারা ইমামের সাথে রওয়ানা হয়েছিল। [১৪৭] অতএব, তাদের আলাদা হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল।

নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে এ মনজিলের পর থেকে সাথিদের চলে যাওয়ার কথাটি আর উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে রচিত কিছু বইয়ে 'নুরুল উয়ুন' নামে একটি অখ্যাত ও অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সূত্রে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মেয়ে সাকীনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, ১০ সদস্যবিশিষ্ট ও ২০ সদস্যবিশিষ্ট কয়েকটি দল ইমামকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং ইমাম এ কারণে তাদের জন্য বদদোয়াও করেছিলেন। [১৪৮]

এ দুর্বল হাদীসটি ঐ সকল সনদসহ বর্ণিত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহের সামনে কোন ক্রমেই টিকতে পারবে না। বিশেষ করে এ মনগড়া হাদীসটি আশুরার রাতে ইমাম হোসইন (আ.)- এর পরিবার ও সঙ্গী- সাথিদের বক্তব্য এবং তাঁদের প্রশংসায় ইমামের মন্তব্যের সাথে বৈপরীত্য রয়েছে।

দ্বিতীয় অংশ : সঙ্গি- সাথির সংখ্যা

বিভিন্ন গ্রন্থে আশুরার দিনে উপস্থিত ইমামের সাথিদের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্য পেশ করা হয়েছে। [১৪৯] যেমন : তাবারীসহ কেউ কেউ ১০০ জনের কথা উল্লেখ করেছেন। আর তাঁদের মধ্যে ইমাম আলী (আ.)- এর পাঁচ জন সন্তান, বনি হাশেমের ১৬ জন ব্যক্তি ও অন্যান্য গোত্র থেকে একদল লোক ছিলেন। [১৫০]

ইবনে শাহর আশুব ৮২ জনের কথা উল্লেখ করেছেন। [১৫১]

ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে 'ইবনে নামা' নামক শিয়াদের এক পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন, ইমামের বাহিনীতে ১০০ পদাতিক ও ৪৫ অশ্বারোহী ছিলেন। [১৫২] সিবত ইবনে জাওযীও এ মতকে সমর্থন করেন। [১৫৩] শিয়াদের হাদীস গ্রন্থাবলিতে ইমাম বাকের (আ.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতও এ মতকে সমর্থন করে। [১৫৪]

ঐতিহাসিক মাসউদীর কথা বড়ই আশ্চর্যজনক। কারণ, তিনি বলেন, কারবালার ময়দানে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সাথে ছিল ৫০০ অশ্বারোহী এবং ১০০ পদাতিক। [১৫৫]

কিন্তু প্রসিদ্ধ মতে, যা এখনও প্রচলিত আছে তা হলো, কারবালার ময়দানে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর ৭২ জন সঙ্গী ছিলেন, যাঁদের মধ্যে ৩২ জন ছিলেন অশ্বারোহী এবং ৪০ জন ছিলেন পদাতিক। [১৫৬]

১২ নং প্রশ্ন : কারবালায় পুরুষদের মধ্যে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) ছাড়া অন্য কেউ কি জীবিত ছিল?

উত্তর : ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলির বিবরণ অনুযায়ী কারবালায় একদল পুরুষ জীবিত ছিলেন, যাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বনি হাশেমের আর বাকিরা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সঙ্গী।

এক. বনি হাশেম

১. ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)

২. হাসান বিন হাসান (দ্বিতীয় হাসান নামে প্রসিদ্ধ) : হাসান আশুরার দিন আহত অবস্থায় বন্দি হন। অতঃপর আসমা বিন খারেজা তাঁকে হত্যা করতে চাইলে উমর বিন সা'দ বাধা দেয়। ফলে তিনি বেঁচে যান। তিনি পরবর্তীকালে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মেয়ে ফাতেমাকে বিয়ে করেন এবং ৩৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি কিছুদিন হযরত আলী (আ.)- এর ওয়াকফ ও সাদকা বিভাগের মোতাওয়াল্লী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। [১৫৭] হাসান বিন হাসান আবদুল্লাহ বিন হাসানের (যিনি আবদুল্লাহ মাহাজ নামে পরিচিত) পিতা ছিলেন, আর আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ (নাফসে যাকিয়া)- এর পিতা ছিলেন। আবদুল্লাহ ছিলেন সর্ব প্রথম ব্যক্তি যিনি পিতা- মাতা উভয় দিক থেকে হযরত আলী (আ.)- এর বংশধর ছিলেন। এজন্য তাঁকে আবদুল্লাহ মাহাজ বা আল্লাহর খালেস বান্দা বলা হতো।

৩. যায়েদ বিন হাসান (আ.) : তিনিও ইমাম হাসান (আ.)- এর সন্তান ছিলেন। কতিপয় গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি কারবালায় উপস্থিত ছিলেন। [১৫৮] তিনি ৯০ বছর জীবিত ছিলেন এবং বনি হাশেমের একজন প্রবীণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতেন। তিনি দীর্ঘদিন মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইতের সাদকা বিভাগের মোতাওয়াল্লি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। [১৫৯]

৪. আমর (উমর) বিন হাসান (আ.) :কতিপয় গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি কারবালায় উপস্থিত ছিলেন এবং কারবালার ঘটনার পরও জীবিত ছিলেন। [১৬০]

৫. মুহাম্মাদ বিন আকীল।

৬. কাসেম বিন আবদুল্লাহ্ বিন জাফার। [১৬১]

দুই. অন্য সাথিরা

১. উকবা বিন সামআন : তিনি ইমাম হোসাইন (আ.)- এর স্ত্রী রোবাবের দাস ছিলেন। তাঁকে আশুরার দিন বন্দি করা হয় এবং উমর বিন সাদের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। উমর বিন সাদ যখন শোনে যে, তিনি একজন দাস, তখন তাঁকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়। [১৬২]

২. জাহহাক বিন আবদুল্লাহ মাশরেকী : সে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সাথে চুক্তি করেছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইমামের সঙ্গী- সাথিরা থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে তাঁর সাথে থাকবে। আর ইমাম যখন একাকী হয়ে পড়বে তখন সে ইমামকে ছেড়ে চলে যেতে পারবে। এ কারণে সে আশুরার দিন শেষ মুহূর্তে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কাছে আসে এবং চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইমাম হোসাইন (আ.) তাকে সত্যায়ন করে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ মুহূর্তে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবে? অতঃপর বলেন : 'যদি পার, নিজেকে রক্ষা করো। আর আমার পক্ষ থেকে কোন বাধা নেই।'

সে একথা শোনার পর স্বীয় ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে যুদ্ধ করতে করতে শত্রুবাহিনীর দুই ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে অলৌকিকভাবে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। [১৬৩] ঐতিহাসিকগণ পরবর্তীকালে আশুরার ঘটনাবলি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তাকে একজন রাবী বা বর্ণনাকারী হিসেবে ব্যবহার করেন। [১৬৪]

৩. গোলাম আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আনসারী : সে কারবালার ময়দানে উপস্থিত ছিল এবং কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছিল। সে বলে : 'যখন দেখলাম, সাথিরা সবাই শহীদ হয়ে গেল তখন যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করি।'[১৬৫]

৪. মুরাক্কাআ বিন সুমামা আসাদী।

৫. মুসলিম বিন রেবাহ্ মাওলা আলী। [১৬৬]

ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে লিখিত কারবালার ঘটনার অধিকাংশই উপরোল্লিখিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শাহরবানুর পরিণতি

১৩ নং প্রশ্ন : তৃতীয় ইয়াজদ্ গের্দের কন্যা শাহরবানু কি ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর মাতা ছিলেন? তিনি কি কারবালার ময়দানে উপস্থিত ছিলেন? ইমাম হোসাইন (আ.)- এর

নির্দেশে তাঁর ইরানে পালিয়ে যাওয়া এবং তেহরানে দাফন হওয়ার ঘটনা- যে স্থান 'বিবি শাহরবানুর মাযার' নামে পরিচিত, এর সত্যতা কতটুকু?

উত্তর : পরবর্তী যুগে লিখিত গ্রন্থাবলিতে- যেগুলোতে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ থেকে খেয়াল-খুশিমত উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে- এরকম এসেছে :

কতিপয় নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে এসেছে যে, শাহরবানু (যিনি কাসেমের স্ত্রী ফাতেমার মাতা ছিলেন এবং কারবালার ময়দানে উপস্থিত ছিলেন) ইমাম হোসাইন (আ.)- এর নির্দেশে তাঁর ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেন যাতে নিয়তি- নির্ধারিত ভূখণ্ডে পৌঁছতে পারেন। তিনি আল্লাহর হুকুমে এক ঘণ্টায় রেই শহরে পৌঁছে যান। আর ঐ এলাকায় আবদুল আযীম হাসানীর মাযারের পাশে অবস্থিত একটি পাহাড়ে তাঁকে দাফন করা হয়। [১৬৭]

ঐ কিতাবে এটাও বলা হয়েছে যে, মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি আছে যে, পাহাড়ের চূড়ায় মহিলাদের স্কার্ফের টুকরার মতো একটি জিনিস দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে কোন পুরুষ লোক, এমনকি যে মহিলার পেটে ছেলেসন্তান আছে সেও সেখানে যেতে পারে না। [১৬৮]

এটা প্রচলিত আছে যে, তিনি যখন রেই শহরে পৌঁছান, তখন হুয়া (هو) বা আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন, কিন্তু ভুলক্রমে হুয়া (هو)- এর জায়গায় পাহাড় (كوه) বলে ফেলেছিলেন। এজন্য সেখানেই পাহাড় তাঁকে নিজের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয় এবং নিজের মধ্যে গোপন করে ফেলে।[১৬৯]

হয়তো কারো কারো কাছে কারবালায় ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর মাতার উপস্থিত না থাকা এবং উপরিউক্ত ঘটনাগুলো কাল্পনিক হওয়ার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট; তাই তাদের জন্য এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে যেহেতু সাধারণ মানুষের মাঝে, এমনকি গবেষকদের মাঝেও অনেক কথা প্রচলিত আছে সেহেতু তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করাটা প্রয়োজন বলে মনে করছি।

বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত আলোচনার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর মাতা

শিয়া- সুন্নি নির্বিশেষে উভয় মাযহাবের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করে বুঝতে পারি যে, শিয়া মাযহাবের ইমামদের মধ্যে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর মায়ের নামের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি মতানৈক্য রয়েছে। কোন কোন বিশ্লেষক বিভিন্ন গ্রন্থ বিশ্লেষণ করে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর মায়ের ১৪ টি নাম[১৭০], আবার কোন কোন বিশ্লেষক ১৬ টি নাম[১৭১] উল্লেখ করেছেন।[১৭২]

এ নামগুলো হলো যথাক্রমে :

১. শাহরবানু, ২. শাহরবানুয়ে, ৩. শাহজানান, ৪. জাহান শাহ, ৫. শাহজানান, ৬. শাহরনাজ, ৭. জাহানবানুয়ে, ৮. খাওলা, ৯. বাররা, ১০. সালাফা, ১১. গাজালা, ১২. সালামা, ১৩. হারার, ১৪. মারইয়াম, ১৫. ফাতেমা, ১৬. শহরবান।

যদিও আহলে সুন্নাতের ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে সালাফা, সালামা ও গাজালা নামসমূহের ওপর বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, [১৭৩] কিন্তু শিয়াদের গ্রন্থগুলোতে বিশেষ করে তাদের হাদীস গ্রন্থগুলোতে শাহরবানু নামটি বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কতিপয় গবেষকের মতে, [১৭৪] সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ বিন হাসান সাফফার কুম্মী (মৃত্যু ২৯০ হিজরি) লিখিত 'বাসায়েরুদ দারাজাত' গ্রন্থে এ নামটি দেখা যায়। [১৭৫] পরবর্তীকালে শিয়াদের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা কুলাইনী (র.) (মৃত্যু ৩২৯ হিজরি) এ নাম সংক্রান্ত হাদীসটি এ কিতাব থেকে তাঁর 'কাফী' কিতাবে উল্লেখ করেন। [১৭৬] অন্যান্য গ্রন্থসমূহ হয় এ দুই কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে নতুবা দুর্বল ও নির্ভরযোগ্য কোন সনদ ছাড়াই বর্ণিত হাদীস থেকে নিজেদের কিতাবে উল্লেখ করেছে। [১৭৭]

এ হাদীসে এরকম এসেছে :

যখন ইয়াজদ্ গের্দের কন্যাকে হযরত উমরের নিকট নিয়ে আসা হলো, মদীনার মেয়েরা তাকে দেখার জন্য খুব উৎসুক হয়ে পড়লো, অতঃপর যখন সে মসজিদে প্রবেশ করলো, মসজিদ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। হযরত উমর তার দিকে তাকালেন। সে তখন নিজের মুখ ঢেকে ফেললো আর বললো : 'হায় আফসোস! আমার কপাল পুড়ে গেল।' হযরত উমর বললেন : 'এই মেয়ে আমাকে গালি দিচ্ছে।' এ বলে তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। হযরত আলী (আ.) হযরত উমরকে বললেন : তাঁর ব্যাপারে তোমার কোন অধিকার নেই। তাকে ছেড়ে দাও, সে যেন

নিজেই কোন মুসলমান ব্যক্তিকে বাছাই করে। আর যাকে বাছাই করবে তার গনীমতের মাল হিসেবে এ মেয়েকে হিসাব করবে।' হযরত উমর তাকে ছেড়ে দিলেন। মেয়েটি এসে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মাথার ওপর হাত রাখল। আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) তাকে বললেন : 'তোমার নাম কী?' সে বলল : 'জাহান শাহ্।' হযরত আলী (আ.) বললেন : 'না, তোমার নাম শাহরবানু রাখা হলো।'

অতঃপর ইমাম হোসাইন (আ.)- কে বললেন : 'হে আবা আবদিল্লাহ্! এ মেয়ে থেকে তোমার জন্য জমীনের ওপর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ হবে।' আর ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) তাঁর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়। এ ইমামকে দুই বাছাইকৃত ব্যক্তির সন্তান বলা হতো। কারণ একজন হাশেমী বংশের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাছাইকৃত ব্যক্তি ছিল, আর অন্যজন ছিল পারাস্যবাসীদের মধ্যে বাছাইকৃত ব্যক্তি। [১৭৮]

উপরিউক্ত হাদীসটি সনদ ও মাত্ন উভয় দিক থেকে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। সনদের দিক থেকে এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে ইবরাহীম বিন ইসহাক আহমার[১৭৯] ও আমর বিন সীমারে'র মতো কতিপয় ব্যক্তি আছে যারা অতিরঞ্জনকারী হিসেবে খ্যাত এবং শিয়া রেজাল শাস্ত্রবিদদের পক্ষ থেকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে গৃহীত হয়নি। [১৮০]

অপরদিকে মাত্নের দিক থেকে নিম্নবর্ণিত সমস্যাগুলো আছে :

১. ইয়াজদ গের্দের কোন মেয়ের বন্দি হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

২. উমরের শাসনামলে এ মেয়ের বন্দি হওয়া এবং ঐ সময়েই ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সাথে তার বিয়ে হওয়ার ঘটনা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. এ হাদীস ছাড়া শিয়াদের কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর উপাধি হিসেবে 'দুই বাছাইকৃত ব্যক্তির সন্তান' (ابن الخيرتين) - এর উল্লেখ নেই।

এখানে কি একরকম বাড়াবাড়ি ইরানী জাতীয়তাবাদী মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে না? যারা তাদের ধারণায় ভেবেছিল নবী- বংশের সাথে সাসানী বংশের সম্পর্ক জুড়ে দেয়ার মাধ্যমেই কেবল ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- কে 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি' হিসেবে প্রমাণ করা যাবে।

শাহরবানুর নাম সম্বলিত বর্ণনার ওপর এ ধরনের ত্রুটি থাকায় এ বর্ণনাগুলোকে ইমামদের পবিত্র সত্তা থেকে দূরে এবং জাল হাদীস রচনাকারীদের অপকর্ম বলে মনে করাই বাঞ্ছনীয়। আর তাই শাহরবানু নামটি ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর মায়ের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম যায়নুল (আ.)- এর মায়ের বংশ পরিচয় নিয়েও হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থগুলোর মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কতিপয় মনীষী, যেমন ইয়াকুবী (মৃত্যু ২৮১ হিজরি)[১৮১], মুহাম্মাদ বিন হাসান কুম্মী[১৮২], কুলায়নী (মৃত্যু ৩২৯ হিজরি)[১৮৩], মুহাম্মাদ বিন হাসান সাফফা কুম্মী (মৃত্যু ২৯০ হিজরি)[১৮৪], শেখ সাদুক (মৃত্যু ৩৮১ হিজরি)[১৮৫] এবং শেখ মুফীদ (মৃত্যু ৪১৩ হিজরি)[১৮৬] তাকে ইয়াজদ গের্দের কন্যা বলে মনে করেন, যদিও তাঁর নামের ব্যাপারে কোন ঐকমত্য নেই।

পরবর্তী যুগের গ্রন্থগুলোতে এ বংশ পরিচয় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আর এ গ্রন্থগুলোতে অন্য মতামতগুলো মোটেই স্থান পায়নি। [১৮৭]

উপরিউক্ত মতের বিপরীতে, পূর্ববতী ও পরবর্তী যুগের কিছু কিছু গ্রন্থে অন্যান্য মতামত, যেমন সিস্তানী বংশোদ্ভুত অথবা সিন্ধি বংশোদ্ভুত অথবা কাবুলী বংশোদ্ভুত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কোন কোন গ্রন্থে তাঁর বন্দি হওয়ার জায়গা উল্লেখ না করে শুধু উম্মে ওয়ালাদ (যে দাসী মনিবের থেকে সন্তান প্রসব করেছে) হিসেবে তাঁকে স্মরণ করা হয়েছে। [১৮৮] কোন কোন লেখক ইরানের কতিপয় বুজুর্গ ব্যক্তি, যেমন সুবহান, মেনজান, নুশজান এবং শিরাভাইকে তাঁর পিতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। [১৮৯]

এ বংশ পরিচয় সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার জন্য এ মতামতগুলোর সনদ সম্পর্কিত আলোচনার ওপর ভরসা করা যাবে না। তার কারণ হলো, কোন মতামতেরই সূদৃঢ় সনদ নেই। এটা ছাড়াও অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থ, যেমন 'তারীখে ইয়াকুবী' কোন সনদ ছাড়াই স্বীয় বক্তব্য পেশ করে থাকে।

অতএব, মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই এগুলোর বিশ্লেষণ করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ত্রুটিগুলো পরিলক্ষিত হয়:

১. সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো, তাঁর নামের ব্যাপারে এ বর্ণনাগুলোর মধ্যে মতানৈক্য বিরাজমান। যেমন পূর্বে উল্লিখিত ইতিহাস গ্রন্থগুলো তাঁর বিভিন্ন নাম, যেমন হারার, শাহরবানু, সালাখে, গাজালা ইত্যাদি উল্লেখ করেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ বর্ণনাগুলো বিভিন্ন জালকারী একই উদ্দেশ্য নিয়ে জাল করেছে। আর তা হলো ইরানী গোঁড়া জাতীয়তাবাদী চিন্তা। এভাবে তারা বংশগতভাবে ইমামদের সাথে ইরানীদের সম্পর্ক স্থাপন করানোর চেষ্টা করেছে যাতে নিজেদের ধারণানুযায়ী ইজাদী (ইরানী রাজবংশ) ও শাহী রক্তকে সাসানীদের থেকে ইমামদের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে বলতে পারে।

২. আরেকটি ত্রুটি হলো, তাঁর বন্দি হওয়ার সময়কাল নিয়ে এ বর্ণনাগুলোর মতানৈক্য। কোন কোন লেখক হযরত উমরের শাসনামলে, কেউ কেউ হযরত উসমানের শাসনামলে, আবার শেখ মুফীদ সহ কতিপয় লেখক হযরত আলী (আ.)- এর খেলাফতকালে বন্দি হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। [১৯০]

৩. তারীখে তাবারী ও তারীখে ইবনে আসীরের মতো বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ যেখানে সাল অনুযায়ী ইরানীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের ঘটনাগুলো এবং ইরানের বিভিন্ন শহরে ইয়াজ্দগের্দের পলায়নের ঘটনা তুলে ধরেছে, সেখানে তাঁর সন্তানদের বন্দি হওয়ার কোন কথাই তুলে ধরেনি; যদিও এ গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত অনেক তুচ্ছ ঘটনার চেয়ে এটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজ্দগের্দের কন্যাদের বন্দি হওয়ার ঘটনাগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট।

৪. প্রথম যুগের কতিপয় লেখক, যেমন মাসউদী তৃতীয় ইয়াজ্দগের্দের সন্তানদের নাম বর্ণনা করার সময় আদরাক, শাহীন ও র্মাদ আভান্দ নামে তাঁর তিনটি মেয়ের কথা তুলে ধরেন যেগুলো প্রথমত ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর মায়ের জন্য যেসব নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার কোনটির সাথে মিল রাখে না, দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর গ্রন্থে তাদের বন্দি হওয়ার কোন কথাই উল্লেখ করেননি। [১৯১]

৫. ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর মায়ের সম্পর্কে ঐতিহাসিক সনদগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো নাফেস যাকিয়া নামে প্রসিদ্ধ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহর কাছে প্রেরিত মনসুরের চিঠিগুলো। নাফেস যাকিয়া মদীনায় আলাভী ও তালেবীদের (আবু তালেবের বংশধর) আব্বাসীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতেন। এজন্য সবসময় মুহাম্মাদ ও মনসুরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকত।

এ চিঠিগুলোর একটিতে মুহাম্মাদের বংশ- গৌরবের বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে মনসুর লিখে যে, 'মহানবী (সা.)- এর ওফাতের পর তোমাদের মাঝে আলী বিন হোসাইন (যয়নুল আবেদীন আ.)- এর চেয়ে উত্তম কেউ জন্মগ্রহণ করেনি, আর সে ছিল একজন দাসীর সন্তান।'[১৯২]

অর্থাৎ মহানবী (সা.)- এর ওফাতের পর তোমাদের মাঝে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী কারো আবির্ভাব ঘটেনি, আর তিনি ছিলেন উম্মে ওয়ালাদের (যে দাসী সন্তান প্রসব করেছে) সন্তান।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, মুহাম্মাদ কিংবা অন্য কারো পক্ষ থেকে এ চিঠির কোন প্রতিবাদ শোনা যায় না যে, ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) দাসীর সন্তান ছিলেন না; বরং ইরানী শাহজাদীর সন্তান ছিলেন! অতএব, এ ঘটনা যদি সত্য হতো অবশ্যই মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ্ জবাব দেওয়ার জন্য এ ঘটনার প্রতি ইশারা করতেন।

পরিশেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর জন্য এ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একজন ইরানী মা তৈরি করার ক্ষেত্রে হাদীস জালকারীদের হাত ছিল। আর তাঁরা ইচ্ছা করেই তাঁর মায়ের সম্পর্কে অন্য মতামতগুলো বিশেষ করে সিন্ধি কিংবা অন্য শহরের অধিবাসী হওয়ার মতকে না দেখার ভান করেছে, অথচ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত অধিকাংশ ঐতিহাসিক তাঁকে সিন্ধু কিংবা কাবুলের দাসী বলে মনে করতেন। [১৯৩]

কারবালায় ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর মায়ের অনুপস্থিতি

এ সম্পর্কে অবশ্যই বলতে হবে যে, শিয়াদের প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থগুলোর প্রায় সবকটিই যেগুলোতে বন্দি হওয়ার পর ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর মায়ের জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাতে এরকম লেখা হয়েছে যে, তিনি ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর জন্মের সময়ই মারা যান।[১৯৪]

এ রকমও বলা হয়েছে যে, হযরত আলী (আ.)- এর এক দাসী ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর দুধমাতা হিসেবে তাঁকে বড় করার দায়িত্ব পালন করেন, এজন্য মানুষ মনে করত, তিনি ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর মাতা। পরবর্তীকালে ইমাম আলী (আ.) যখন ঐ দাসীকে বিয়ে দেন তখন মানুষ বুঝতে পারে যে, তিনি ছিলেন ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর দুধমাতা, তাঁর আসল মাতা নয়।[১৯৫]

অতএব, নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে, ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর মায়ের নাম ও বংশ পরিচয় যা- ই হোক না কেন তিনি কারবালায় উপস্থিত ছিলেন না।

বিবি শাহ্রবানুর মাযার

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে বিশেষত ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর জন্মের পর তাঁর মায়ের জীবিত না থাকাটা প্রমাণিত হওয়া থেকে এ শিরোনাম নিয়ে আলোচনার অনাবশ্যকতা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। একই রকমভাবে বর্তমান যুগের গবেষকদের কাছে অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, রেই শহরের পূর্বের পাহাড়ি অঞ্চলে বিবি শাহরবানুর পাহাড় নামে প্রসিদ্ধ পাহাড়ের চূড়ায় শাহরবানুর যে মাযার রয়েছে তাঁর সাথে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর মায়ের কোন সম্পর্ক নেই। বরং এটি একটি স্থাপত্য যা পরবর্তী যুগে তৈরি করা হয়েছে। যেমন: সেখানে যে সিন্দুক রাখা আছে তাতে সেটার প্রস্তুতকাল লেখা আছে ৮৮৮ হিজরি এবং সাফাভীদের আমলে (৪৫০ বছর পূর্বে) একটি কারুকার্যখচিত দরজাও তৈরি করা হয়েছে। এ দরজায় কাজারী আমলের (২০০ বছর পূর্বের) শিল্পের নমুনাও চোখে পড়ে।[১৯৬] যদিও শেখ সাদুক (র.) দীর্ঘদিন রেই শহরে বসবাস করেছেন এবং এ শহরের সাথে ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন

তবুও তিনি স্বীয় গ্রন্থে এ মাযারের কোন কথাই উল্লেখ করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, চতুর্থ শতাব্দীতে এবং শেইখ সাদুকের (ওফাত ৩৮১ হিজরি) আমলে এ মাযারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। অন্যান্য লেখকও যাঁরা আবদুল আজীম হাসানীসহ রেই শহরে শায়িত বড় বড় ব্যক্তিত্বের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরাও এ মাযারের কোন কথাই আলোচনা করেন নি।

সম্ভবত পরবর্তী যুগে শাহরবানু নামে কোন পরহেজগার মহিলাকে এ জায়গায় দাফন করা হয়েছে আর এর ফলে দীর্ঘদিন পর ঐ এলাকার জনগণ তাঁকে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর মা মনে করে ভুলের মধ্যে নিপতিত হয়েছে। কারণ, ঐ সময় যিনি শাহরবানু নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন তিনি হলেন ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর মাতা। অথবা কতিপয় ব্যক্তি মানুষকে এ ভুলের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এ ভুলকে চালু করার জন্য চেষ্টা করেছে।[১৯৭]

ইয়াযীদের তওবা

১৪ নং প্রশ্ন : ইয়াযীদ কি তওবা করেছে? আর মূলত এ রকম ব্যক্তির তওবা কি গ্রহণযোগ্য হবে?

উত্তর : এ প্রশ্নের দু'টি দিক রয়েছে: ইতিহাস ও কালামশাস্ত্র। দ্বিতীয় অংশটি বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদেরকে প্রথমত অন্য কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে। যেমন এ ধরনের ব্যক্তির এত বড় অপরাধের পর তওবার তওফিক লাভ করা সম্ভব কিনা, তাঁর তওবা খাঁটি ছিল নাকি লোকদেখানো, যেসব আয়াত ও হাদীস তওবার দরজা সবার জন্য খোলা বলে উল্লেখ করেছে সেগুলোতে ব্যতিক্রম কিছু আছে কিনা ইত্যাদি। তবে এ প্রশ্নগুলো তখনই উত্থাপিত হবে যখন ইতিহাসের বর্ণনা থেকে সাব্যস্ত হবে যে, ইয়াযীদ অপরাধ করার পর অনুতপ্ত হয়েছে এবং মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। কিন্তু ইতিহাসের বর্ণনায় এর বিপরীতটা সাব্যস্ত হলে মূল প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের কোন আলোচনাই করা হবে না।

ইসলামী ইতিহাসের কাল পরিক্রমায় যদিও অধিকাংশ ইতিহাসবিদ, মুহাদ্দিস ও অন্যান্য ইসলাম বিশেষজ্ঞ ইয়াযীদকে একজন অপরাধী হিসেবে সনাক্ত করেছেন এবং তার অপরাধমূলক

কার্যকলাপে বিশেষ করে আশুরার বিয়োগান্ত ঘটনা সৃষ্টিতে তাকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু এর মাঝে কতিপয় ব্যক্তি, যেমন গাজ্জালী তাঁর 'ইহইয়াউল উলুম' গ্রন্থে ইয়াযীদকে অভিসম্পাত দেয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। আর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াযীদের তওবা করার সম্ভাবনা আছে।

ইসলামী বিশ্বে গাজ্জালীর চিন্তার প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁর বক্তব্য গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। আর ঐ সময়েই তাঁর সমসাময়িক কালের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ, যেমন ইবনে জাওযী (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরি) তাঁর এ মতের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন এবং এ বিষয়ের ওপর 'আর- রাদ্দু আলাল মুতাআস্সিবিল আনীদ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

কিন্তু যুগে যুগে কতিপয় মধ্যপ্রাচ্যবিদ, যেমন ল'ম্যানস (ইহুদি লেখক) 'দায়েরাতুল মাআরেফে ইসলাম' (প্রথম মূদ্রণ) নামক গ্রন্থে এ ধরনের কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। বর্তমান যুগেও কোন কোন ইসলামী মাহফিলে এ ধরনের বক্তব্য অন্য রকমভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। ফলে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। ইয়াযীদের তওবা সম্পর্কে ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে যা এসেছে তা নিম্নরূপ :

১. ইবনে কুতায়বা 'আল- ইমামাহ্ ওয়াস সিয়াসাহ'[১৯৮] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কারবালার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর ইয়াযীদের দরবারের অবস্থা এরকম হয়েছিল-

فبكى يزيد حتى كادت نفسه تفيض

আর্থাৎ ইয়াযীদ এত ক্রন্দন করেছিল যে, তার প্রাণ বের হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

২. ইয়াযীদ তার রাজপ্রাসাদে শহীদদের মাথা ও কারবালার বন্দিদের প্রবেশের পর তাদের দেখে প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং এ লোমহর্ষক ঘটনাটি ইবনে যিয়াদের কীর্তি বলে অভিহিত করে। আর সে বলে-

لعن الله ابن مرجانة لقد بغضني الى المسلمين و زرع لى فى قلوبهم البغضاء

'উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক। কারণ, সে মুসলমানদের কাছে আমাকে ঘৃণিত করে তলেছে এবং তাদের অন্তরে আমার সাথে শত্রুতার বীজ বপন করেছে।[১৯৯]

অন্য একটি বক্তব্যে এসেছে : ইয়াযীদ নিজেকে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর বিরোধিতার মোকাবিলায় ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছে এবং মহানবী (সা.)- এর সাথে ইমাম হোসাইনের রক্তের সম্পর্ক থাকার কারণে সে ইমামের নিহত হওয়ার ব্যাপারে মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। এজন্য সে এ কাজটির দায়- দায়িত্ব সরাসরি ইবনে যিয়াদের ওপর আরোপ করে।[২০০]

৩. কারবালার কাফেলাকে মদীনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করার সময় ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- কে সম্বোধন করে ইয়াযীদ বলে : 'উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক! আল্লাহর শপথ, আমি যদি হোসাইনের মুখোমুখি হতাম তাহলে তাঁর সকল মনোবাসনা পূর্ণ করতাম এবং যেভাবেই সম্ভব হতো তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতাম, এমনকি একাজ করতে গিয়ে আমার ছেলেরা মারা গেলেও তা করতাম!'[২০১]

ওপরের বর্ণনাগুলো যদি আমরা মেনে নিই এবং সেগুলোর সনদের ব্যাপারে কোন আপত্তি উত্থাপন না করি তাহলে এ বর্ণনাগুলো থেকে কয়েকটি বিষয় আমরা বুঝতে পারি :

ক. কারবালার ঘটনার প্রধান অপরাধী ছিল ইবনে যিয়াদ। ইয়াযীদ ইমাম হোসাইন (আ.)- কে হত্যা করার জন্য কিংবা তাঁর ওপর কোন চাপ সৃষ্টির জন্য কোন নির্দেশই দেয়নি!

খ. ইবনে যিয়াদের একাজে ইয়াযীদ খুব রাগান্বিত হয় এবং তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে!

গ. ইমাম হোসাইনকে হত্যা করার জন্য ইয়াযীদ খুব আফসোস করে।

প্রথম বিষয়ের ব্যাপারে বলা যায় যে, ইতিহাস গ্রন্থগুলো ইয়াযীদের এসব দাবি ভিত্তিহীন ও মিথ্যা ছিল বলেই সাক্ষ্য দেয়। কেননা, ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে এসেছে যে, ইয়াযীদ হুকুমাত লাভ করার সাথে সাথে স্বীয় পিতার অসিয়ত মোতাবেক মদীনার গভর্নর ওয়ালীদ বিন উতবার কাছে লিখিত প্রথম চিঠিতে বলে : 'আমার চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছবে তাখন হোসাইন ও ইবনে জোবায়েরকে হাজির করে তাদের কাছ থেকে আমার জন্য বাইআত গ্রহণ কর। আর যদি বাইআত

করতে রাজি না হয় তাহলে তাদেরকে হত্যা করে তাদের মাথাগুলো আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।’[২০২]

একই রকম ভাবে কোন কোন গ্রন্থে এসেছে যে, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মক্কায় অবস্থানকালে ইয়াযীদ একদল গুপ্তচরকে গোপনে হজ করার উদ্দেশ্যে পাঠায়, যাতে তারা হজের আচার-অনুষ্ঠান পালন করার সময় কাবা শরীফের পাশে ইমাম হোসাইনকে হত্যা করতে পারে।[২০৩] উল্লেখ্য, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ইয়াযীদের কাছে লিখিত স্বীয় চিঠিতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন।[২০৪]

আবার কোন কোন গ্রন্থে এসেছে, ইরাকের উদ্দেশে ইমাম হোসইন (আ.)- এর রওয়ানা হওয়ার সময় ইয়াযীদ, ইবনে যিয়াদের কাছে চিঠি লিখে বলে যে, সে যেন কঠোরভাবে ইমাম হোসাইনের অগ্রযাত্রাকে রোধ করে।[২০৫] পরবর্তীকালে ইবনে যিয়াদ স্বীকার করে যে, সে ইয়াযীদের পক্ষ থেকে ইমাম হোসাইনকে হত্যা করার নির্দেশ পেয়েছিল।[২০৬]

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ইয়াযীদের কাছে লিখিত চিঠিতে সুস্পষ্টভাবে তাকেই ইমাম হোসাইন (আ.) এবং বনি আবদুল মুত্তালিবের যুবকদের হত্যাকারী হিসেবে উল্লেখ করে এভাবে তাকে তিরস্কার করেছেন :

قتلت الحسين لا حتَسبنّ لا ابا لك نسيت قتلك حسينا و فتيان بنى عبد المطلب

অর্থাৎ তুমিই ইমাম হোসাইনকে হত্যা করেছ, আর এটা মনে করো না যে, ইমাম হোসাইন এবং বনি আবদুল মুত্তালিবের যুবকদেরকে তোমার নির্দেশে হত্যা করার বিষয়টি আমি ভুলে গেছি।[২০৭]

ঐ সময় এ বিষয়টি এতই সুস্পষ্ট ছিল যে, পরবর্তীকালে তার ছেলে মুয়াবিয়া বিন ইয়াযীদ দামেশক জামে মসজিদের মিম্বারে স্বীয় পিতাকে এ ব্যাপারে ভর্ৎসনা করে বলে-

و قد قتل ع ترة الرسول

- সে নবী- বংশকে হত্যা করেছে।[২০৮]

পরিশেষে বলা যায় যে, ইয়াযীদের নির্দেশে ইমাম হোসাইন (আ.)- কে হত্যা করার ব্যাপারে ঐতিহাসিক সাক্ষ্যগুলো এতই সুস্পষ্ট যে, কোন নিরপেক্ষ বিশ্লেষকের পক্ষে তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।[২০৯]

দ্বিতীয় বিষয়ের ব্যাপারে অর্থাৎ ইবনে যিয়াদের অপরাধের কারণে ইয়াযীদের রাগান্বিত হওয়ার ব্যাপারে বলা যায় যে, ঐতিহাসিক সাক্ষ্যগুলো প্রমাণ করে যে, ইয়াযীদ প্রথমে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শাহাদাতের খবর শুনে খুব খুশি হয় এবং ইবনে যিয়াদের প্রশংসা করে। সিবত ইবনে জাওযী, ইবনে যিয়াদের ব্যাপারে ইয়াযীদের অনেক প্রশংসার কথা, তার জন্য বহু মূল্যবান উপহার পাঠানো, রাত্রিবেলায় তাকে নিয়ে মদপানের মজলিসের আয়োজন এবং তাকে স্বীয় পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে তুলে ধরার বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। তিনি ইয়াযীদের কতগুলো কবিতা তুলে ধরেছেন যেগুলোতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াযীদ ইমাম হোসাইনকে হত্যা করার জন্য ইবনে যিয়াদের খুব প্রশংসা করেছে এবং তার ওপর খুশি হয়েছে।[২১০]

একই রকমভাবে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইরাক থেকে ইবনে যিয়াদকে অপসারণ করার জন্য ইয়াযীদ কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি; বরং ৬৩ হিজরিতে আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের বিদ্রোহ করার সময় ইয়াযীদ তাকে বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে বলে।[২১১]

অতএব, ইবনে যিয়াদের ওপর ইয়াযীদের রাগান্বিত হওয়াটাকে লোকদেখানো মনে করতে হবে যা সে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) ও হযরত যায়নাব (সা.আ.)- এর বক্তব্যের পর অবস্থা পরিবর্তন এবং প্রতিবাদমুখর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কারণে করেছিল, যাতে এ অপরাধের কারণে তার ওপর সৃষ্ট মানুষের ঘৃণা ও বিদ্বেষ দূর করতে পারে।

তৃতীয় পয়েন্টটি অর্থাৎ ইমাম হোসাইন (আ.) নিহত হওয়ার কারণে ইয়াযীদের আফসোস করার ব্যাপারেও ইতিহাস এর বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। কারণ, ইতিহাস বলে যে, শহীদদের মাথা এবং বন্দিদের দামেশকে ও ইয়াযীদের মজলিসে প্রবেশ করার পরপরই ইয়াযীদ আনন্দ প্রকাশ করে এবং লাঠি দিয়ে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর দন্ত মোবারকে আঘাত করে।[২১২] একই রকমভাবে

কতগুলো কবিতা আবৃত্তি করে যেগুলোতে সে বনি উমাইয়ার পক্ষ থেকে বনি হাশেমের ওপর বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার কথা তুলে ধরে।[২১৩] কেননা, বদর যুদ্ধে তার নানা উতবা, মামা ওয়ালিদ এবং কোরাইশ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)- এর ভ্রাতা হযরত আলী ও চাচা হযরত হামযার হাতে নিহত হয়েছিল।

এ কবিতাগুলোতে সে মূলত মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছে এবং সেটাকে ক্ষমতা লাভের মাধ্যম হিসেবে মনে করেছে :

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحی نزل

'বনি হাশেম ক্ষমতা নিয়ে খেলা করেছে; না আসমান থেকে কোন খবর এসেছে, আর না ওহী নাযিল হয়েছে।'[২১৪]

অতএব, বলা যায় যে, বাহ্যিকভাবে ইয়াযীদের শোক প্রকাশের ঘটনাটা অবস্থা পরিবর্তিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটেছিল। কেননা, আনন্দ প্রকাশ অব্যাহত রাখলে তা জনগণের পক্ষ থেকে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

উপরিউক্ত আলোচনার শেষে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি:

১. ইয়াযীদের কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তার শোক প্রকাশ করাটা একান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছিল। আর তার কথার মধ্যে তওবা, অনুশোচনা এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসার কোন চিহ্নই দেখা যায় না।[২১৫]

অতএব, তার শোক প্রকাশ করাটাকে রাজনৈতিক উদ্দ্যেশ্যেই ছিল বলে ধরতে হবে এবং তওবার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাই তওবা করা সত্ত্বেও তার প্রতি লানত প্রেরণ করা জায়েয কিনা সে ব্যাপারে আলোচনা করার প্রয়োজনই নেই।

২. যদি মেনে নিই যে, ইয়াযীদ আসলে তওবা করেছে, তাহলে অবশ্যই তার পরবর্তী কার্যকলাপে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাবে। অথচ আমরা দেখতে পাই যে, ইতিহাস তার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। কারণ, ইয়াযীদ আশুরার ঘটনার পর তার হুকুমতের বাকি ২ বছরেও দু'টি বড় ধরনের অপরাধ সংঘটিত করেছিল:

ক. মদীনার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা, তিন দিনের জন্য ঐ পবিত্র ভূমিতে নিজ সেনাবাহিনীর জন্য সবধরনের অপকর্ম (হত্যা, লুটতরাজ ও ধর্ষণ) বৈধ করে দেয়া এবং সেখানে বসবাসকারী মহানবী (সা.)- এর অসংখ্য সাহাবী ও তাঁদের সন্তানদেরকে হত্যা করা- যা ইসলামের ইতিহসে 'হাররার ঘটনা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[২১৬]

খ. মক্কায় হামলা করার নির্দেশে দেয়া, যার ফলে তার সেনাবাহিনী মিনজানিক (পাথর নিক্ষেপক) দিয়ে এ শহরে হামলা করে এবং কাবা শরীফের অবমাননা করে। এছাড়া মিনজানিক দিয়ে আগুন ছুঁড়ে কাবা শরীফকে জ্বালিয়ে দেয়।[২১৭]

অতএব, ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ইয়াযীদের তওবা করার কোনই প্রমাণ নেই; বরং তার সকল কার্যকলাপ প্রমাণ করে যে, সে তওবাই করেনি। অতএব, ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করা যে জায়েয, এ ব্যাপারে মুসলমানদের কোন সন্দেহ- সংশয়ের অবকাশ নেই।

আহলে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ কতিপয় আলেম ইয়াযীদের কাফির হওয়াকে নিশ্চিত বলেছেন ও তাকে লানত করা জায়েয বলেছেন এবং তাঁরা নিজেরাও তাকে লানত করেছেন। তন্মধ্যে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ইবনে জাওযী, কাযী আবু ইয়ালী, জাহিয, আল্লামা তাফতাযানী ও আল্লামা সুয়ূতীর নাম উল্লেখযোগ্য। সুয়ুতী তাঁর 'তারীখুল খোলাফা' গ্রন্থে (পৃ. ২০৭) ইয়াযীদ ও ইবনে যিয়াদকে সরাসরি লানত করেছেন। আল্লামা তাফতাযানী বলেন : 'ইমাম হোসাইনকে হত্যার পর ইয়াযীদের সন্তুষ্টি ও আনন্দ প্রকাশ এবং মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইতের প্রতি তার নিকৃষ্ট আচরণ তার অসংখ্য মন্দ কর্মের কিছু নমুনা মাত্র যা বিভিন্ন গ্রন্থে ও সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আমরা তার বংশের পরিচয় দেখব না; বরং তার ঈমানের প্রকৃত অবস্থা দেখব। মহান আল্লাহ তাকে ও তার পক্ষাবলম্বীদের লানত করুন। জাহিয ইয়াযীদের সকল গুরুতর অপরাধকে তুলে ধরে বলেছেন : 'এ বিষয়গুলো তার নিষ্ঠুরতা, কপটতা ও অধার্মিকতার প্রমাণ। নিঃসন্দেহে সে দুবৃত্ত ও অভিশপ্ত। যে কেউ তাকে সমর্থন করবে সে নিজেকেই অসম্মানিত করবে।' বারযানজী তাঁর 'ইশাআ' গ্রন্থে এবং হাইসামী তাঁর 'সাওয়ায়েকুল মুহরিকা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন : আহমাদ

ইবনে হাম্বলকে তাঁর পুত্র যখন বলেন যে, আল্লাহর কিতাবে আমি ইয়াযীদকে লানত করার সপক্ষে কোন দলিল পাই না। তখন তিনি পবিত্র কোরআনের সূরা মুহাম্মাদের ২২ ও ২৩ নং আয়াত দু'টি তেলাওয়াত করেন:

(فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ)

'তোমরা কি আশা কর যে, তোমরা কর্তৃত্বের অধিকারী হলে ভূপৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে থাকবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে? (যারা এরূপ করবে) তারাই হলো সে সকল লোক যাদের আল্লাহ্ অভিসম্পাত (স্বীয় রহমত হতে দূর) করেন এবং তাদের কর্ণে বধিরতা ও তাদের চক্ষুতে অন্ধত্ব সৃষ্টি করেছেন।'

অতঃপর তিনি বলেন : 'ইয়াযীদ যা করেছে তার থেকে বড় কোন বিপর্যয় ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার নমুনা আছে কি?'

আল্লামা আলুসী বলেন : 'যদি কেউ বলে ইয়াযীদের কোন দোষ ছিল না এবং সে কোন অপরাধ করে নি, তাই তাকে লানত করা যাবে না; নিঃসন্দেহে সে ইয়াযীদের অন্যতম সহযোগী ও তার দলের অন্তর্ভুক্ত।' দ্রষ্টব্য : আল্লামা আলুসী বাগদাদী, রুহুল মায়ানী, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ২২৭; শারহে আকায়েদে নাফাসিয়া, পৃ. ১৮১; জাহিয, রাসায়েল, পৃ. ২৯৮। - সম্পাদক

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর বিপ্লবের দর্শন

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ

প্রশ্ন ১৫ : ইমাম হোসাইন (আ.)- এর এ কথা 'আমি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার জন্য উত্থান করেছি' বলার উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : এই উক্তিটি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের প্রকৃত মর্যাদাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে।

ইমাম হোসাইন (আ.) এ উক্তির মাধ্যমে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের মৌলিক ভূমিকাকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর উত্থানের আসল উদ্দেশ্য এ কাজটি সম্পাদনের মধ্যেই নিহিত বলে বিশ্বাস করেন। যদি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের প্রকৃত মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় তাহলেই ইমামের এই উক্তির উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে।

প্রকৃত অর্থে 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' সম্পর্কে সকল ঐশী ধর্মেই আলোচনা করা হয়েছে এবং তা সকল নবী, রাসূল, নিষ্পাপ ইমাম ও মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়টি শুধুই শরীয়তের বিধানগত দায়িত্ব নয়; বরং প্রকৃত অর্থে এটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল প্রেরণের মানদণ্ড, অন্যতম উদ্দেশ্য এবং কারণ। কেননা, এই বস্তুজগৎ ভালো ও মন্দ, হক ও বাতিল, আনন্দদায়ক ও কষ্টদায়ক জীবন ও পরিণতি, অন্ধকার ও আলো, মর্যাদাকর ও অমর্যাদাকর গুণাবলির সংমিশ্রণ এবং এগুলো কখনো কখনো এমনভাবে পরস্পর একে অপরের সাথে জড়িয়ে পড়ে যে, সেগুলো থেকে সঠিক ও সত্যকে শনাক্ত করে তার ওপর আমল করা বা সেগুলোকে মেনে চলা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

ঐশী ধর্মগুলো সৎকর্ম ও অসৎকর্মের সাথে মানুষকে পরিচিত করানোর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে ভালো ও মন্দ, সত্য ও মিথ্যা, অন্ধকার ও আলো, সৎগুণ ও অসৎগুণের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং সেই সাথে সৎকর্মের প্রতি আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধ করার নির্দেশ দিয়ে ঐশী পথনির্দেশনার শিক্ষা দিয়েছে আর এভাবে তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেছে।

রাসূল (সা.) সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন : 'যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করে সে এই দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি এবং আল্লাহর মহাগ্রন্থ ও তাঁর রাসূলের স্থলাভিষিক্ত।'[২১৮]

হযরত আলী (আ.) বলেছেন : 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ হচ্ছে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখার ভিত্তি।'[২১৯]

কোরআনুল কারীম একজন মুমিনের জন্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার বিষয়টিকে নামায আদায়, যাকাত প্রদান, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)- এর আনুগত্যের পূর্বে উল্লেখ করে এর বিশেষ গুরুত্ব তুলে ধরেছে।[২২০]

ইমাম বাকের (আ.)ও বলেছেন : 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার কাজটি রাসূলগণের কাজ, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের অনুসৃত রীতি; এটি এমনই এক আবশ্যিক দায়িত্ব যার মাধ্যমে অন্যান্য ওয়াজিব তথা অপরিহার্য কর্মগুলো প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের মাধ্যমেই পথসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এর কারণেই ব্যবসা- বাণিজ্য ও উপার্জনের হালাল পথসমূহ উন্মুক্ত হয় (ও হারাম পথগুলো বন্ধ হয়)। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের দায়িত্ব পালনই শত্রুদেরকে সুবিচার করতে বাধ্য করে.., সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের মাধ্যমেই বিভিন্ন কর্ম সুশৃঙ্খল হয়ে থাকে।[২২১]

সুতরাং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার দায়িত্বটি ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্যই নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত নয়; বরং এটা সকল নবী- রাসূল, আল্লাহর মনোনীত ইমাম, সৎকর্মপরায়ণ ও মুমিন বান্দার ওপর অর্পিত দায়িত্ব। কিন্তু যেহেতু সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের বিষয়টি সাইয়্যেদুশ শুহাদার (ইমাম হোসাইনের) সময়ে চূড়ান্তভাবে অবহেলিত কর্মে পরিণত হয়েছিল এবং সমাজের (রাষ্ট্রের শীর্ষ থেকে সাধারণ) সকল পর্যায়ে অসৎকর্ম ব্যাপকভাবে প্রচলন লাভ করেছিল এবং সৎকর্ম ও অসৎকর্ম পরস্পর মিশ্রিত হয়ে পড়েছিল, এই অবস্থা দ্বীন ইসলামকে বিলুপ্ত ও রাসূলের সুন্নাতকে বিস্মৃতির সম্মুখীন করেছিল, তাই বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো এবং রাসূলের সুন্নাত ও দ্বীন ইসলামকে

পুনরুজ্জীবিত ও রক্ষা করার জন্য ইমাম হোসাইন (আ.) সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করাকে একমাত্র পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সে কারণেই তিনি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর সংস্কার সাধনই তাঁর বিপ্লবের উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন :

انّی لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انّما خرجت لطلب الاصلاح فی امّة جدّی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ارید آن آمر بالمعروف و انهی عن المنکر[২২২].

‘আমি উন্মাদনা বা অহংকারের বশে অথবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বা জুলুমকারী হিসেবে উত্থান করিনি। আমি কেবল আমার নানার উম্মতের সংশোধন করার জন্য বের হয়েছি। আমি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে চাই।’[২২৩]

সৎকাজের আদেশ ও বিপদের ভয়

প্রশ্ন ১৬ : সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ শর্ত হচ্ছে বিপদ ও ক্ষতির কোন ভয় বা আশঙ্কা না থাকা, এই শর্তটি তো সে সময়ে বিদ্যমান ছিলই না। কারণ, ইয়াযীদ ও বনি উমাইয়া শাসকদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও কর্মকাণ্ড- যাদের কাজ ছিল অত্যাচার চালানো ও নিরপরাধ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা- থেকে সুস্পষ্ট যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার ক্ষেত্র ও পরিবেশ ছিল না। তাই ঐ রকম পরিস্থিতিতে ইমাম হোসাইন (আ.) অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে এরূপ উদ্যোগ নেওয়ার অর্থ হচ্ছে মহাবিপদের সম্মুখীন হওয়া! অতএব, কিভাবে তিনি সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার সংগ্রামে নামলেন?

উত্তর : আমরা আল্লাহর বিধান পালনের শর্তাবলি এবং তার বৈশিষ্ট্য ও শাখাগত দিকগুলো অবশ্যই রাসূল (সা.) এবং ইমামগণের অনুসৃত নীতি ও কর্মপদ্ধতি থেকে গ্রহণ করব। আর যে কোন কর্মের শরীয়তগত বৈধতার শর্ত হচ্ছে এই যে, ইমামগণের মাধ্যমে তা সম্পাদিত বা বর্ণিত

হতে হবে। অন্য কথায়, ঐ মহান ব্যক্তিদের বাণী ও কর্মই (চাল- চলন বা আচার- আচরণ) হলো কোন কর্মের শরীয়তসিদ্ধতার প্রমাণ।

অতএব, যদি ধরে নিই যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের কাজটি '(সমাজের ওপর) বাস্তব প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা ও আদেশ- নিষেধকারী ব্যক্তি নিজে বিপদমুক্ত থাকা'র শর্তাধীন এবং এ বিষয়টি সর্বজনীন ও সামগ্রিক একটি শর্ত (যা সকল অবস্থার জন্য প্রযোজ্য) বলে বিবেচিত, তাহলেও ইমাম হোসাইনের এই বিপ্লবী উদ্যোগ ও কর্ম ঐ শর্তকে বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করবে এবং তা সর্বজনীনতা হারাবে। কারণ, তাঁর পদক্ষেপ থেকে এটাই বুঝতে পারি যে, যদি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের পেছনে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্য থাকে তাহলে এই শর্ত দু'টির আর কার্যকারিতা থাকে না। বরং উল্লিখিত শর্ত দু'টি না থাকলেও- অর্থাৎ যদিও সেক্ষেত্রে ক্ষতির ও মহাবিপদের সম্ভাবনাও থাকে- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার কাজটি করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে অবশ্যই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের পেছনে নিহিত কল্যাণের গুরুত্বের সাথে ব্যক্তির সম্ভাব্য ক্ষতির বিষয়টিকে যাচাই করতে হবে। যদি কল্যাণের বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ (যেমন- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের ওপর দ্বীন অবশিষ্ট থাকার বিষয়টি নির্ভরশীল) হয়ে থাকে, তাহলে ক্ষতিকে স্বীকার করে নেয়া আবশ্যক। আর এ ক্ষেত্রে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা থেকে বিরত থাকাটা উচিত নয় বা জায়েয নয়।

অন্য কথায়, সাধারণ পর্যায়ের সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ- যেমন পাপ ও আইনবিরোধী কোন কাজ করা থেকে কোন ব্যক্তিকে বিরত রাখা এবং আইন অনুসরণ ও কর্তব্য পালনে বাধ্য করা এবং সর্বজনীন ও সর্বব্যাপী সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের (যেটার সাথে দ্বীন ও ঐশী হুকুম- আহকাম ও আল্লাহর নিদর্শনসমূহ টিকে থাকার বিষয়টি জড়িত, যেটা পরিত্যাগ করলে মুসলমানরা অপূরণীয় ক্ষতি ও দুর্দশার শিকার হবে) মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। যেমন ইয়াযীদের শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্র একটি কুফরী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হওয়ার মতো

ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সে সময়ের পরিবেশ- পরিস্থিতিই সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, অতি শীঘ্রই দ্বীন- ইসলাম নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিবে।

প্রথম (সাধারণ) পর্যায়ের সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের বিষয়টি ক্ষতির দিক থেকে ব্যক্তি নিরাপদ থাকার শর্তের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়টির অপরিহার্যতা ক্ষতির দিক থেকে ব্যক্তি নিরাপদ থাকার ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং এক্ষেত্রে অবশ্যই দ্বীনকে সাহায্য ও রক্ষা করতে হবে ও দ্বীনকে বিপদমুক্ত করতে হবে; এমনকি জান ও মাল উৎসর্গ করার বিনিময়ে হলেও।

দ্বীন যে সম্পূর্ণ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে ইমাম হোসাইন (আ.) তা জানতেন। এ কারণে সেই প্রথমেই, যখন মারওয়ান মদীনাতে ইমামকে ইয়াযীদের হাতে বাইআত করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন :

انّا لله و انّا اليه راجعون و على الاسلام السلام اذ قد بليت الامّة براع مثل يزيد [২২৪] .

‘. . . অবশ্যই ইসলামকে চির বিদায় জানাতে হবে যখন উম্মত ইয়াযীদের মতো রাখালের (নেতা) কবলে পড়েছে’ অর্থাৎ যখন ইয়াযীদের মতো ব্যক্তি মুসলমানদের নেতৃত্বে এসেছে তখন এটা স্পষ্ট যে, ইসলাম কী ধরনের পরিণতির স্বীকার হবে! যেখানে ইয়াযীদ থাকবে সেখানে ইসলাম থাকতে পারে না। আর যেখানে ইসলাম থাকবে সেখানে ইয়াযীদ থাকতে পারে না।

এ ধরনের অন্যায় কর্ম ও বিপদের মোকাবিলায় ইমাম হোসাইন (আ.) অবশ্যই রুখে দাঁড়াবেন ও প্রতিবাদ করবেন এবং ইসলামকে অরক্ষিত অবস্থায় ছেড়ে যাবেন না; যদিও তাঁকে ও তাঁর পরিবার- পরিজনকে হত্যা করা হোক না কেন। কেননা, তিনি তাঁর বেঁচে থাকার চাইতে ইসলামের বেঁচে থাকাটাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। অতএব, স্বীয় জীবনকে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করতে হবে। আর সে জন্যই যদিও তাঁর পরিবার- পরিজন ও শিশুরা কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তবুও তিনি স্বীয় কর্মসূচি ও দায়িত্ব পালনে পিছপা হননি।

হ্যাঁ, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলন ছিল সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের উদ্দেশ্যে এবং যুলুম- নির্যাতন ও কুফর ও ইসলামের শত্রু প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে। কিন্তু

বিশ্বের ইতিহাস কখনো এ ধরনের সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের নমুনা দেখেনি। যুলুম- নির্যাতন ও কুফরের বিরুদ্ধে এমন যুদ্ধ কেউ অবলোকন করেনি। কারণ, ইমাম হোসাইন (আ.) ও তাঁর পরিবার চরম পিশাচ যালিমদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থেকেও স্বীয় বিশ্বাস ও সম্মানকে রক্ষা করেছেন এবং স্বীয় কর্তব্য পালনে অতুলনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন।

আবু আবদিল্লাহ ইমাম হোসাইন (আ.) ছিলেন এমনই এক ব্যক্তি যিনি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের পথে ১০ই মুহররমের দিনে এমন মানসিক শক্তি ও সাহসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন যে, সকল মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং সত্যের পথে শহীদদের মধ্যে প্রথম হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন।

এ পর্যায়ে আয়াতুল্লাহ ওস্তাদ শহীদ মোতাহহারীর নির্মল বাণীর কিছু অংশ উল্লেখ করা উপযুক্ত বলে মনে করছি। তিনি বলেছেন : 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের কাজে যখন সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে তখন তা ওয়াজিব তথা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, এ ক্ষেত্রে সকলেই একমত পোষণ করেন। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে অনেকেই বলে থাকেন যে, ঐ দায়িত্বটি এখানেই শেষ; অর্থাৎ এটার আবশ্যিকতা ঐ পর্যন্তই যে পর্যন্ত বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না এবং যিনি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের কাজ করবে তার যেন জান- মালের কোন ক্ষতিসাধন না হয় ও মান- সম্মানের যেন হানি না হয়। উল্লিখিত বিষয়গুলো ঐ দায়িত্ব- কর্তব্যের গুরুত্বকে ম্লান করে দেয়। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের গুরুত্ব বা মর্যাদা এগুলোর অনেক উর্ধ্বে; কারণ, যদি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের বিষয়টি এতটাই সহজ ও সাধারণ হতো তাহলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সেটা ওয়াজিব তথা অপরিহার্য হওয়ার বিষয়টি অকার্যকর হতো; কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিষয়টি এমন নয়, যেমন যদি পবিত্র কোরআন ধ্বংসের সম্মুখীন হয়, ন্যায়বিচার অথবা

ইসলামী ঐক্য যদি হুমকির সম্মুখীন হয় তাহলে আর বলা যাবে না- 'আমি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের কাজ করব না; কেননা, যদি কিছু বলতে যাই তাহলে আমার প্রাণনাশের ভয় আছে, আমার মানহানি হওয়ার সম্ভাবনা আছে অথবা সমাজ এটা পছন্দ করে না।'

এদিক থেকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের বিষয়টি অত্যন্ত বড় একটি বিষয় যা কোন সীমা- পরিসীমা মানে না, এমনকি ক্ষতির ও মহাবিপদের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তা আঞ্জাম দেওয়া ওয়াজিব বা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আমরা এটাই বলি যে, হোসাইনী আন্দোলন সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে- যা প্রমাণিত- অনেক উর্ধ্বে নিয়ে গেছে; কারণ, তিনি শুধুই যে স্বীয় জান ও মাল দিয়েছেন তা নয়; বরং তাঁর অত্যন্ত প্রিয়ভাজনদের জীবনকেও এ পথে উৎসর্গ করে দিয়েছেন, এমনকি তাঁর পরিবারের বন্দিদশাকেও এই মূলনীতির জন্যই মেনে নিয়েছেন। ইমামের এ কাজের ক্ষেত্রে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, এ রকম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ- যে কোন বিপদ- আপদের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও ওয়াজিব ও অপরিহার্য হবে এবং এই পথে যে কোন ক্ষতিকে জীবনের বিনিময়ে হলেও গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ১৭ : শরীয়তের দায়িত্ব- কর্তব্যের মধ্যেও সাধারণ শর্তসমূহের একটি শর্ত হচ্ছে- সামর্থ্য বা ক্ষমতা থাকা আর পাক- পবিত্র ও নিষ্পাপ আহলে বাইতের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এই আবশ্যকতা শুধু তাদের জন্য যারা এগুলো সম্পাদনের ক্ষমতা রাখে; অথচ ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলনে আমরা দেখি যে, জনগণ অজ্ঞতা, নিস্পৃহতা, দুর্বল ঈমান, স্বার্থপরতা, ভীতি, কাপুরুষতা অথবা অন্য কোন কারণে তাঁকে সহযোগিতা দান থেকে বিরত থেকে ছিল এবং এক ক্ষমতাধর শাসকের সাথে লড়াইয়ের জন্য তেমন শক্তিও তাঁর ছিল না। তাহলে কি করে তিনি আন্দোলনে নামলেন এবং সেটাকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ হিসেবে ঘোষণা দিলেন?

উত্তর : ওস্তাদ মোতাহহারী এ ব্যাপারে বলেছেন : ‘সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের শর্তগুলোর মধ্যে একটি শর্ত হিসেবে ‘ক্ষমতা’ বা ‘শক্তি- সামর্থ্য’ থাকার বিষয়টিকে উল্লেখ করা হয়েছে-

انّما يجب على القوى المطلع [২২৫]

‘সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের কাজটি কেবল শক্তিমান ও এবিষয়ে জ্ঞাত ব্যক্তির জন্য ফরজ (নির্ধারিত)’ অর্থাৎ অক্ষম ব্যক্তি কখনোই যেন সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের কাজ না করে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, স্বীয় শক্তিকে সংরক্ষণ করে রাখ ও সফলতা অর্জন কর, কিন্তু যে ক্ষেত্রে অক্ষম ও তোমার শক্তির অপচয় হবে সেক্ষেত্রে উদ্যোগ নিও না। এখানেও অনেকের জন্য একটি ভুলের উদ্রেক হয়েছে। তারা বলে থাকে, যেহেতু অমুক কাজটি করার ক্ষমতা আমার নেই আর ইসলামও বলেছে যে, যদি কোন কাজ করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে সেটা করার দরকার নেই, তাই এ ক্ষেত্রে আমার কোন দায়িত্ব নেই অর্থাৎ আমি দায়িত্বমুক্ত। এর উত্তরে অবশ্যই বলতে হবে : না! ইসলাম যেটা বলেছে সেটা হলো এই যে, যাও, শক্তি বা ক্ষমতা অর্জন কর; আর এটা হচ্ছে শারতে ওজুদ, না শারতে ওজুব।[২২৬] অর্থাৎ তুমি অক্ষম, তোমার কোন কিছু করার প্রয়োজন নেই, ঠিক আছে, কিন্তু তোমাকে অবশ্যই শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করতে হবে যাতে সাফল্য অর্জন করতে পার।

এই মূলনীতির জন্য শক্তি অর্জন করা এতটা গুরুত্বপূর্ণ যে, কখনো হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ করাও ফরয তথা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমন অত্যাচারী শাসকের নিকট থেকে কোন পদমর্যাদা লাভ করা ও তাদের অধীনে কাজ করা। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, এই পদটি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার ক্ষমতা অর্জনের জন্য একটি উসিলা বা মাধ্যম হতে পারে, তাহলে অবশ্যই ঐ কাজটিই করা প্রয়োজন। ইসলামী ইতিহাসে এ রকম ঘটনা অনেক আছে যে, কোন কোন ব্যক্তি আহলে বাইতের কোন ইমামের নির্দেশে খলিফাদের দরবারে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যদি ঘটনাক্রমে ও আকস্মিকভাবে ক্ষমতা হাতে আসে, তাহলেই কেবল সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা ওয়াজিব। আর যদি এমনটি না হয় তাহলে আবশ্যক নয়; এই ধরনের

কথার ভিত্তি কতটুকু তা জানতে হলে আমাদেরকে ইসলাম সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার মূলনীতি ও বিশ্বাসকে কতটা মূল্যায়ন করেছে তা অবশ্যই পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

কেননা, বলা হয়েছে যে, এই মূলনীতিটি দ্বীন-ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিশ্চয়তা দানকারী। আর এ কারণেই ইমাম হোসাইন (আ.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথিগণ শাহাদাত বরণ করেছেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজন বন্দিদশা ভোগ করেছেন। শেষ যুগের কতক লোকের সমালোচনায় হাদীসে এসেছে যে,

لا يوجبون امراً بالمعروف و نهياً عن المنكر الاّ اذا أمنوا الضرر

'তারা ক্ষতি থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকলেই কেবল সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের দায়িত্ব পালন করে নতুবা তাতে সাড়া দেয় না।'

ইমাম বাকের (আ.) অপর এক হাদীসে বর্ণনা করেছেন :

انّ الْمر بالمعروف و النهى عن المنكر سبيل الانبياء منهاج الصلحاء بها تقام الفرايض و تأمن المذاهب و تعمر الارض و ينتصب من الاعداء

'সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎকাজে নিষেধ করাটা নবী ও সৎকর্মপরায়ণদের পন্থা। এই মূলনীতির মাধ্যমেই অন্য আবশ্যিক কর্মগুলো ভিত্তি লাভ করে থাকে, রাস্তা-ঘাট নিরাপদ ও পৃথিবী বসবাসযোগ্য হয় এবং শত্রুদের থেকে (যে অধিকার হরণ করা হয়েছে) ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়ে থাকে।'[২২৭]

যে ফরযের এতটা মূল্যায়ন করা হয়েছে সে সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি করাটা কি সমীচীন যে, যদি একদিন হঠাৎ করে ও ঘটনাক্রমে ক্ষমতাবান হও তাহলে তা সম্পাদন কর; নতুবা তুমি দায়িত্বমুক্ত অর্থাৎ যদি ক্ষমতাবান না হও তাহলে তা সম্পাদন না করলেও তোমাকে কোন অপরাধী বলে গণ্য করা হবে না। এটা ঐ অর্থে যে, বলা হয়ে থাকে : যদি ঘটনাক্রমে দেখ যে, তুমি ইসলামকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখ তাহলে রক্ষা কর আর যদি দেখ পারবে না তাহলে তার আর দরকার নেই।

প্রভাব পড়া বা সফলতার সম্ভাবনার শর্তের ক্ষেত্রেও ঠিক সে রকমই; অর্থাৎ আমরা বলতে পারি না যে, যেহেতু প্রভাব পড়া বা সফলতার কোন সম্ভাবনা নেই, তাই আমরা দায়িত্বমুক্ত।[২২৮]
প্রভাব পড়া বা সফলতার সম্ভাবনার সঠিক ও উপযুক্ত ব্যবহারের নমুনা আমরা ১০ই মুহররমের দিন দেখতে পাই যে, মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইত, এমনকি ইমাম হোসাইনের শাহাদাতকে সর্বশেষ কর্ম বা সর্বশেষ দায়িত্ব বলে মনে করেননি; বরং তাঁরা ইয়াযীদ ও ইবনে যিয়াদের দরবারেও ঐ হোসাইনী মিশন অব্যাহত রেখেছেন ও তাঁর উদ্দেশ্যের অনুসরণ করে চলেছেন। ইমাম হোসাইনের শাহাদাতবরণ করাটা তাঁদের জন্য এক প্রকার প্রারম্ভিকা ছিল, না সমাপিকা।

প্রশ্ন ১৮ : সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ওয়াজিব তথা আবশ্যিক হওয়ার যেসব শর্ত আছে তন্মধ্যে একটি শর্ত হচ্ছে প্রভাব পড়া বা সফলতার সম্ভাবনা থাকা, অথচ আমরা ইমাম হোসাইনের আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ শর্তের উপস্থিতি লক্ষ্য করি না; কারণ, যদিও তাঁর কাছে এটা সুস্পষ্ট ছিল যে, ইয়াযীদ ও তার অনুচররা শাসন ক্ষমতা ত্যাগ করবে না ও তাদের দুর্নীতি থেকে সরে দাঁড়াবে না; তারপরেও তিনি এ কাজে রত হয়েছিলেন। তাহলে ইমাম হোসাইন (আ.) শরীয়তের কোন্ দলিল- প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এ উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং এই দায়িত্বকে আবশ্যিক ও অপরিহার্য দায়িত্ব বলে মনে করেছিলেন?

উত্তর : ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের বিধান ও অন্যান্য শর্ত আমরা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর নিকট থেকে শিক্ষা নেব আর শরীয়তে এটা জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হলো স্বয়ং ইমাম হোসাইন (আ.) বেহেশতের যুবকদের নেতা হিসেবে সেটা সম্পাদন করেছেন। অন্য কথায়, তাঁর কথা- বার্তা ও আচার- আচরণ শরীয়তের হুকুম- আহকামের প্রমাণ বা দলিল। অপরপক্ষে প্রভাব বা সফলতার সম্ভাবনা দু'ধরনের : কখনো এমনও হয় যে, কোন এক ব্যক্তি এখন পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত অথবা লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তাকে অসৎকাজে নিষেধ করতে চাই, যদি এর প্রভাব পড়ার বা এ ক্ষেত্রে সফল হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে অসৎকাজে নিষেধ করা ওয়াজিব নয়। আবার কখনো

কখনো ত্বরিত প্রভাব পড়া বা সফলতার সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও আমরা অসৎকাজে নিষেধ করি। কারণ, আমরা জানি যে, ভবিষ্যতে এটার প্রভাব পড়বে বা সুফল পাওয়া যাবে। তাই এরূপ ক্ষেত্রে অসৎকাজে নিষেধ করা অপরিহার্য এবং এটার সাথে ত্বরিত ফল পাওয়া ও প্রভাব পড়ার সম্ভাবনার কোন পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রেই তা করা বাঞ্ছনীয়।

যেমন যখন কোন পথভ্রষ্ট ফেরকা বা দল অথবা দুর্নীতিতে জড়িত কোন সংগঠনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা থাকবে যে, তাদের দোষ-ত্রুটি, দুর্নীতি ও অসৎ উদ্দেশ্যের বিষয়গুলো মানুষকে জানিয়ে দিয়ে সতর্ক করলে হয়তো কয়েকদিন পরেই তারা তাদের সবকিছু গুটিয়ে নেবে ও সমাজে তাদের প্রভাব বিস্তার রোধ হবে এবং যদি তাদের হোতারা এই অপকর্ম থেকে বিরত না-ও থাকে, অন্ততঃপক্ষে অসৎকাজে নিষেধের প্রভাবে এবং তাদের অপকর্মের কথা প্রচার হওয়ার কারণে অন্যরা পথভ্রষ্ট হবে না সে ক্ষেত্রে কেবল ভবিষ্যতে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকার কারণেই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা আবশ্যক ও অপরিহার্য।

সমকালীন বিশ্বে যেসব রাষ্ট্র নিজেদেরকে উপনিবেশবাদের বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করতে এবং মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে তাদের বেশিরভাগই এ পন্থা বেছে নিয়েছিল। তারা নিজেদের আত্মত্যাগ এবং অত্যাচারী শাসকদের বৈরী আচরণ ও নির্যাতন সহ্য করার মাধ্যমে স্বীয় শত্রুদেরকে সাধারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করেছে ও অন্যদের দৃষ্টিতে শাসকগোষ্ঠীকে নিন্দিত করে তুলেছে। এভাবেই ধীরে ধীরে তাদের অনুপ্রবেশের পথকে রুদ্ধ এবং ক্ষমতার ভিত্তিকে নড়ে করে দিয়েছে। আর এই সংগ্রামে যারা নেতৃত্ব দিয়েছে তারা তাদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা ও বিজয় অর্জন করেছে। তারা এই লড়াইকে- যদিও তার ফল
পেতে দেরী হতে পারে- সাফল্য ও গৌরব বলে গণ্য করেছে। কেননা, তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পদ ও মর্যাদা ছিল না; বরং জনগণের মুক্তিই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ঐশী ব্যক্তিরাও তাঁদের ঐশী মহান উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য কখনো কখনো এ ধরনের সংগ্রাম করে থাকেন। অর্থাৎ যদিও তারা জানেন যে, আল্লাহর দুশমনরা তাদের রক্ত ঝরাবে ও মস্তককে বর্শার আগায় উঠাবে, কিন্তু তারপরেও ইসলাম ও তাওহীদকে উদ্ধার করার জন্য জিহাদ ও সংগ্রাম

করেন যাতে এই বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে জনগণ ধীরে ধীরে সচেতন হয় এবং ইতিহাসের ধারাতে পরিবর্তন সূচিত হয়।

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সময়ে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে, কোরআন ও ইসলামের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছিল এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য মহা বিপদের সংকেত বেজে উঠেছিল অর্থাৎ বনি উমাইয়া যে পরিকল্পনা নিয়েছিল তা ভবিষ্যতে ইসলামকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট করে দিত। এমনকি ইমামের জন্য এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে ইসলামের জ্যোতির্ময় সূর্য অস্তমিত হয়ে যাবে এবং সেই শির্ক ও জাহেলিয়াত তথা অন্ধকার যুগে ফিরে যাবে।

এমন অবস্থায় ইমাম হোসাইন (আ.) কখনোই ক্ষতি ও ভয়ের আশঙ্কায় অথবা মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না এবং ইসলামের এই দুর্দশা ও দুরাবস্থাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে পারেন না।

এক্ষেত্রে ইমাম হোসাইন (আ.) শুধু প্রভাব পড়া বা সফলতার সম্ভাবনার ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেননি; বরং এ বিষয়ে তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, এর নিশ্চিত সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে এবং তিনি জানতেন যে, তাঁর এই পদক্ষেপ ইসলাম অবশিষ্ট থাকার ক্ষেত্রে জামিনদার হবে। তিনি এটাও জানতেন যে, বনি উমাইয়া তাঁকে- তিনি রাসূল (সা.)- এর দৌহিত্র, জনগণের দ্বীন ও নৈতিকতার উৎস ও প্রাণকেন্দ্র এবং আল্লাহর নিকট তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে জানা সত্ত্বেও- হত্যা করবে; অতঃপর তাদের দাপট ও ক্ষমতা হ্রাস পাবে ও তাদের ওপর জনগণের এমন ঘৃণা ও অভিশাপের বন্যার ঢল নেমে আসবে যে, তারা বর্তমানের আক্রমণাত্মক অবস্থান থেকে সরে গিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকে রাখা এবং তাদের স্বৈরাচারী ও নিকৃষ্ট শাসন ক্ষমতার নড়ে ভিত্তিকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে!

সাইয়্যেদুশ শুহাদা ইমাম হোসাইন (আ.) এটাও জানতেন যে, তাঁর শাহাদত ও তাঁর পরিবারের বন্দিত্ব বরণের মাধ্যমে বনি উমাইয়ার প্রকৃত চেহারা এবং ইসলাম ও রাসূলের সাথে শত্রুতার বিষয়টি স্পষ্ট হবে আর উমাইয়াদের বিরোধিতা করার প্রবণতা সকলের মাঝে জেগে উঠবে এবং

ইসলামী চেতনা ও দ্বীনি অনুভূতি জনগণকে সচেতন ও উজ্জীবিত করবে। আর এভাবে ইসলামের মূল শিকড় মানুষের মনে মজবুতভাবে গেঁথে যাবে।

ইমাম হোসাইন (আ.) আরো জানতেন যে, যখন বনি উমাইয়া তাঁকে শহীদ করবে তখন খেলাফতের নামে অবৈধ শাসন প্রতিষ্ঠাকারীদের চেহারার ওপর থেকে মুখোশ উন্মোচিত হবে, তারা লাঞ্ছিত হবে ও জনগণ তাদের বিপথগামিতার বিষয়টি বুঝতে পারবে। আর এটাও স্পষ্ট হবে যে, যে রাষ্ট্র দ্বীন ও রাসূল (সা.)- এর পরিবারের সাথে শত্রুতার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়, তা বাহ্যিকভাবে স্বল্প সময়ের জন্য জনগণের ওপর শাসন করলেও ইসলামী খেলাফতের দাবি করতে পারে না ও তাদের অনৈতিক শাসনক্ষমতা অব্যাহত রাখতে পারে না।

কারবালার ঘটনা এবং ইমাম হোসাইনের শাহাদাত সারা বিশ্বকে এমনভাবে কাঁপিয়ে দিয়েছে যেন স্বয়ং রাসূল (সা.) শাহাদাত বরণ করেছেন। [কারণ, রাসূল (সা.) বলেছেন : 'হোসাইন আমা থেকে আর আমি হোসাইন থেকে।'] [২২৯] মদীনা, মক্কা, কুফাসহ অনেক শহরেই বনি উমাইয়ার প্রতি জনগণের ক্রোধ অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং ইয়াযীদের বিরুদ্ধে একটার পর একটা বিক্ষোভ শুরু হয় যাতে বনি উমাইয়ার র্শিক ও কুফরমিশ্রিত নামসর্বস্ব ইসলামী শাসনব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায় আর আহলে বাইতের পবিত্র রক্তগুলো দ্বীনের মুক্তি ও জনগণের দ্বীনি চেতনা বৃদ্ধির কারণ হয়।

অতএব, প্রমাণিত হলো যে, ইমাম হোসাইনের সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের সংগ্রাম সাধারণ দৃষ্টিকোণ ও ঐশী দৃষ্টিকোণ থেকেও জরুরি ও অপরিহার্য কর্মগুলোর মধ্যে একটি ছিল আর তিনি এই আবশ্যিক কর্তব্য পালন করতে গিয়ে এ পথে স্বীয় প্রাণসহ তাঁর প্রাণপ্রিয় সন্তান ও ভাইদের এবং বনি হাশেমের শ্রেষ্ঠ যুবক এবং সকল সঙ্গী- সাথিকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁদেরকে তিনি ইসলামের মহান উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। এ পথে যদিও দুঃখণ্ডদুর্দশার ঢল তাঁর দিকে ছুটে এসেছিল তারপরেও তিনি দৃঢ় ও সাহসিকতার সাথে তার মোকাবিলা করেছেন এবং দ্বীন ও স্বীয় ঐশী উদ্দেশ্যের প্রতিরক্ষা করেছেন।

এখানে আয়াতুল্লাহ শহীদ মোতাহহারীর বক্তব্যের অংশবিশেষ তুলে ধরা শ্রেয় বলে মনে করছি, তিনি লিখেছেন যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের অপর একটি শর্ত হচ্ছে

‘প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা’, অর্থাৎ এই ফরয কাজটি ঠিক নামায ও রোযার মতো ‘নিঃশর্ত ইবাদত’ নয়। আমাদেরকে নামায পড়ার ক্ষেত্রে বলা হয়নি- ‘এর কোন দর্শনীয় প্রভাব আছে কি নেই সেটা নিয়ে গবেষণা কর’; কিন্তু সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের ক্ষেত্রে অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার পর সম্পাদন করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ অবশ্যই এর ফলাফলের ওপর হিসাব করতে হবে যে, এর থেকে যে লাভ আসবে সেটা যেন অবশ্যই মূলধনের চেয়ে বেশি হয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক খারেজীদের যুক্তির বিপরীতে যে, তারা বলে থাকে : এমনকি যদি সামান্যতম প্রভাব পড়ার সম্ভাবনাও না থাকে তাহলেও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের কাজটি করতে হবে। কেউ কেউ খারেজীদের পতনের মূল কারণ এই বিশ্বাস বলে মনে করে থাকেন। শিয়াদের মধ্যে যে ‘তাকিয়্যা’র প্রচলন আছে তা হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করা- তাকিয়্যা (প্রতিরক্ষামূলক পন্থা) কাজে লাগানো। অর্থাৎ দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চেষ্টা কর; কিন্তু লক্ষ্য রাখ যাতে বড় কোন ক্ষতির শিকার না হও [ধর্ম ও ইসলামী ঐক্য বিনষ্ট না হয় এবং তোমার ও তোমার সমবিশ্বাসীরা (জান- মাল ও সম্মানের ক্ষেত্রে) বিপদের মুখে না পড়ে]।

প্রভাব পড়ার সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনার অর্থ এটা নয় যে, কোন প্রচেষ্টা না চালিয়ে নিজ গৃহে বসে থেকে বলবে, আমি প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা

দেখছি অথবা দেখছি না; বরং অবশ্যই যেতে হবে ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে গবেষণা ও যাচাই করতে হবে যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সুফল আছে নাকি নেই। যে ব্যক্তি অজ্ঞ ও যাচাইয়ের চেষ্টাও করে না, সে কখনোই অজুহাত দেখাতে পারে না।

ইয়াযীদের হাতে বাইআত না করা

প্রশ্ন ১৯ : কোন্ দলিলের ভিত্তিতে ও কোন্ যুক্তিতে ইমাম হোসাইন (আ.) কোনভাবেই, এমনকি বাহ্যিক কল্যাণ বিবেচনা করেও ইয়াযীদের হাতে বাইআত করতে প্রস্তুত ছিলেন না?

উত্তর : আমাদের প্রথমেই জানতে হবে যে, ইতিহাস সৃষ্টিকারী প্রতিটি সিদ্ধান্ত এক স্পর্শকাতর মুহূর্তে ও কোন কারণ বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে নেয়া হয়ে থাকে অর্থাৎ ঘটনা এমনভাবে অগ্রসর হয় ও এমন কিছু সংঘটিত হয় যেন উভয়পক্ষ আগে থেকেই এ ধরনের সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। মহানবী (সা.)- এর সুন্নাত ও হযরত আলীর ন্যায়ভিত্তিক শাসন থেকে মুসলমানদের একদলের বিচ্যুতি ইতিপূর্বেই শুরু হয়েছিল; কিন্তু বাহ্যিকভাবে তারা তাদের কর্মগুলোকে ভালোভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করত, পবিত্র আহলে বাইত (আ.) ও সত্যপন্থী সাহাবাগণ, যেমন- সালমান ফারসী, আবু জার গিফারী, আম্মার ইয়াসির এবং আরো অনেকে যখনই সুযোগ পেতেন তখনই জনগণকে সত্য সম্পর্কে অবহিত করতেন। কিন্তু ইতিহাসের যে বিষয়টি এখানে তুলে ধরা দরকার সেটা হচ্ছে এমন যে, উভয় পক্ষই চাচ্ছে যে, অবশ্যই শেষ কথাটি বলতে হবে এবং সব কাজ সেরে ফেলতে হবে। মুয়াবিয়ার মৃত্যু ও ইয়াযীদের দায়িত্বভার গ্রহণের পর ঠিক এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। একদিকে ইয়াযীদ সবকিছু অস্বীকার করে বসল ও ঘোষণা দিল যে,

لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء و لا وحیٌ نزل

‘বনি হাশেম ক্ষমতা নিয়ে খেলা করেছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সংবাদই আসেনি ও কোন ঐশী বাণীই নাযিল হয়নি।’[২৩০]

সে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, কাউকে তার মতের বিরুদ্ধে কোন কিছু করার সুযোগ দেবে না- তা হুমকির মাধ্যমেই হোক অথবা হত্যার মাধ্যমেই হোক; এ কারণেই সে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই চেষ্টা করেছিল ইমাম হোসাইন (আ.), আবদুল্লাহ বিন যুবাইর ও আবদুল্লাহ বিন উমরের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করার; এমনকি হত্যার হুমকি দিয়ে হলেও। আর এটাই ছিল উপযুক্ত সময় যে, ইমাম হোসাইনও দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তিনি তাঁর সত্যতা ও সঠিকতার প্রমাণ কুফাবাসীদের দাওয়াত পত্রের বিচক্ষণ জবাব দানের মাধ্যমে দিয়েছেন ও তাঁর সুচিন্তিত পরিকল্পনাকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন; আর এমনভাবে তা করেছেন যে, সবার জন্য সেটা সুস্পষ্ট ও চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর এই সংগ্রামকে আহলে বাইতের মাযলুমিয়াতের (অধিকার হরণ, বঞ্চনা ও নির্যাতিত হওয়ার) সাথে

এমনভাবে মিশ্রিত করেছিলেন যে, যালিমদের নিকৃষ্ট চেহারাটি ইতিহাসের পাতায় জঘন্যভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং এ ঘটনা নিঃশেষ বা মলিন হওয়ার কোন সুযোগ না থাকেনি। আর এই ঐশী কর্মটি শুধু আহলে বাইত ও তাঁদের মহান সঙ্গীদের 'শাহাদাত ও বন্দিদশা'র মাধ্যমে চিরজীবি হয়ে আছে।

ইমাম হোসাইন (আ.)- যিনি ঐশী বাণীর দর্পণ এবং যাঁর গৃহ ঐশী বাণী অবতীর্ণ হওয়ার গৃহ ও আল্লাহর ফেরেশতাদের আসা- যাওয়ার স্থান- এর দৃষ্টিতে মুসলিম উম্মাহর ইমামত ও নেতৃত্বের জন্য যেসব বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য তার কোনটিই ইয়াযীদ বা ইয়াযীদের মতো ব্যক্তিদের মধ্যে নেই। সে কারণেই ইমাম হোসাইন (আ.) বলেছিলেন :

ما الإمام الاّ العامل بالكتاب و القائم بالقسط بدين الحقّ والحابس نفسه على ذات الله

'(সত্য) ইমাম কেবল সেই যে আল্লাহর কিতাবের ওপর আমল ও তার বাস্তবায়নকারী, যে সত্যদ্বীন অনুযায়ী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং আল্লাহর কারণে (সন্তুষ্টির জন্য) প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।'

ওয়ালিদ যখন পবিত্র মদীনার গভর্নর হয় তখন ইমাম হোসাইনকে তার দরবারে আসার দাওয়াত করে ও মুয়াবিয়ার মৃত্যুর সংবাদ দেয় এবং যে পত্রটি ইয়াযীদ বাইআত গ্রহণের জন্য তাকে দিয়েছিল সেটা পাঠ করে

শোনায়।[২৩১] ইমাম হোসাইন (আ.) তার উত্তরে বলেন : 'আমি যে গোপনে ও নির্জনে বাইআত করব নিশ্চয়ই তোমার জন্য তা যথেষ্ট হবে না, যদি না প্রকাশ্যে বাইআত করি ও জনগণ তা অবগত হয়।' ওয়ালিদ বলল : 'হ্যাঁ, তা ঠিক!' ইমাম তাকে বললেন : 'ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর আর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নাও।'

মারওয়ান বলল : 'আল্লাহর শপথ! যদি হোসাইন এই মুহূর্তে বাইআত না করে ও তোমার নিকট থেকে চলে যায়, তাহলে তোমার আর কিছু করার থাকবে না। তাকে বন্দি কর ও এখান থেকে চলে যেতে দিও না যদি না বাইআত করে অথবা তাকে হত্যা না কর!'

ইমাম হোসাইন (আ.) বললেন : 'আফসোস তোমার জন্য, হে জারাকার (নীল চোখের রমনীর) পুত্র! তুমি কি আমাকে হত্যা করার নির্দেশ দিচ্ছ? মিথ্যা বলছ ও হীনমন্যতা করছ?' অতঃপর ওয়ালিদের দিকে ফিরে বললেন : 'ওহে আমীর! আমরা নবুওয়াতের বংশধর ও রেসালাতের গুপ্তধন। আল্লাহর ফেরেশতাদের আসা- যাওয়ার ও আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হওয়ার কেন্দ্রস্থল। আল্লাহ আমাদের মাধ্যমে (তাঁর সৃষ্টির) সূচনা করেছেন এবং আমাদের মাধ্যমেই তার সমাপ্তি ঘটাবেন। ইয়াযীদ পাপাচারী, চরিত্রহীন, মদ্যপায়ী, নিরপরাধ ব্যক্তিদের হত্যাকারী, প্রকাশ্যে পাপাচারকারী। কখনো আমার মতো ব্যক্তি তার মতো ব্যক্তির হাতে বাইআত করতে পারে না; আমি ও তোমরা উভয়েই অপেক্ষা করি, অচিরেই দেখতে পাবে যে, আমাদের মধ্যে কে বাইআত ও খেলাফতের জন্য যোগ্য ও উপযুক্ত।'[২৩২]

ইমাম যখন ওয়ালিদের নিকট থেকে বেড়িয়ে গেলেন তখন মারওয়ান বলল : 'যদি আমার মতের বিপরীত কাজ কর, আল্লাহর শপথ করে বলছি দ্বিতীয়বার আর এ রকম সুযোগ পাবে না।'

ওয়ালিদ বলল : "ধিক তোমার ওপর! তুমি আমাকে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই হাতছাড়া করতে বলছ! আল্লাহর শপথ! আমি চাই না যে, এই দুনিয়ার মালিক হই আর ইমাম হোসাইনকে হত্যা করি। সুবহানাল্লাহ! হোসাইনকে হত্যা করব শুধু এই জন্য যে, তিনি বলে থাকেন : 'আমি বাইআত করব না!' শপথ আল্লাহর! যে ব্যক্তি হোসাইনের রক্তমাখা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তার আমলের পাল্লা হবে অত্যন্ত হালকা এবং আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না, তার প্রতি কোন দয়া করবেন না ও তার জন্য অত্যন্ত কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। "[২৩৩]

ইতিহাসের এ অধ্যায়ে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর এই উত্থান ও বিদ্রোহের কারণ নির্ণয় এবং তাঁর বাইআত না করার উদ্দেশ্য উদঘাটন অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা, তিনি তাঁর এ বক্তব্যে এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন যে, সেগুলোর যে কোন একটিই বাইআত করতে অস্বীকৃতি জানানো ও তাঁর উত্থানকে অপরিহার্য মনে করার জন্য যথেষ্ট। তাঁর শাহাদতের কারণ অনুধাবন করার জন্য তাঁর বক্তব্যগুলো সর্বোত্তম উৎস হিসেবে গণ্য।

ইমাম হোসাইন (আ.) বাইআত করা থেকে বিরত থাকা ও স্বীয় বিরোধিতার সিদ্ধান্তের পক্ষে যে সকল প্রমাণ উত্থাপন করেছেন সেগুলোর সত্যতার বিষয়ে কারোও কোন সন্দেহ ছিল না এবং এ ব্যাপারে প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি একই ছিল, এমনকি ওয়ালিদ, যে ইয়াযীদের চাচাতো ভাই ও তার গভর্নর ছিল, সেও এই বক্তব্যের সঠিকতাকে অস্বীকার করে নি ও ইমামের যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের মধ্যে কোন ত্রুটি খুঁজে পায় নি।

و مثلی لا یبایع مثله 'কখনো আমার মতো ব্যক্তি তার মতো ব্যক্তির হাতে বাইআত করতে পারে না।'- এ কথাটি বলার পূর্বে ইমাম হোসাইন যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তা ইমাম হোসাইনের বিরল ও অনুপম যোগ্যতা, তাঁর শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং ইয়াযীদের কলঙ্কময় চরিত্রের প্রমাণবাহী এক দলিল। অর্থাৎ আমার মতো কোন ব্যক্তি- যার এ রকম উজ্জ্বল অতীত ও সমাজের ওপর নেতৃত্ব দানের স্বীকৃত অধিকার রয়েছে সে ইয়াযীদের মতো ব্যক্তির হাতে কখনো বাইআত করতে পারে না। কেননা, ইসলামী পরিভাষায় খলিফার হাতে বাইআত করার অর্থ হচ্ছে তার অনুসরণ করার অঙ্গীকার করা ও ঐ ব্যক্তির অনুগত হওয়া যিনি ইসলামী সর্বোচ্চ উদ্দেশ্যসমূহের বাস্তবায়নের প্রাণকেন্দ্র, যিনি মুসলমানদের মর্যাদা বা সম্মানের উৎসমূল, পবিত্র কোরআনের সংরক্ষক, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজে বাধাদানকারী- এক কথায় যিনি রাসূল (সা.)- এর স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি হবেন।

বাইআতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, প্রকৃত খলিফা বা প্রতিনিধির নির্দেশ পালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা ও তাঁর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে আত্মত্যাগ করা- যা প্রতিটি মুসলমানের ক্ষেত্রে কোরআনের এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী ওয়াজিব বা অপরিহার্য-

(أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم)

'আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার দায়িত্বশীলদের।'

আর ইয়াযীদের মতো ব্যক্তির সাথে এ ধরনের আনুগত্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া ও বাইআত করার- যতই তা লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে হোক বা ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই হোক- অর্থ

হলো পাপাচার ও ব্যভিচারকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য স্বাক্ষর করা, অসৎকাজ ও পাপের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করা, অধিকার বিনষ্ট করা, অত্যাচারী, নির্যাতনকারী, পাপাচারী ও চরিত্রহীনদের ওপর নির্ভরশীল হওয়া। আর এগুলো ইমাম হোসাইনের মতো ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হওয়া শরীয়তগত ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সম্ভবপর ছিল না।

এই বাইআতের অর্থ হচ্ছে নির্দোষ জনগণকে হত্যা এবং ইসলামের মান- মর্যাদাকে বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে সহযোগিতার অঙ্গীকার করা। আর ইমাম হোসাইনের মতো পবিত্র ব্যক্তির দ্বারা এ ধরনের অপমানকর বাইআত সংঘটিত হতে পারে না। এটা বিবেকের দৃষ্টিতে স্বতঃসিদ্ধ এবং সকলের কাছে সঠিক বলে বিবেচিত একটি বিষয়। তাই তিনি এই বাক্যটি- لا يبايع مثله و مثلی

সুনিশ্চিত হয়েই বলেছেন; কোন বিবেকবান মুসলমান এ কথা বলতে পারে না যে, ইমাম হোসাইনের মতো এক ব্যক্তি ইয়াযীদের মতো কোন হীন লোকের হাতে বাইআত করবে।

এটি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি ফলাফল ছিল যা তিনি তাঁর অতীতের ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতা আর ইয়াযীদের অতীতের কুকর্মের বিবরণ দেওয়ার পর প্রকাশ করেছিলেন।

হ্যাঁ, যদি ধরেও নিই যে, সকল মুসলমান এই ধরনের অপমান ও লাঞ্ছনাকে মেনে নেয় ও ইয়াযীদের মতো ব্যক্তির হাতে বাইআত করে এবং তার মতো ব্যক্তিকে নেতা হিসেবে সমর্থন দেয়, তবুও ইমাম হোসাইন (আ.), যিনি ঐ রকম সম্মান, উচ্চ মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অধিকারী, তিনি ঐরূপ পাপাচারী, নিষ্ঠুর, দুশ্চরিত্র ব্যক্তির হাতে বাইআত করতে পারেন না। মুসলমানরা তাঁর প্রতি দ্বীনের মুক্তিদাতা, কাণ্ডারি ও ঐশী গ্রন্থের কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী হিসেবে এধরনের সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপই আশা করে।

তাই ইমাম হোসাইনের ব্যাপারটি সবার থেকে আলাদা। তিনি নবুওয়াতের পরিবারের সদস্য, রেসালাতের গুপ্তধন, ফেরেশতাদের আসা- যাওয়ার স্থান, রহমতের অবতরণ স্থল ও ইমাম হাসান (আ.)- এর পরে নবীনন্দিনীর পুত্র ছিলেন। তিনি কোন এক স্থানে কবি ফারাজদাক[২৩৪]কে বলেছেন : ‘এই দল (বনি উমাইয়া) শয়তানের অনুসারী হয়ে গেছে, দয়াশীল আল্লাহর আনুগত্য করাকে ত্যাগ করেছে, প্রকাশ্যে পাপাচার ও অন্যায় করছে, আল্লাহর বিধানসমূহকে লঙ্ঘন

করছে, মদপান করছে, বায়তুল মাল ও দরিদ্রদের সম্পদকে তাদের উত্তরাধিকার সম্পদ গণ্য করে তা আত্মসাৎ করছে (জনগণের সম্পদকে দুর্নীতির মাধ্যমে লুণ্ঠন করছে)। আর আমিই এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি যে দ্বীনের সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও শরীয়তের বিধানকে পুনর্বহাল এবং আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য তাঁর পথে সংগ্রাম করবে। (আর আমি এজন্যই উত্থান করেছি)।'[২৩৫]

অতএব, যখন পরিস্থিতি এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, ইয়াযীদের মতো ব্যক্তি চাচ্ছে রাসূল (সা.)-এর মসনদে বসতে ও নিজেকে মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা এবং মুসলিম বিশ্বের ধ্বজাধারী বলে দাবি করছে, সে ক্ষেত্রে ইমামের জন্য বিপদ সংকেত ঘোষণা করা, সংগ্রামের ডাক দেওয়া ও শাসকগোষ্ঠীকে অনৈসলামিক ঘোষণা দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন পথ ছিল না; কেননা, এই অপবিত্র শাসকগোষ্ঠীর হাতে ইমাম হোসাইন অথবা যে কোন মহান সাহাবী ও তাবেঈর বাইআত করার অর্থ হলো তাদের শাসনব্যবস্থাকে সঠিক বলে স্বাক্ষর করা, প্রকৃত খেলাফতকে বাতিল ঘোষণা করা এবং ইসলামী খেলাফতের জন্য আবশ্যক প্রধান প্রধান শর্তসমূহকে প্রত্যাখ্যান করা। আর ইমাম হোসাইনের জন্য তা ছিল রাসূলের প্রতিনিধিত্ব থেকে ও সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। এই বাইআত ঐশী ব্যক্তিদের গলায় শাস্তির শিকলের ন্যায় এবং তাঁদের রূহের ওপর এর ভার পর্বতের ভার ও চাপের চেয়েও অনেক বেশি।

ইমাম হোসাইন (আ.) এই যুক্তির ভিত্তিতে উত্থান করেছেন ও এই কথার ওপর অটল ছিলেন এবং বলেছেন যে:

ما الامام الا العامل بالكتاب، و القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، والحابس نفسه على ذات الله[২৩৬].

'(সত্য) ইমাম কেবল সেই যে আল্লাহর কিতাবের ওপর আমল ও তার বাস্তবায়নকারী, যে সত্য দ্বীন অনুযায়ী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং আল্লাহর কারণে (সন্তুষ্টির জন্য) প্রবৃত্তির নিয়ন্তণ করে।'

তিনি ১০ই মুহররমে, যে দিন তাঁর ওপর দুর্যোগের ঝড় বইছিল, উক্ত যুক্তিটিই বার বার উপস্থাপন করছিলেন ও বলছিলেন :

و ما واللہ لا اجیبھم الی شئ ممّا یریدون حتّی القی اللہ و انا مخضّب بدمی

‘আল্লাহর শপথ! কখনোই এসব লোকের আবেদনে সাড়া দেব না, এমনকি যদি এজন্য আমাকে আমার রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়।’[২৩৭]

ইমাম হোসাইনের যুগে মুসলিমসমাজ বা শাসকদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা জানার জন্য আহলে সুন্নাতের একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞ আলেম সাইয়্যেদ কুতুবের (মিশরের প্রখ্যাত মুফাস্সির ও বিপ্লবী চিন্তাবিদ) দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ইঙ্গিত করব :

ইয়াযীদের শাসন ইসলামী খেলাফত বা ইসলামী শাসনব্যবস্থা ছিল না; বরং স্বৈরতন্ত্র ছিল আর ঐশী বাণীর সাথে কোন প্রকার সামঞ্জস্য ছিল না; বরং জাহেলিয়াতের বা ইসলাম- পূর্ব অন্ধকার যুগের চিন্তাধারায় পরিচালিত হতো। উমাইয়া বংশের শাসনব্যবস্থা কোন্ মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হতো সেটা জানার জন্য ইয়াযীদের বাইআত কীভাবে হয়েছিল তার প্রতি দৃষ্টিপাত করাই যথেষ্ট। মুয়াবিয়া একদল লোককে ডেকে পাঠালেন যাতে ইয়াযীদের বাইআত গ্রহণের বিষয়ে তাদের নিজ নিজ মতামত তুলে ধরে। ইয়াযীদ বিন মাকফা’ নামে পরিচিত এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল : ‘এই ব্যক্তি হচ্ছেন আমীরুল মুমিনীন।’ আর সে মুয়াবিয়ার প্রতি ইশারা করল (অর্থাৎ তিনি যা বলবেন তা- ই চূড়ান্ত)। অতঃপর বলল : ‘যদি মুয়াবিয়া পুরুষ হয়ে থাকে, তাহলে এই ব্যক্তি হচ্ছে আমীরুল মুমিনীন’ ও ইয়াযীদের প্রতি ইশারা করল। তারপর বলল : ‘যদি কেউ এটাকে মেনে না নেয় তাহলে এটা আছে’ (তরবারির প্রতি ইশারা করল)। মুয়াবিয়া বলল : ‘তুমি বস, তুমি তো আমার বক্তাদের প্রধান (আনতা সাইয়্যেদু খুতাবায়ী)।’

এ ঘটনা উল্লেখের পর তিনি ইয়াযীদের পক্ষে মুয়াবিয়া কীভাবে মক্কায় জোর করে, তরবারি দেখিয়ে ও ধোঁকা দিয়ে জনগণের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করেছে তার বর্ণনা দিয়েছেন।[২৩৮]

ইয়াযীদের অপকর্মগুলো, যেমন- মদপান, ব্যভিচার ও নামায ত্যাগ করা ইত্যাদির বর্ণনা দেওয়ার পর তিনি বলেছেন :

ইয়াযীদের অপকর্ম, যেমন- ইমাম হোসাইনকে হত্যা, পবিত্র কাবা ঘর ঘেরাও করা, পাথর নিক্ষেপ করে তা গুঁড়িয়ে দেয়া ও আগুন জ্বালিয়ে পোড়ানো এবং মদীনায় মুসলমান পুরুষদের হত্যা ও নারীদের ধর্ষণের জন্য স্বীয় সৈন্যদের অনুমতি দান ও স্বাধীনভাবে অনাচারের ঘোষণা দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে সবাই জ্ঞাত আছে। এ ঘটনাগুলো সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, ইয়াযীদ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার কোনটিই অতিরঞ্জিত নয়... খেলাফতের জন্য ইয়াযীদকে নির্ধারণ করাটা ছিল ইসলামের প্রাণ ইসলামী শাসনব্যবস্থার মহান উদ্দেশ্যের প্রতি ও ইসলামের মূলে একটি বিরাট আঘাতস্বরূপ।[২৩৯]

মুয়াবিয়ার শাসনামলে দিন দিন রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি ইসলামী পদ্ধতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল ও তার শাসনব্যবস্থায় এক আশ্চর্যজনক পরিবর্তন ঘটেছিল। মুয়াবিয়া সেটাকে ভাবী খলিফা ইয়াযীদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করে, যেমনভাবে সাইয়্যেদ কুতুব বলেছেন- 'এটা ইসলামের প্রাণ ও ইসলামী শাসনব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যের ওপর এক বিরাট আঘাত।' অতএব, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর অপরিহার্য দায়িত্ব ছিল সেটার ক্ষতিপূরণ করা ও মহান ইসলামের ওপর আঘাতের কারণে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া আর সাধারণ জনগণকে বুঝানো যে, তার এই শাসনব্যবস্থা শরীয়তসিদ্ধ নয় ও ইসলামী শাসনব্যবস্থার সাথে এর কোন সম্পর্ক ও সাদৃশ্য নেই।

তিনি স্বীয় উত্থানের মাধ্যমে ইয়াযীদের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে দ্বীনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। নিশ্চুপ থাকা অথবা বাইআত করা- এর যে কোনটিই ইসলামের ব্যাপারে ও ইসলামী শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণকে মহাভ্রান্তিতে ফেলত। ফলে ইসলাম বলে কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না।

মুহাম্মাদ গাজ্জালী (আহলে সুন্নাতের একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও গবেষক) উমাইয়া বংশের শাসনব্যবস্থার দুর্নীতি সম্পর্কে লিখেছেন : বাস্তব এটাই যে, ইসলাম উমাইয়্যা বংশের অপকর্ম ও

দুর্নীতির মাধ্যমে যে ধাক্কাটি খেয়েছে সেটা এতটাই প্রকট ছিল যে, এ ধরনের আঘাত ইসলাম ব্যতীত অন্য যে কোন ধর্মের ওপর আসলে তার ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যেত।[২৪০]

মোটকথা, ইয়াযীদ ও বনি উমাইয়া ইসলামের প্রাণে আঘাত হেনেছিল এবং ইসলামের সর্বোত্তম ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে ভয়ঙ্কর ও ভীতিময় এক রূপে পরিবর্তিত করেছিল।

যদি ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁর উত্থানের মাধ্যমে সময়মতো ইসলামের আহ্বানে সাড়া না দিতেন এবং ঐ শাসনব্যবস্থা যে ইসলামী শাসনব্যবস্থা থেকে পৃথক ছিল তা প্রকাশ করে না দিতেন তাহলে সবচেয়ে বড় অপমান ও লজ্জা ইসলামকে কলঙ্কিত করত এবং ন্যায়পরায়ণতা ও আল্লাহর দ্বীনের সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যেত।

ইয়াযীদী শাসনব্যবস্থার বিপজ্জনক রূপ

প্রশ্ন ২০ : ইমাম হোসাইন (আ.)- এর 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন' বলার উদ্দেশ্য কী ছিল? ইমাম হোসাইন (আ.) কেন বলেছিলেন যে, ইয়াযীদের শাসন মেনে নেয়ার অর্থ হলো অবশ্যই ইসলামকে চির বিদায় জানাতে হবে?

উত্তর : যে বিপদের বিষয়টি ইমাম হোসাইন (আ.) উল্লেখ করেছেন সেটা জাহেলিয়াতে প্রত্যাবর্তনের বিপদ। যেসব বিপদ সেসময় মুসলিম সমাজের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে এই বিপদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ইসলামকে ধ্বংস করার মতো বড় বিপদ। মন্দের প্রত্যাবর্তন, শির্ক (আল্লাহর হালাল- হারামের বিধানের স্থানে উমাইয়া শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য) ও মূর্তিপূজা (বস্তুবাদিতা ও দুনিয়াপূজা), অন্ধকার যুগে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি ধীরে ধীরে অশুভ ও ভয়ঙ্কর রূপে প্রকাশ পাচ্ছিল।

উমাইয়া বংশ অস্ত্র ও বর্শার মাধ্যমে তাদের বিস্তৃত পরিকল্পনাকে- ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তিগুলোকে দুর্বল ও ইসলামী শাসনব্যবস্থাকে বাতিল ঘোষণা এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি (যেগুলোর প্রতি সম্মান দেখানো ইসলামে অপরিহার্য) অবজ্ঞা করা- বাস্তবায়ন করত।

মুসলিম বিশ্ব, বিশেষ করে স্পর্শকাতর কেন্দ্রসমূহ ও যেসব শহরে বিশিষ্ট লোকজন ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা বাস করতেন, যেমন মক্কা, মদীনা, কুফা এবং বসরা মারাত্মক নীরবতা ও প্রচণ্ড শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। যিয়াদ ইবনে আবি, সামারাহ ইবনে জুনদুব ও মুগীরা ইবনে শোবাহ'র ন্যায় অত্যাচারী গভর্নররা নিরপরাধ জনগণকে হত্যা, নির্যাতন- নিপীড়ন, শাস্তি প্রদান, ষড়যন্ত্র এবং মুসলমানদেরকে অপমান ও অপদস্থ করার মাধ্যমে সমাজকে ভীত- সন্ত্রস্ত ও নিরাশ করে দিয়েছিল। উমাইয়ারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ইসলামী নীতি- নৈতিকতা, ধার্মিকদের স্তর এবং ধর্মীয় রীতি নীতি ও নিদর্শনসমূহকে- যেগুলোকে জনগণ সম্মান করত- ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

আলায়েলী বলেছেন : 'ইসলামী চিন্তাবিদদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, উমাইয়া বংশ সকল মন্দ ও দুর্নীতির উৎস ও গোড়াপত্তনকারী ছিল। জাহেলী যুগের সকল প্রকার আচার ও নিয়ম-নীতি (বিশেষ ব্যক্তিদের ইসলামী আইন ও নীতির ঊর্ধ্বে জ্ঞান করা, ধর্মীয় বিধিবিধানে পরিবর্তন সাধন করে তাকে খেল-তামাশায় পরিণত করা) এবং সব ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের (যেমন মদপান, গান-বাজনা, ব্যভিচার শাসকদের জন্য অনুমোদিত, আরব-অনারব বৈষম্য, গোত্রবাদ, জ্ঞান ও তাকওয়ার স্থানে অর্থ-সম্পদ ও বংশকে প্রাধান্য দান) পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল। কেননা, এগুলো তাদের প্রকৃতির অংশ ছিল।'[২৪১]

সিবেত ইবনে জাওজী বলেছেন : 'আমার পিতামহ 'আত তাবসেরাহ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন : বস্তুত হোসাইন ঐ গোত্রের (বনি উমাইয়া) বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন এই জন্য যে, তিনি দেখলেন শরীয়ত বা ঐশী আইন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অতঃপর তার ভিত্তি মজবুত করার চেষ্টা চালালেন।'[২৪২]

যদি ইয়াযীদের হাত উমাইয়া বংশের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উন্মুক্ত রাখা হতো- যেমনভাবে মুয়াবিয়া চাচ্ছিল- তাহলে আযান এবং তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য প্রদানও বন্ধ হয়ে যেত ও ইসলামের কোন নাম-নিশানা থাকত না আর যদি ইসলামের নামটি অবশিষ্টও থাকত, তবে তা উমাইয়া বংশের প্রবর্তিত ইসলাম হতো এবং তাদের স্বেচ্ছাচারী নীতি, প্রবৃত্তি ও আচার অনুযায়ী পরিচালিত হতো।

যদি ইয়াযীদের খেলাফত ইসলামী সমাজের ঘোর বিরোধিতার সম্মুখীন না হতো তাহলে সে রাসূলের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে পদমর্যাদা লাভ করত ও ইসলামী রাষ্ট্র পাপাচার, ব্যভিচার, জুয়া, মদ, নাচ, গান, কুকুর নিয়ে খেলা করা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ হতো। কেননা, প্রতিটি সমাজই তাদের আমীর ও নেতাদের অনুসরণ করে থাকে ও তাদের কাজ-কর্মগুলোকে আদর্শ বা মডেল হিসেবে গণ্য করে থাকে।

এসব কারণেই ইসলামকে রক্ষা করতে ও ইয়াযীদের নিয়ম-নীতি যে জাহেলিয়াতে প্রত্যাবর্তনের দিকে যাওয়ার বিপদ সংকেত দিচ্ছিল সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য একটি সংগ্রাম

শুরু হওয়ার প্রয়োজন ছিল। ইমাম হোসাইন উত্থান করার কারণেই সাধারণ জনগণ অবগত হয় যে, বনি উমাইয়ার রাজনীতিবিদরা ইসলামী নিয়ম- নীতির অনুসরণ করে না।

এ ছাড়াও জনগণের মধ্যে দ্বীনি চেতনাকে জাগিয়ে তোলা দরকার ছিল যাতে তারা বনি উমাইয়ার বিরুদ্ধে বিরোধিতার ক্ষেত্রে কঠোর হয় এবং তারা যে সকল কাজ করে ও নীতি গ্রহণ করে সেগুলোর প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করে এবং তাদেরকে যেন ইসলামের খিয়ানতকারী ও শত্রু হিসেবে চেনে।

সাইয়্যেদুশ শুহাদা ইমাম হোসাইনের উত্থান এই দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে জরুরি ও অপরিহার্য ছিল। অর্থাৎ জরুরি ছিল বনি উমাইয়ার মুখোশ উন্মোচন করা ও তাদেরকে ইসলামী সমাজে পরিচয় করানো এবং এটাও জরুরি ছিল যে, জনগণের দ্বীনি চেতনাকে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করা ও সমাজের আবেগ- অনুভূতিকে নবীর বংশধর ও তাঁর পরিবারের (আহলে বাইতের) প্রতি আকৃষ্ট করা ও ইসলামী নিদর্শনগুলোকে রক্ষা করা।

শত্রুর কঠোর শত্রুতাও তাঁকে আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকে বিরত রাখেনি; কারণ, তিনি এমন এক মুজাহিদ (জিহাদকারী) ছিলেন যিনি আল্লাহর নির্দেশে উত্থান করেছেন ও তাঁর নিকট কোন পার্থক্য ছিল না যে, বাহ্যিকভাবে বিজয়ী হোন বা পরাজিত। কেননা, দুই অবস্থার মধ্যে যে কোন অবস্থাই তাঁর জন্য সম্মানজনক ছিল : 'বল, আমাদের নিকট এটা ব্যতীত কি আশা কর যে, দু'টি উত্তম বস্তুর মধ্যে যে কোন একটি (শাহাদাত অথবা বিজয়) আমাদের ভাগ্যে জুটুক?'[২৪৩]

অতএব, তিনি আল্লাহর পথে ও সত্যের পথে শহীদ হয়েছেন আর তাঁর হত্যাকারীরা আল্লাহ ও সকল ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপের শিকার হয়েছে এবং তিনি আল্লাহর নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন।[২৪৪]

কারবালার প্রান্তরে চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থাপন

প্রশ্ন ২১ : কারবালার প্রান্তরে চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থাপন ও হুজ্জাত সম্পূর্ণ করা হয়েছে- এ কথার অর্থ কী?

উত্তর : ১০ মুহররমের উত্থানে ইমাম হোসাইন (আ.) এমন এক প্রচারপদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করেছিলেন যাতে এর মাধ্যমে জনগণকে প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত করতে পারেন। প্রচারের এই পদ্ধতি একদিকে যেমন এ আন্দোলনকে চির স্মরণীয় করে রেখেছে ও সবধরনের বিচ্যুতি এবং বক্রতা থেকে মুক্ত রেখে এর প্রকৃত রূপকে তুলে ধরেছে তেমনি অন্যদিকে সঙ্গী- সাথিদের চেতনাকে জাগ্রত ও কুফার সেনাবাহিনীর চিন্তা ও দৃঢ়তায় ফাটল সৃষ্টির কারণও হয়েছে। আবার তা শত্রুদের চক্রান্ত ধ্বংসের বা তাদের অপমানের কারণও হয়েছিল। এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটি পদ্ধতি ছিল 'চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থাপন করা'। ইমাম হোসাইন (আ.) এই পদ্ধতির মাধ্যমে যে কোন ধরনের ওজর- আপত্তি ও ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের রাস্তাকে শত্রুদের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন, সত্যের সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন এবং তাঁর সাথে উমাইয়াদের শত্রুতার বিষয়টি যেসকল লোকের নিকট অজানা ছিল তাদের নিকট স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

'চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থাপন করা' কথোপকথনের সংস্কৃতিকে সজীব ও প্রচার করার একটি কার্যকর পদ্ধতি; এ পদ্ধতিটি ইমাম হোসাইন (আ.) মহানবীর সুন্নাত ও হযরত আলীর কর্মপন্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন যে, দাওয়াত প্রচার ও সুপথপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে সংলাপের সংস্কৃতি সমাজ থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে আর দমন- নিপীড়ন, সহিংসতা ও ক্ষমতার দাপট হয়েছে যুক্তি, পরামর্শ ও তর্ক- বিতর্কের স্থলাভিষিক্ত। এ জন্যই তিনি সবসময় 'চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থাপন করা'র পদ্ধতিটিকে যে কোন আলোচনার মূল ভিত্তি হিসেবে গুরুত্ব দান করতেন যাতে এটি জনগণের মধ্যে উত্তম সুন্নাত (সুন্নাতে হাসানা) বলে বিবেচিত হয় এবং সর্বদা বিরাজমান থাকে।

তিনি তাঁর চূড়ান্ত যুক্তি- প্রমাণগুলোর মধ্যে একটিতে উল্লেখ করেছেন :

‘আমি কি তোমাদের রাসূলের (সা.) কন্যার সন্তান, তাঁর চাচাতো ভাই- যিনি প্রথম মুসলমান ছিলেন, তাঁর সন্তান নই? শহীদদের নেতা হামযা ও জাফর তাইয়্যার কি আমার চাচা নন? যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে কর তাহলে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী, আবু সাঈদ খুদরী, সাহ্ল ইবনে সা’দ সায়েদী, যাইদ ইবনে আরকাম, আনাস ইবনে মালিক তাঁদের মতো বিশেষ ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞাসা কর!’

‘আমি কি তোমাদের কাউকে হত্যা করেছি যে, তোমরা রক্তের বদলা নিতে উঠে পড়ে লেগেছ? অথবা তোমাদের কোন ধন- সম্পদ কি আমি ধ্বংস করেছি যে তোমরা সেটার প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছ অথবা আমি কি কাউকে কখনো আঘাত দিয়েছি যে তার কিসাস বা বদলা নিচ্ছ?’

যখন তারা কিছুই বলল না তখন ইমাম উচ্চৈঃস্বরে বললেন : ‘হে শাবাস ইবনে রা’বী! হে হাজার ইবনে আবজার! হে কাইস ইবনে আশআস! হে ইয়াযীদ ইবনে হারেস! তোমরা কি আমাকে চিঠি লেখনি যে, এখানকার ফলগুলে পেকে গেছে, বাগানগুলো সবুজ- শ্যামল হয়ে গেছে আর আমরা সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছি?’ না, আল্লাহর শপথ আমি কখনোই নীচ ও হীন লোকের মতো বাইআতের জন্য হাত বাড়াব না ও ক্রীতদাসের মতো পলায়ন করব না।’[২৪৫]

ইমাম হোসাইন (আ.) এই ধরনের বাক্যের মাধ্যমে একদিকে ইসলামের আপেষহীন মৌলনীতির ওপর অটল থেকেছেন ও কোনরূপ অপমানকে সহ্য করেননি অন্যদিকে অকাট্য যুক্তি উপস্থাপনের বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। অবশ্য এই বিষয়টি তাঁর অনুসারীদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়, যেমন আব্বাস ইবনে আলী, জুহাইর ইবনে কাইন ও হাবীব ইবনে মাজাহির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘোর শত্রুর সাথে সংলাপ করেছেন এবং চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।[২৪৬]

স্বীয় শাহাদাত সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান

প্রশ্ন ২২ : ইমাম হোসাইন (আ.) কি জানতেন তিনি শহীদ হবেন? যদি এমনই হয়ে থাকে তাহলে কেন তিনি নিজের পায়ে হেঁটে মৃত্যুস্থলে গেলেন?

উত্তর : শিয়াদের হাদীস ও বর্ণনা অনুযায়ী ইমামদের (আ.) অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক প্রকার অনুগ্রহ যা তাঁরা কাজে লাগিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

(عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ)

'তিনি গুপ্ত জ্ঞানের অধিকারী আর কাউকে স্বীয় জ্ঞান দান করেন না শুধু তাঁর প্রেরিত ব্যক্তি ব্যতীত যাঁর ওপর তিনি সন্তুষ্ট...'[২৪৭]

উক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গোপন জ্ঞান সত্তাগতভাবে শুধু আল্লাহর জন্য নির্ধারিত ও তিনি ব্যতীত সেটা কেউ জানে না। কিন্তু আল্লাহর রাসূলগণ তাঁর অনুমতিক্রমে সে সম্পর্কে অবগত হতে পারেন আর অন্য ব্যক্তিরাও আল্লাহর পক্ষ থেকে অথবা তাঁর রাসূলের শিক্ষার মাধ্যমে সে সম্পর্কে অবগত হবেন।

তাফসীর 'আল- মীযান' এর লেখক আল্লামা তাবাতাবাঈ এ সম্পর্কে বলেছেন : 'সাইয়্যেদুশ শুহাদা ইমাম হোসাইন (আ.)- শিয়া ১২ ইমামীদের বিশ্বাস অনুযায়ী- রাসূল (সা.)- এর বারজন স্থলাভিষিক্তের মধ্যে তৃতীয় এবং সকল ক্ষেত্রে সর্বজনীন কর্তৃত্বের অধিকারী। ইমামদের জ্ঞান বাস্তবে সংঘটিত ও ঘটিতব্য সকল বিষয়ে পূর্ণ অবগতির অধিকারী। বাইরের জগতের বিবেচনায় এ জ্ঞান- কোরআন ও হাদীস এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ অনুযায়ী- দু'প্রকার : প্রথম প্রকার : ইমাম যে কোন পরিস্থিতিতে আল্লাহর অনুমতিক্রমে বিশ্ব জগতের প্রকৃত অবস্থা ও বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত- সেটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বিষয় হোক বা তার ঊর্ধ্বের কিছু; যেমন: মহাশূন্যের অস্তিত্বসমূহ, অতীতে সংঘটিত ঘটনাসমূহ ও ভবিষ্যতের ঘটনাসমূহ।

দ্বিতীয় প্রকার : রাসূল (সা.) এবং ইমামগণও সাধারণ মানুষের মতো সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী অর্থাৎ তাদের মতো তাঁরাও স্বাধীনভাবে বিভিন্ন ঘটনার পারিপার্শ্বিক দিক সম্পর্কে জানতে জ্ঞান লাভের প্রচলিত পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করেন এবং এরূপ জ্ঞানের ভিত্তিতে যা কিছু উপযুক্ত মনে করেন সে অনুযায়ী সবকিছুর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেন।'[২৪৮]

অবশ্য এটা লক্ষ্য রাখা দরকার যে, অপরিবর্তনশীল কোন ঘটনার ক্ষেত্রে ইমামদের অকাট্য জ্ঞান থাকার অর্থ এ নয় যে, তা সংঘটিত হওয়া জাব্র বা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়; এটা অনেকটা ঐ রকম যেমন মানুষের কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান থাকা; কিন্তু এই জ্ঞান থাকার অর্থ এটা নয় যে, সেটা সংঘটিত হওয়া বান্দার জন্য বাধ্যতামূলক কোন বিষয় হয়ে যাবে এবং সে তার স্বাধীনতা হারাবে; কেননা, মানুষের স্বাধীন কর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাটি তাদের স্বাধীনতা ও ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত; অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, মানুষ স্বীয় ইচ্ছায় কোন্ কোন্ কাজ সম্পাদন করে বা করবে। [তিনি জানেন, অমুক ব্যক্তি তার স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে কোন্ ভালো কাজ করবে এবং অমুক ব্যক্তি তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করে কোন্ মন্দ কাজ করবে।]

ইমাম হোসাইন (আ.) সম্পর্কেও আমরা জানি ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত যে, রাসূল (সা.) ও ইমাম আলী (আ.), ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের সংবাদ দিয়েছিলেন এবং এই সংবাদটি বিশুদ্ধতম ইতিহাস ও হাদীস গ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

রাসূলের সাহাবিগণ, স্ত্রীরা, আত্মীয়- স্বজন ও নিকটতম ব্যক্তিরা এই সংবাদটি সরাসরি তাঁর থেকে অথবা কোন না কোন নির্ভুল মাধ্যমে শুনেছিলেন।

অনুরূপ ইমাম হোসাইন (আ.) যখন ইরাকে সফর করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এ উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কায় গমন করলেন সকলেই তখন শঙ্কিত হলেন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

তারা রাসূলের দেয়া সংবাদ অনুযায়ী স্পষ্টভাবে জানত যে, শাহাদাত ইমাম হোসাইনের অপেক্ষায় আছে। আর তৎকালে বিরাজমান পরিস্থিতিও এ কথা বলছিল। কারণ, মুসলিম বিশ্বের ওপর বনি উমাইয়ার শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তাদের চরম অত্যাচারের ফলে জনমনে তীব্র ভীতি ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল এবং এরূপ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় তারা অত্যাচারী বনি উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল। আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) ও ইমাম হাসান (আ.)- এর সময়কালে কুফা শহরের জনগণের অবস্থা সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা

ছিল, তাতে তারা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল যে, ইমাম হোসাইন (আ.) মৃত্যু ও শাহাদাতের দিকে ছুটে যাচ্ছেন এবং এর বিপরীত কিছু ঘটার সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ।

ইমাম হোসাইন (আ.) প্রায়ই স্বীয় প্রাণনাশের খবর দিতেন; কিন্তু কখনই ইয়াযীদের উৎখাত ও তাঁর দ্বারা ইসলামী হুকুমত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার খবর দিতেন না; যদিও তিনি মনে করতেন সবারই এটা দায়িত্ব ও কর্তব্য যে, ইয়াযীদের হাতে বাইআত ও তার অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকা এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। তিনি আহ্বান জানাতেন যেন সবাই তাঁকে সহযোগিতা করুক, যদিও তিনি জানতেন যে, এ ধরনের সর্বব্যাপী আন্দোলন কখনো গড়ে উঠবে না আর অবশেষে তাঁকে কিছু সংখ্যক সাথি নিয়েই প্রতিবাদ করতে হবে এবং আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ দিতে হবে। আর এ জন্য তিনি স্বীয় শাহাদাতের কথা জনগণের সামনে ঘোষণা দিতেন। কখনো কখনো যেসব ব্যক্তি তাঁকে ইরাকে যেতে বারণ করছিল তাদের প্রশ্নের জবাবে বলতেন : 'আমি আল্লাহর রাসূলকে স্বপ্নে দেখেছি ও ঐ স্বপ্নের মাধ্যমেই আমি একটি গুরুদায়িত্ব পেয়েছি যেটা আমার দ্বারা সম্পাদিত হওয়াই উপযুক্ত।'[২৪৯]

'কাশফুল গুম্মাহ' গ্রন্থে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : ''সফরের সময় যে স্থানেই আমরা থামতাম ও বোঝা বাঁধতাম, আমার পিতা আল্লাহর নবী ইয়াহিয়া ইবনে যাকারিয়ার শাহাদাতের কথা বলতেন। আর একদিন তিনি এভাবে বললেন : 'আল্লাহ তা'আলার নিকট দুনিয়া সবচেয়ে হীন ও নিকৃষ্ট বলে গণ্য হওয়ার একটা কারণ হলো যে, (দুনিয়া পাওয়ার জন্য) ইয়াহিয়ার পবিত্র মস্তক শরীর থেকে আলাদা করা হয় আর সেই মস্তককে ইসরাইলী একজন ব্যভিচারী নারীর নিকট উপহারস্বরূপ নিয়ে যাওয়া হয়।''[২৫০]

সুতরাং এসকল নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল এটাই প্রমাণ করে যে, ইমাম হোসাইন (আ.) স্বীয় শাহাদাত ও সামরিক পরাজয়ের বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই জানতেন এবং তাঁর উত্থান ছিল ইয়াযীদী শাসনকে বাতিল ঘোষণা করা, দ্বীনের পুনঃজাগরণ ঘটানো, সত্যের বিষয়ে সন্দেহ ও চিন্তাগত বিচ্যুতি দূরীকরণ এবং ইয়াযীদী শাসনের মরণাঘাত থেকে দ্বীন ইসলামকে মুক্তি দান। ইমাম হোসাইনের সফলতা এখানেই ছিল যে, স্বীয় দাবির সঠিকতাকে তুলে ধরা। এ লক্ষ্যেই

তিনি কুফাবাসীদের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন এবং সুকৌশলে ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তাঁর পরিকল্পনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর এভাবেই সবার সামনে চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর সংগ্রামকে স্বীয় আহলে বাইতের মাযলুমিয়াতের (নির্যাতিত হওয়া) সাথে এমনভাবে মিশ্রণ ঘটিয়েছেন যাতে নির্যাতনকারীদের চেহারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আকারে ইতিহাসের পাতায় অবশিষ্ট থাকে এবং তাঁদের আত্মত্যাগ, অবদান ও মহান উদ্দেশ্য নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার বা অনুজ্জ্বল হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। তাই এই ঐশী আবীর 'শাহাদত ও বন্দিদশা' ব্যতীত চিরস্থায়ী করে রাখা সম্ভব ছিল না।

নিজেকে ধ্বংসের সম্মুখীন করা

প্রশ্ন ২৩ : যদি মানুষের উদ্দেশ্য মৃত্যুবরণ করা ও নির্যাতিত হওয়া এবং পরিবার- পরিজনের বন্দিদশা হয়ে থাকে, তাহলে তা নিজেকে মৃত্যুর সম্মুখীন করা বা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার শামিল যেটা বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিতে ভুল ও শরীয়তগতভাবে কোরআনের আয়াত-

(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)

(তোমরা স্বহস্তে নিজেদের ধ্বংসে নিপতিত কর না) অনুযায়ী জায়েয নয়; তাহলে কেন ইমাম হোসাইন (আ.) শাহাদাত ও মৃত্যুর জন্য বের হলেন ও তার পটভূমিকে নিজ ইচ্ছায় প্রস্তুত করলেন?

উত্তর : ১. নিজেকে বিপদের মুখে ফেলা অথবা নিজেকে ধ্বংসের সম্মুখীন করার বিধান উদ্দেশ্য, বিষয় ও অবস্থার ভিন্নতায় বিভিন্ন হয়ে থাকে, কখনো কখনো তা হারাম বা নিষিদ্ধ আবার কখনো কখনো তা জরুরি ও অপরিহার্য হয়। এরকম নয় যে, নিজেকে ধ্বংসের সম্মুখীন করা সকল অবস্থায় হারাম; বরং কখনো কখনো তা ওয়াজিব বা আবশ্যক হয়ে পড়ে, যদি ধরেও নিই যে, এই আয়াত সর্বজনীনভাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য দলিলের ভিত্তিতে ক্ষেত্রবিশেষে তা নির্দিষ্ট বা সীমিত হয়ে যায়।

যদি ইসলাম ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়ে আর তাকে উদ্ধার করার জন্য যদি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দেয়া ছাড়া উপায় না থাকে, তারপরও কি ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়া জায়েয নয়?

যদি কেউ স্বীয় জীবন বাঁচানোর জন্য ইসলামকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দেয়, বুদ্ধিবিবেক ও শরীয়তের দৃষ্টিতে কি তাহলে সে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না? এ বিষয়টি কি ইসলামের প্রতিরক্ষা ও জিহাদের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র নয় এবং এক্ষত্রে আত্মত্যাগ কি সবচেয়ে জরুরি বলে গণ্য নয়?

তাওহীদের প্রতি দাওয়াত করা, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর ইবাদত করা থেকে মানুষকে মুক্তি দান করা, ইসলাম ও দ্বীনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা এবং ইসলামী রাষ্ট্রকে আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখাই হলো জিহাদের দর্শন। ইসলামী বিধান অনুযায়ী জিহাদ ও ধর্মের প্রতিরক্ষার কাজটি- নিহত ও ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত জেনেও- ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

যদি ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষার জন্য শত্রুকে প্রতিরোধ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং এর সীমান্ত ও ভূখণ্ড রক্ষা করা কিছু সংখ্যক সৈন্যের মৃত্যুর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তাহলে অবশ্যই বড় ধরনের ক্ষতিকে মেনে নিয়েও তার প্রতিরক্ষা করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে যদি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে হয় তাহলে অবশ্যই তা করা জায়েয; বরং ওয়াজিব।

২. 'নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হারাম'- এই নির্দেশটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক নির্দেশ যা শরীয়তও সমর্থন করেছে। কিন্তু 'নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা'- বুদ্ধিবৃত্তিক এই বিধানকে সকল অবস্থায় প্রযোজ্য একটি বিধান বলে মনে করে না। বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিতেও এ বিধানটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন তার বিপরীতে তার থেকে অধিক

গুরুত্বপূর্ণ ও বেশি কল্যাণকর কিছু থাকবে না; কিন্তু যদি তার (জীবন রক্ষা) থেকে মূল্যবান ও বড় কোন কল্যাণকে পেতে হলে তাকে বিসর্জন দিতে হয় তখন বুদ্ধিবৃত্তি তাকে জায়েয ও কখনো কখনো জরুরি এবং সেটাকে ভালো বলে নির্দেশ দিয়ে থাকে।

৩. ক্ষতি বা ধ্বংসের ব্যাপারটি কয়েকভাবে ধারণা করা যেতে পারে, যেমন ধ্বংস, নিঃশেষ, অনর্থক। বর্ণিত আয়াতে ধ্বংস বা ক্ষতির বিষয়টি দ্বারা হয়তো এই ধরনের

অনর্থক বিনাশ ও ধ্বংসকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ, এ ধরনের উদ্দেশ্যে 'নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া' শরীয়তগতভাবে ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে কখনই সঠিক নয়; কিন্তু যদি তার উদ্দেশ্য ঐরূপ না হয়ে কর্তব্য পালন এবং বিধি- বিধানের প্রতিরক্ষায় হয়ে থাকে তাহলে আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ করার অর্থ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া নয়।
যারা আল্লাহর রাস্তায় ও দ্বীন রক্ষার জন্য নিহত হয় তারা নিঃশেষ ও ধ্বংস হয় না; বরং আরো দৃঢ় ও চিরস্থায়ী হয়। সুতরাং শরীয়তগতভাবে নিজের জীবন রক্ষার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোন কল্যাণ অর্জন করা অথবা এমন অকল্যাণকর কিছুকে দমন করা যেটার ক্ষতি রোধ করা জীবন রক্ষার চেয়েও মূল্যবান, এরূপ ক্ষেত্রে জীবন দান করা ও শাহাদাতবরণ করার অর্থ নিজেকে ধ্বংসে নিপতিত করা নয়; তাই এধরনের মহান উদ্দেশ্যে নিজেকে বিসর্জন দেয়া কখনই আয়াতটির নিজেকে ধ্বংসে নিপতিত করার নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। আয়াতটির অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো আর্থিক ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত আচরণ। যেমন কেউ যদি বিলাসিতার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয় করে নিজেকে অভাবগ্রস্ত করে তাহলে তা নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে; কিন্তু যদি মান- সম্মান রক্ষার জন্য অথবা অন্য কোন ভালো কাজে (কারো সম্মান রক্ষার জন্য) খরচ করে বা দান করে, তাহলে সেটা অপচয় নয়; বরং সেটা সঠিক কাজ ও শরীয়তসিদ্ধ কাজ।

৪. দ্বীনের জন্য জিহাদ ও প্রতিরক্ষার ময়দানে ধৈর্যধারণ করা বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করা মুসলিম বাহিনীর পরাজয় ও কাফেরদের বিজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে আর আত্মোৎসর্গ করা জিহাদকারীদের জন্য উৎসাহের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে সেক্ষেত্রে শাহাদাতের চেতনাকে প্রশংসার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে বরং সেটাকে ওয়াজিব করা হয়েছে আর কেউ কখনো এ ধরনের সাহসিকতা ও দৃঢ় মনোবলপ্রসূত কাজকে নিজেকে ধ্বংসের মুখে সঁপে দেওয়া বলে গণ্য করে নি; বরং সর্বদা, বিশেষ করে ইসলামের প্রাথমিক যুগে, মহা গৌরবের মধ্যে একটি গৌরব ও সৈন্যদের মধ্যে পতাকাধারী ও সেনাপতিদের জন্য উচ্চ মর্যাদা বলে গণ্য করা হয়েছে। যেমন মুতার যুদ্ধে জাফর তাইয়্যার (রা.)- এর ঐতিহাসিক

আত্মত্যাগ। এরূপ আত্মোৎসর্গ ও শাহাদাতের উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত সৌভাগ্য লাভ এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন; এটা আত্মহত্যা ও নিজেকে ধ্বংসের মুখে সঁপে দেওয়া নয়।

৫. আয়াতটি যদিও নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করা হারাম হওয়ার অর্থ নির্দেশ করছে, কিন্তু যেহেতু নিষিদ্ধতার বিধানটি ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করার ওপর আরোপিত হয়েছে সেহেতু এ বিষয়টি বাইরে বিদ্যমান যে সকল বস্তুর (যেমন- মদ, জুয়া ইত্যাদির) ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে সেগুলোর মতো নয়, এ কারণে যে, সেটার বাস্তব নমুনা (নিষেধাজ্ঞা) উক্ত শিরোনামের অর্থাৎ 'ধ্বংসে পতিত হওয়ার' সাপেক্ষে নির্ধারিত হবে। তাই দেখা যাবে হয়তো একটি উদ্যোগ ও কোন একটি কাজ বর্তমান প্রেক্ষাপটে অথবা কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিপতিত করা বলে গণ্য হবে, কিন্তু এ সম্ভাবনাও আছে যে, হয়তো অন্য কোন প্রেক্ষাপটে বা অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেটা ঐরকম নয়। এ আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে,

এক. ইমাম হোসাইন (আ.) উম্মতের মধ্যে আল্লাহর বিধি- বিধানের বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন আর তিনি আল্লাহর তত্ত্বাবধানে ভুল- ত্রুটিমুক্ত হয়ে কাজ করতেন। তাই তিনি যা কিছু করেছেন সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশে ও শরীয়তের দায়িত্ব হিসেবে পালন করেছেন।

দুই. উমাইয়ারা যে কোনভাবেই হোক ইমাম হোসাইনকে শহীদ করত- তিনি ইরাকের দিকে যান বা মক্কাতেই অবস্থান করুন। তিনি এই বিষয়টি সকল দিক থেকে ভেবে দেখেছেন এবং যে কেউ তাঁর আন্দোলন ও কর্মসূচির প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে যে, ইমাম হোসাইন (আ.) জানতেন, তাঁর শাহাদাত ও নির্যাতিত হওয়ার বিষয়টি ইসলামকে টিকিয়ে রাখা ও দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ফল দান করবে। আর সে দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি প্রতিটি বিষয়ে ও প্রতিটি মুহূর্তকে নিঁখুতভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

তিন. ইমাম হোসাইনের উত্থান, বাইআত করা থেকে বিরত থাকা, ঐ মহাবিপদকে সহ্য করা ইত্যাদির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দ্বীনকে রক্ষা করা আর এই উদ্দেশ্যটি ছিল ইমামের জন্য মহা মূল্যবান একটি বিষয় যেটা অর্জন করার জন্য তিনি স্বীয় জীবন ও সন্তানবর্গ এবং সঙ্গী-

সাথিদেরকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এই কারণেই তিনি শাহাদাতকে বেছে নিয়েছিলেন এবং ঐ মহা বিপদকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মূল উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে ছিল আল্লাহর নির্দেশ পালন করা ও দ্বীন রক্ষা, অধিকার আদায়ে সহযোগিতা করা, বনি উমাইয়ার শাসনব্যবস্থার ওপর বাতিলের সীলমোহর মেরে দেওয়া ইত্যাদি। আর এ সকল উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য নত না হওয়া ও শহীদ হওয়া পর্যন্ত অটল থাকা এবং অন্যান্য ঘটনা ছিল এক প্রকার ভূমিকাস্বরূপ। যেহেতু স্বীয় সত্য বিশ্বাস ও দ্বীন রক্ষার ওপর অবিচল থাকাটা হচ্ছে গৌরব ও উচ্চ মর্যাদার কারণ, সেহেতু এ বিষয়টি নিজেকে ধ্বংসে নিপতিত করার শামিল নয়।

নারীদের অবস্থান

প্রশ্ন ২৪ : ইমাম হোসাইন (আ.) যদি জানতেনই যে, তিনি শহীদ হবেন তারপরেও কেন স্বীয় পরিবারকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন? ইমাম হোসাইনের এই আশুরা বিপ্লবে নারীদের ভূমিকা ও অবস্থানই বা কী ছিল?

উত্তর : ইমাম হোসাইনের অভ্যুত্থানের দু'টি রূপ ছিল এবং ঐ দু'টি রূপের প্রত্যেকটির ওপর এক একটি কর্ম উৎপত্তি লাভ করেছে; তার মধ্যে একটি আত্মত্যাগ, সংগ্রাম এবং শাহাদাত। আর অপরটি হচ্ছে 'বাণী প্রচার'। অবশ্য এই বাণী প্রচারটি আত্মত্যাগ ও অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভব ছিল না। এ ক্ষেত্রে নারীদের মূল ভূমিকা ছিল দ্বিতীয় বিষয়টিতে। যদিও নারীরা সংগ্রামীদেরকে প্রস্তুত করা, তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন; কিন্তু তাঁদের মূল ভূমিকা ছিল 'বাণী প্রচার করা'।

ইসলামী ও হোসাইনী বিপ্লবের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে প্রথমে দু'টি পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। প্রথমটি হচ্ছে হাদীস অনুসারে। সাইয়্যেদুশ শুহাদা ইমাম হোসাইনের সমস্ত কাজই অত্যন্ত নিপুণ ছিল এবং বিপদের আশঙ্কা থাকার বিষয়টি জানা

সত্ত্বেও যে তিনি তাঁর পরিবারপরিজনকে সাথে নিয়ে কুফা শহরের দিকে যাত্রা করেছিলেন তার -কে তিনি স্ব- (.সা) কারণ হলো রাসূলপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি তাঁকে বলছেন (রাসূল) :[২৫১]

سبايا ان الله شاء ان يراهنّ

১ (নিশ্চয় আল্লাহ তাঁদের বন্দি অবস্থায় দেখতে চান)- এ থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের বন্দি হওয়ার বিষয়টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত আছে। অর্থাৎ তিনি দেখলেন যে, পরিবারকে সাথে নিয়ে যাওয়াটাই কল্যাণকর। প্রকৃত অর্থে ইমাম হোসাইন (আ.) এই কাজের মাধ্যমে স্বীয় প্রচারকগণকে বিভিন্ন শহরে, এমনকি শত্রুর শাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্রে পাঠিয়েছেন এবং স্বীয় বাণীকে সবার কর্ণকুহরে পৌঁছে দিয়েছেন।

নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে দ্বিতীয় আলোচনাটি হচ্ছে ইতিহাসে। কেননা, কারবালায় নারীদের ভূমিকার কথা কোন ঐতিহাসিকই অস্বীকার করেননি। সরাসরিভাবে না হলেও বিভিন্নভাবে নারীদের বিশেষ ভূমিকা পালনের বিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত পোষণ করেছেন; আর সেটা এভাবে যে, নারীরা পুরুষদেরকে প্রস্তুত করে আর পুরুষরা ইতিহাস রচনা করে। আর পুরুষদেরকে তৈরির ক্ষেত্রে নারীরা যে ভূমিকা পালন করে থাকে সেটা পুরুষরা যে ইতিহাস রচনা করে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। সর্বোপরি, নারিগণের ভূমিকা পালন করা অথবা ভূমিকা পালন না করার ক্ষেত্রকে ইতিহাসে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় :

ক. কোন কোন সমাজে নারী মূল্যবান রত্ন বলে গণ্য হত। কিন্তু সামাজিকভাবে তারা কোন দায়িত্ব পালন করত না। এক্ষেত্রে নারী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হত না, মূল্যবান সম্পদ বলে তাদের অন্দর মহলে আবদ্ধ থাকত এবং পুরুষের ওপর তার প্রভাব মূল্যবান এক রত্নের পর্যায়ে ছিল; এর বেশি কিছু নয়। এধরনের সমাজের রচনাকারী কেবল পুরুষ।

খ. কোন কোন সমাজে নারীরা বস্তু বলে গণ্য হওয়ার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে সমাজের সকল অঙ্গনে প্রবেশ করে; কিন্তু এক পর্যায়ে তারা তাদের মর্যাদার সীমানাকে হারিয়ে ফেলে। কারণ তারা তাদের সৌন্দর্য ও রূপের প্রকাশসহ সকল ক্ষেত্রে বিচরণ করা শুরু করে। যেহেতু এক্ষেত্রে তাদের পদচারণার সাথে নিজেকে প্রদর্শনের প্রবণতাও থাকে তাই তাদের মর্যাদাকে হারিয়ে

ফেলে মূল্যহীন হয়ে পড়ে! এ ধরনের সমাজে নারীরা একপ্রকার 'ব্যক্তিত্বের অধিকারী' বটে, কিন্তু মূল্যহীন এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যদিও এরূপ সমাজ মানবিক উৎকর্ষের কিছু কিছু দিক - যেমন জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি, সামাজিক ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন, কর্মচঞ্চল উপস্থিতি ইত্যাদি- থেকে তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে ও নিছক বস্তুর পর্যায়ে থাকার অবস্থা থেকে বের করে এনে ব্যক্তিত্ব দান করে, কিন্তু অপর দিকে পুরুষদের কাছে তাদের মর্যাদা আর থাকে না। কেননা, যেখানে নারীদের প্রকৃতি হচ্ছে পুরুষদের কাছে পণ্যের দৃষ্টিতে মূল্যবান হওয়া নয় বরং মানুষের মূল্যে মহামূল্যবান হিসেবে গণ্য হওয়া, কিন্তু বাস্তবে নারীকে সে মর্যাদা দেওয়া হয় না; বরং তাদের থেকে ঐ মর্যাদাকে কেড়ে নেওয়া হয় ও তাদেরকে নিজেদের প্রবৃত্তি ও বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করে। ফলে তাদের মানসিক বিপর্যয় ঘটে।

এ ধরনের সমাজের স্রষ্টা যদিও নারী- পুরুষ উভয়ই, কিন্তু নারীকে সস্তা এক পণ্য বলে মনে করা হয়; ফলে পুরুষরা তাদেরকে উপযুক্ত সম্মান দেয় না।

গ. ইসলামের দৃষ্টিতে, নারীকে অবশ্যই তার পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে। অর্থাৎ একদিকে সে যেমন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে একজন আধ্যাত্মিক ও পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের, যেমন জ্ঞান, শৈল্পিকতা, শক্তিশালী ইচ্ছাশক্তি, সাহসিকতা, সৃজনশীলতা, এমনকি নৈতিকতার দিক থেকে মর্যাদা ও সর্বোচ্চ মানের অধিকারী হবে, অপর দিকে সে অশ্লীল হবে না। পবিত্র কোরআনও নারীদেরকে এ ধরনের মর্যাদা দান করেছে। উদাহরণস্বরূপ, (মহান আল্লাহ) হযরত হাওয়া (আ.)- কে হযরত আদম (আ.)- এর পাশাপাশি সম্বোধন করে কথা বলেছেন। দু'জনকেই বলা হয়েছে যেন ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী না হন।[২৫২] হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর স্ত্রী সারা'ও হযরত ইবরাহীমের মতো ফেরেশ্তাদেরকে দেখতে পেতেন এবং তাঁদের সাথে কথা বলতেন। হযরত মারইয়াম (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন রিযিক বা খাদ্য পেতেন যা দেখে আল্লাহর নবি হযরত যাকারিয়া (আ.)ও অবাক হয়ে যেতেন এবং হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.)- কে কাউসার তথা 'মহা কল্যাণ' বলা হয়েছে।

ইসলামী ইতিহাসে সর্বোত্তম উদাহরণ হচ্ছে হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.)। যিনি আনন্দিত হতেন শুধু এ কারণেই যে, রাসূল (সা.)- এর পক্ষ থেকে ঘরের কাজকর্মের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করা হয়েছে, তিনিই মসজিদে আল্লাহর তাওহীদের ওপর এমন এক বক্তব্য দিয়েছিলেন যেরূপ বক্তব্য ইবনে সীনার মতো দার্শনিকও দিতে সক্ষম হননি। কিন্তু তারপরেও তিনি পর্দার আড়াল থেকে বের হননি, বরং সেখান থেকেই বক্তব্য দিয়েছেন। অর্থাৎ পুরুষদের সাথে স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও গণ্ডি রক্ষার পাশাপাশি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, একজন নারী সমাজে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে!

উক্ত দু'টি ভূমিকার পর অবশ্যই বলতে পারি যে, কারবালার ইতিহাস নারী- পুরুষ উভয়ের ইতিহাস। অর্থাৎ নারী- পুরুষ উভয়েরই ভূমিকা তাতে বিদ্যমান, কিন্তু প্রত্যেকটি তার স্বীয় সীমারেখা ও মান- মর্যাদার মধ্যে সীমিত।

কারবালাতে পুরুষদের ভূমিকা সুস্পষ্ট, কিন্তু নারীদের ভূমিকা বিশেষ করে হযরত যায়নাব (আ.)- এর ভূমিকা আশুরার (১০ মুহররম) বিকাল থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল এবং এরপর থেকে শুরু করে সমস্ত দায়িত্ব (বন্দি কাফেলার নেতৃত্ব ও পরিচালনা এবং ইমাম হোসাইন ও আহলে বাইতের মুখপাত্র হিসাবে বক্তব্য তুলে ধরা) তাঁর ওপর অর্পণ করা হয়েছিল। তিনি ইমাম হোসাইনের পবিত্র দেহ মোবারকের সামনে এমন কিছু কাজ করেছিলেন যা দেখে বন্ধু ও শত্রু সকলেই অঝরে ক্রন্দন করেছিল। প্রকৃত অর্থে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর প্রথম শোকানুষ্ঠান তিনি সেখানেই পালন করেছিলেন। ইমাম হোসাইনের পুত্র ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এবং অন্যান্য নারী- শিশুর সেবা- শুশ্রুষা করেছিলেন এবং কুফা শহরের প্রধান ফটকের সামনে স্বীয় বক্তব্যের মাধ্যমে হযরত আলী (আ.)- এর বীরত্ব ও হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.)- এর আত্মসম্মানবোধের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। আর হযরত আলীর উচ্চমানের বক্তব্যগুলোর কথা জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং কুফা শহরের অধিবাসীদের অন্যায় কর্মকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে তাদেরকে জাগ্রত করছিলেন। এটাই হল ইসলামের কাঙ্ক্ষিত নারী। যে স্বীয় সম্মান ও লজ্জা এবং ধর্মীয় সীমারেখা বজায় রেখে একজন সামাজিক পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে আবিভ'ত হয়।[২৫৩] এই মহিয়সী নারী তার উত্তম দৃষ্টান্ত।।

উপরিউক্ত বর্ণনা অনুসারে, আশুরা বিপ্লবে ইমাম হোসাইনের পরিবারকে সাথে নেওয়ার বিষয়কে কয়েকটি দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী বলে মনে করি :

১. নারী ও শিশুরা প্রচার ও বার্তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী।

২. প্রচারক্ষমতা ছাড়াও শত্রুরাও নারীদের সামনে অনেক ক্ষেত্রে অক্ষম হয়ে যায়। কেননা, অবশ্যই তাদের (নারীদের) যে সীমারেখা আছে সেটা মেনে চলতে হয়। আর নারী ও শিশুদেরকে আঘাত করলে প্রত্যেকের সহানুভূতিতে আঘাত হানে ও যারা এই জঘন্য কাজটি করে সাধারণ মানুষের চিন্তা- চেতনা তাদেরকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করে থাকে। যেমনভাবে কারবালার ঘটনায় এমনকি শত্রুরাও স্বীয় পরিবারের নিকট লাঞ্ছিত হয়েছে।

অপরদিকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁর সর্বস্ব ও তাঁর সঙ্গী- সাথিসহ কোন প্রকার ঘাটতি ছাড়াই ঐকান্তিকতার সাথে সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহর সমীপে হাজির হয়েছিলেন। আর এ ধরনের ঐকান্তিকতার ফসলই হচ্ছে এই যে, আশুরা বিপ্লবের বিষয়টি মুসলমান ও অমুসলিম সকলকেই প্রভাবিত করেছে। আর কিয়ামতের দিনেও তাঁরা (শহীদগণ) এমন এক মর্যাদায় উন্নীত হবেন যে, সকলেই ঐ মর্যাদা লাভ করার আশা পোষণ করবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক :

এক. বাণী পৌঁছানো

ইসলামী শাস্ত্রে সামাজিক দায়িত্ব শুধু পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট নয়; বরং ধার্মিক মুসলিম নারীরাও সত্য- মিথ্যার মোকাবিলায় ঐশী বেলায়াত বা নেতৃত্বের প্রতি দায়িত্বশীল আর তারাও অবশ্যই সঠিক নেতার অনুসরণ করবে এবং দুর্নীতিবাজ শাসক ও অনুপোযুক্ত শাসকদের কর্ম ও আচরণের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করবে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরব উপস্থিতি দেখাবে। আর ঐ পথের ওপর অবিচল থাকবে যে পথের ওপর হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.) ছিলেন যিনি আল্লাহর মনোনীত ইমামের সহযোগিতায় তৎকালীন শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভুমিকায় নেমেছিলেন এবং তার অন্যায় কর্মকাণ্ডগুলোকে তুলে ধরার মাধ্যমে ভূমিকা পালন করেছিলেন। নারীরা বিশেষ করে হযরত যায়নাবও কারবালা বিপ্লবে ইমাম হোসাইনের সহযোগী ছিলেন।

প্রতিটি বিপ্লব ও সংগ্রামই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দু'টি অংশ 'রক্ত' ও 'বাণী' দ্বারা গঠিত। 'রক্ত' শিরোনামের অংশটির উদ্দেশ্য হচ্ছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংগ্রাম- যেটা আল্লাহর রাস্তায় হত্যা করা ও নিহত হওয়া এবং আহত হওয়াকে বুঝায়। 'বাণী' শিরোনামের অপর অংশটির উদ্দেশ্য হচ্ছে বাণী পৌঁছানো ও বিপ্লবের উদ্দেশ্যকে প্রচার করা।

ইমাম হোসাইনের এই বিপ্লবকে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, উল্লিখিত দুটি অংশই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল; কেননা, আশুরার বিকাল পর্যন্ত ইমাম হোসাইনের বিপ্লব ছিল প্রথম অংশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় হত্যা করা, নিহত হওয়া ও আহত হওয়া ইত্যাদি। এসময় পর্যন্ত ইসলামের পতাকা বহন ও নেতৃত্বের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল তাঁরই ওপর ন্যস্ত। অতঃপর দ্বিতীয় অংশটি ইমাম হোসাইনের পুত্র ইমাম সাজ্জাদ (যায়নুল আবেদীন) ও হযরত যায়নাব (আ.)- এর নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল। তাঁরা তাঁদের জ্বালাময়ী বক্তব্যের মাধ্যমে ইমাম হোসাইন ও তাঁর সাথিদের দ শাহাদাত ও বিপ্লবের বাণীকে সাধারণ মানুষের চিন্তা- চেতনার মধ্যে পৌঁছে দিয়েছিলেন ও কুখ্যাত উমাইয়া শাসকগোষ্ঠীকে জনগণের সামনে নিকৃষ্ট হিসেবে পরিচয় করিয়েছিলেন।

উমাইয়া শাসকরা মুয়াবিয়ার সময় থেকে, আহলে বাইতের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক অপপ্রচার ইসলামী ভ'খণ্ডের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে শাম বা সিরিয়ায় চালিয়ে আসছিল তাতে এটা নিশ্চিত যে, ইমাম হোসাইনের বংশের যাঁরা বেঁচে ছিলেন তাঁরা যদি তাদের মুখোশ উন্মোচন ও সাধারণ মানুষের চেতনা জাগ্রত করার কাজটি না করতেন তাহলে ইসলামের শত্রুরা ও ক্ষমতাশালীদের কর্মচারীরা তাঁর চিরজীবি মহান বিপ্লবকে ভবিষ্যতে মূল্যহীন করে দিত ও তার (বিপ্লবের) রূপকে পাল্টে অন্যভাবে তুলে ধরত;

যেমনভাবে কিছু কিছু ব্যক্তি ইমাম হোসাইনের ইতিহাসকে বিকৃত করে বলে থাকে : 'তিনি যক্ষ্মা রোগের কারণে ফুসফুস নষ্ট হয়ে মারা গেছেন।'

কিন্তু ইমাম হোসাইনের বংশধরদের বন্দিদশার কারণে পরবর্তীতে যে বিশাল প্রচারণার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তা এ ধরনের বিকৃতি ও পরিবর্তন ঘটানোর সুযোগ শত্রুদেরকে দেয়নি। আহলে

বাইতের নারী ও শিশুদের উপস্থিতির আবশ্যিকতা ও আশুরায় তাদের বিশেষ ভূমিকার বিষয়টি সিরিয়ায় উমাইয়াদের শাসনক্ষমতা সম্পর্কে পর্যালোচনা ও গবেষণা করলেই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

দুই. বনি উমাইয়ার প্রচারব্যবস্থাকে অকার্যকরকরণ

সিরিয়া যে দিন থেকে মুসলমানদের হাতে এসেছিল সে দিন থেকেই সেখানকার শাসনকর্তৃত্ব খালেদ বিন ওয়ালিদ ও মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মতো জঘন্য ব্যক্তিদের ওপর ন্যস্ত ছিল। সেখানকার জনগণ রাসূল (সা.)- এর বাণী শোনার সৌভাগ্যও অর্জন করেনি আর তাঁর সাহাবীদের নিয়মনীতির সাথেও তারা খুব একটা পরিচিত ছিল না এবং ইসলাম ঠিক যেভাবে মদীনায় প্রচলিত ছিল সেভাবে ইসলামের সাথে পরিচিতি লাভ করতে পারেনি। অবশ্য রাসূলের ১১৩ জন সাহাবী এই এলাকা বিজয়ের সময় হয় অংশগ্রহণ করেছিলেন অথবা ধীরে ধীরে তাঁরা সেখানে বসতি গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু এ সকল ব্যক্তির জীবনী পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, গুটি কয়েক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যরা খুব অল্প সময় রাসূলের সান্নিধ্য লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ফলে তাঁদের নিকট থেকে কেবল অল্প কয়েকটি হাদীসই বর্ণিত হয়েছে।

এ ছাড়াও তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই খলিফা হযরত উমর ও উসমানের খেলাফতকাল থেকে মুয়াবিয়ার শাসনামলের শুরুর সময়ের মধ্যে ইন্তেকাল করেছিলেন এবং ইমাম হোসাইনের বিপ্লবের সময় তাঁদের মধ্যে মাত্র ১১ ব্যক্তি জীবিত ছিলেন যাঁরা সিরিয়াতে বাস করতেন। তাঁরা সকলেই প্রায় ৭০/৮০ বছর বয়সের ছিলেন। তাঁরা সর্বদা জনগণের মাঝে থাকার চেয়ে ঘরের কোণে বসে থাকাকেই বেশি পছন্দ করতেন আর সাধারণ জনগণের ওপরও তাঁদের তেমন কোন প্রভাব ছিল না। যার ফলে সে সময়ের যুবকশ্রেণি প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছুই জানত না। তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম ঠিক তেমনই একটি শাসনব্যবস্থা ছিল যেমনটি ইসলাম- পূর্ব সময়ে তাদের দেশে রোমানদের সময় ছিল। স্বেচ্ছাচরিতা ও স্বৈরাচার শাসকদের জন্য বৈধ এক কর্ম বলে পরিগণিত হত! আর মুয়াবিয়ার দরবারের ঐশ্বর্য, বিশাল অট্টালিকা তৈরি, বিরোধিতাকারীদেরকে হত্যা করা, বন্দি করে রাখা, নির্বাসন দেওয়া, সাধারণ জনগণের সম্পদের (বায়তুল মালের) আত্মসাৎ এবং সকলের কাছে একটি স্বাভাবিক ও সহনীয় বিষয় ছিল।

কেননা, ইসলামের আগমনের অর্ধ শতাধিক বছর পূর্বেও তাদের এই ধরনের শাসনের অভিজ্ঞতা ছিল তাই মুয়াবিয়ার শাসনের ব্যাপারে তাদের কোন আপত্তি ছিল না। জনগণের এই বিশ্বাস ছিল যে, রাসূল (সা.)- এর যুগে মদীনাতেও ঠিক এরকম শাসনব্যবস্থাই ছিল।[২৫৪]

মুয়াবিয়া প্রায় ৪২ বছর ধরে সিরিয়াতে শাসন করেছিল আর এই সময়টি তুলনামূলকভাবে অনেক দীর্ঘ একটি সময়। সিরিয়ার জনগণকে সে এমনভাবে গড়ে তুলেছিল যাতে তারা সত্য সম্পর্কে অনবহিত ও দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে এবং তার চাওয়া- পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন ছাড়াই সবকিছুকে মেনে নেয়।[২৫৫] মুয়াবিয়া এত দীর্ঘ সময় ধরে সিরিয়ার জনগণকে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিকভাবে স্বীয় আধিপত্যে রাখার কারণে ঐসব এলাকার মানুষ চিন্তা- চেতনা ও মাযহাবগত বিষয়ে অন্ধ ও বোবা এবং পথভ্রষ্ট ছিল আর সে কারণেই যা কিছু সে ইসলামের শিক্ষা নামে তাদের নিকট তুলে ধরত সেগুলোকে কোন প্রকার আপত্তি ছাড়াই জনগণ গ্রহণ করে নিত।

উমাইয়া বংশের জঘন্য ও নোংরা শাসনব্যবস্থার বিষাক্ত ও হিংসাত্মক প্রচার- প্রপাগাণ্ডা রাসূলের পবিত্র বংশধরকে সিরিয়ার জনগণের সামনে অত্যন্ত ঘৃণিত হিসেবে তুলে ধরেছিল, অপরদিকে উমাইয়া বংশকে রাসূলের আত্মীয় ও অতি নিকটতম হিসেবে পরিচয় করিয়েছিল। আব্বাসী খলিফা আবুল আব্বাস সাফফাহ- এর শাসন প্রতিষ্ঠার পর সিরিয়ার ১০ জন দায়িত্বশীল কর্মচারী তার নিকট যায় এবং সকলেই কসম খেয়ে বলে- 'আমরা দ্বিতীয় মারওয়ানের (উমাইয়া খলিফা) মৃত্যুকাল পর্যন্ত জানতাম না যে, আল্লাহর রাসূলের বনি উমাইয়া ব্যতীত অন্য কোন আত্মীয় ছিল যারা তাঁর উত্তরাধিকারী। আপনি আমীর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমরা কিছুই জানতাম না।'[২৫৬]

সুতরাং এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, যখন 'মাকাতিল' গ্রন্থে পড়ি : দামেস্কে (সিরিয়ার রাজধানীতে) যখন কারবালার যুদ্ধবন্দিদেরকে (ইমাম হোসাইনের বংশধরদেরকে) নিয়ে আসা হয়েছিল তখন এক ব্যক্তি ইমাম হোসাইনের পুত্র যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল : 'সেই আল্লাহর প্রশংসা করি যে আল্লাহ তোমাদেরকে (তোমাদের আত্মীয়- স্বজনদেরকে) হত্যা ও ধ্বংস করেছেন এবং জনগণকে তোমাদের অকল্যাণ থেকে মুক্তি

দিয়েছেন!’ ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) একটুখানি ধৈর্যধারণ করলেন যাতে ঐ লোকটির মনে যা কিছু আছে তা বলে শেষ করতে পারে। অতঃপর তিনি কোরআনের এই আয়াতটি-

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

অর্থাৎ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ চান যে কোন ধরনের অপবিত্রতা হতে তোমরা আহলে বাইতকে দূরে রাখতে ও তোমাদের সর্বোতভাবে পবিত্র করতে’[২৫৭] পাঠ করলেন ও বললেন : ‘আয়াতটি আমাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।’ তারপর ঐ ব্যক্তিটি বুঝতে পারল যে, এতদিন যা কিছু এই যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে শুনেছে তা সঠিক নয়। তাঁরা অপরিচিত বিদ্রোহী নন; বরং রাসূল (সা.)- এর সন্তান। আর যা কিছু সে বলেছে তার জন্য অনুতপ্ত হলো এবং পরিশেষে তওবা করল।[২৫৮]

সুতরাং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর পরিবার-পরিজনের জ্বালাময়ী ভাষণসমূহ এবং হযরত যায়নাব ও ইমাম সাজ্জাদের অসত্যের পর্দা উন্মোচনকারী বক্তব্যগুলো বনি উমাইয়াদের কয়েক দশকের বিকৃত বিষয়গুলোকে, এমনকি শত্রুদের খেলাফতের প্রাণকেন্দ্র সিরিয়াতেও অকার্যকর করে দিয়েছিল।

তিন. অত্যাচারীদের মুখোশ উন্মোচন

ইমাম হোসাইনের পরিবার- পরিজনের উপস্থিতির কারণসমূহের অন্য একটি দিক হচ্ছে রক্তপিপাসু, নিষ্ঠুর ও অমানুষ ইয়াযীদের এবং তার শাসনব্যবস্থার জঘন্য রূপকে জনগণের সামনে তুলে ধরা। যেসব কারণে জনগণ অধিক প্রভাবিত হয়েছিল তার অন্যতম হচ্ছে আহলে বাইতের নির্যাতিত হওয়ার বিষয়টি।

এ কারণেই কিছু কিছু রাজনৈতিক দল ও উপদল সাধারণ জনগণের চিন্তা- চেতনায় স্থান করে নেওয়ার জন্য প্রচারাভিযানের সময় নিজেদেরকে নিপীড়িত ও নির্যাতিত দেখানোর চেষ্টা করে। কেননা, মানুষ সত্তাগতভাবেই যুলুম- নিপীড়ন ও অত্যাচারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট, অপর দিকে নিপীড়িতদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসে ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে থাকে।

তবে কারবালার ঘটনার ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন ছিল না; সেখানে নির্যাতিত বা নিপীড়িত হিসেবে দেখানোর বিষয়টি ছিল না; বরং প্রকৃত নির্যাতিত হওয়ার বিষয়টি আহলে বাইতের আত্মত্যাগের

সাথে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল এবং শহীদদের নেতা ও তাঁর সঙ্গী-সাথিদের উদ্দেশ্যকে সর্বোত্তমরূপে সবার নিকট পৌঁছে দিয়েছিল- এমনভাবে তা পৌঁছে দিয়েছিল যে, আজও তাঁদের বাণী মানুষের বিবেককে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দেয়।

শিশু ও নারিগণ, যাঁদের না ছিল যুদ্ধাস্ত্র আর না ছিল যুদ্ধ করার মতো শক্তি, তারপরেও তাঁরা অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় আঘাত, নির্যাতন, অপদস্থ ও মানসিক কষ্টের শিকার হয়েছেন। ছয় মাসের কচি শিশু তৃষ্ণার্ত অবস্থায় শুষ্ক ঠোঁট নিয়ে জলে ভরা ফোরাত নদীর তীরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে; ছোট্ট কন্যা পিতার রক্তাক্ত, টুকরো টুকরো লাশের পাশে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তাঁদের তাঁবুগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে... এ সকল কারণ বাণী প্রচার ও ইয়াযীদের শাসনব্যবস্থার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ঐ সঙ্গী-সাথিদের শাহাদাত ও আহত হওয়ার চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না। ইমাম হোসাইনের কচি শিশুর ঐ তৃষ্ণার্ত আওয়াজ আর সাদা কাপড়ে মুড়ানো ছোট্ট শিশু আলী আসগারের মৃতদেহ- এগুলোই ঐ তরবারি চালানো ও ঐ নিপতিত রক্তগুলোকে আজও জীবন্ত করে রেখেছে।

তাই ইমাম সাজ্জাদ (আ.) শামে বনি উমাইয়ার শাসকগোষ্ঠীর কুৎসিত রূপকে তুলে ধরতে গিয়ে বলেন : 'আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ইমাম হোসাইনকে ঐভাবে টুকরো টুকরো করে শহীদ করা হয়েছে যেভাবে খাঁচায় বন্দি একটি পাখির ডানা ভেঙে দেওয়া হয় যাতে সে মারা যায়।'

এখানে যদি ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এভাবে না বলে এভাবে বলতেন যে : 'আমার পিতাকে শহীদ করা হয়েছে', তাহলে সিরিয়ার লোকজনের চোখে- যারা আহলে বাইত সম্পর্কে তেমন কিছু জানত না, তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে হতো না; কেননা, তারা মনে করত যে, যুদ্ধে তো অনেক লোক বা অনেকেরই পিতা মারা গেছে, তার মধ্যে একজন হচ্ছেন ইমাম হোসাইন।

কিন্তু ইমাম সাজ্জাদ (আ.) সেভাবে বলেননি। তাঁর এভাবে বলার উদ্দেশ্য হলো এই যে, ধরে নিলাম তোমরা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলে, কিন্তু এভাবে কেন হত্যা করলে? কেন পাখির মতো তার শরীরটাকে টুকরো টুকরো করলে? কেন পানিভরা নদীর তীরে তাকে পানি না দিয়ে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় হত্যা করলে? কেন তাঁর তাঁবুগুলোতে হামলা করলে? কেন তাঁর শিশুদেরকে

হত্যা করলে? এই কথাগুলো জনগণের মনে এমনই আঁচড় কেটেছিল যে, গোটা সিরিয়াতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং উমাইয়াদের বিরুদ্ধে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। শেষকথা হলো, ইয়াযীদ চেয়েছিল পুরুষদেরকে হত্যা ও আহলে বাইতের সদস্যদেরকে বন্দি করার মাধ্যমে সকল প্রকার বিপ্লবী উদ্যোগকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে- এমনভাবে বিনাশ করতে যেন সকলেই এ ধরনের পরিণতি দেখে ভীত- সন্ত্রস্ত থাকে আর সে ক্ষমতার সিংহাসনে আরামে বসে থাকতে পারে। কিন্তু ইমাম হোসাইনের সম্মানজনক উত্থান ও তাঁর নির্যাতিত পরিবারের প্রচারাভিযান এবং বনি উমাইয়ার মুখোশ উন্মোচনের কাজ সেই ঘৃণ্য চক্রান্তকে সফল হতে দেয়নি। ইমাম হোসাইন (আ.)- এর পবিত্র রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ, বনি উমাইয়ার অত্যাচারীদের শিকড় উৎপাটন এবং তাদেরকে নিঃশেষ করার জন্য ইসলামী ভূখণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় এ আন্দোলনের অনুসরণে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক চিন্তাধারা

ইমাম হুসাইন (আ.)- এর আন্দোলন কি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ ছিল?

২৫ নং প্রশ্ন : ইমাম হুসাইন (আ.)- এর আন্দোলন কি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ ছিল? ইসলামের দৃষ্টিতে কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা জায়েয?

উত্তর : আশুরার দিন ওমর ইবনে সাদের সৈন্যবাহিনীর মধ্য থেকে ওমর ইবনে হাজ্জাজ নামে এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলে :

يا اهل الكوفه! الزموا طاعتكم و جماعتكم و لا ترتابوا فى قتل من مرق من الدين و خالف الامام

'হে কুফাবাসী! (আমার) আনুগত্যের ক্ষেত্রে দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ থাক এবং যারা ধর্ম থেকে বেরিয়ে গেছে ও তোমাদের নেতার বিরোধিতা করেছে তাদের সাথে যুদ্ধে কোনরূপ সন্দেহে পতিত হয়ো না।'

এ বক্তব্যে ইমাম হোসাইন (আ.)- কে মুসলমানদের ইমামের সাথে বাইআত ভঙ্গকারী এবং একজন বিদ্রোহী বলে পরিচিত করানো হয়েছে। দুঃখজনকভাবে এ ধরনের চিন্তাধারা এখনো বিদ্যমান। ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলন যে যালেম ও স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের জানা থাকা উচিত যে, ইসলামের দৃষ্টিতে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা শর্তহীনভাবে নিষিদ্ধ কোন বিষয় নয় যদিও কোন কোন মতাদর্শ এবং ইসলামী মাযহাব জনগণের এরূপ অধিকারকে অস্বীকার করে।

প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের অধিকারের সাথে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং শাসকের আনুগত্যের অপরিহার্যতার কারণের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে যা রাজনৈতিক দর্শনের সবচেয়ে মৌলিক একটি বিষয়। যদি আমরা কোন শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বৈধতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই সর্বপ্রথম আমাদেরকে আমরা কেন কোন শাসকের আনুগত্য করব তা নিয়ে পর্যালোচনা করতে হবে। আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে, শাসকের আনুগত্যের বিষয়টি কি সবসময় শর্তহীন? এ ক্ষেত্রে কি কোনরূপ বিরোধিতার অনুমতি নেই? নাকি বিরোধিতা করা যাবে? যদি

করা যায় তবে তার শর্তগুলো কী কী? আমরা এখন এ প্রশ্নগুলোর উত্তর গণতন্ত্র এবং ঐশী অধিকারের মতবাদের মধ্যে খুঁজব।

১. গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে বিদ্রোহ করার অধিকার

পশ্চিমা বিশ্ব সামাজিক চুক্তি (SOCIAL CONTACT) ও জনগণের সন্তুষ্টিকে সরকারের বৈধতার ভিত্তি মনে করে। সরকারের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের নিরাপত্তা দান, এর পরিবর্তে জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের আনুগত্য করা। এ দৃষ্টি থেকে সরকারের দায়িত্ব হলো আইন প্রণয়ন ও শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এ নীতির ভিত্তিতে শাসন কর্তৃত্বের বৈধতার ভিত্তি হলো ওকালত বা প্রতিনিধিত্ব যা জনগণ সরকারের হাতে অর্পণ করে। হবজের মতে, এ দায়িত্ব ও প্রতিনিধিত্ব জনগণ তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দিয়ে থাকে। কিন্তু জন লকের মতে, জনগণ তাদের প্রাকৃতিক অধিকার (NATURAL RIGHTS) রক্ষার জন্য তা করে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদের পক্ষের কেউ কেউ যেমন হবজ (HOBS) জনগণের সরকারের বিরোধিতা করা ও অবাধ্যতার অধিকার আছে বলে মনে করেন না। আবার কেউ কেউ এ অধিকার শুধু একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর জন্য বৈধ মনে করেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নয়। যেমনভাবে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণায় বলা হয়েছে : সরকার তার ন্যায়গত ক্ষমতাকে শাসিত জনগণের সমর্থন থেকে লাভ করে থাকে যা তারা স্বেচ্ছায় তার হাতে অর্পণ করে। আমরা বিশ্বাস করি যে, সরকার- তা যে কোন পদ্ধতিরই হোক, যদি এ লক্ষ্যকে হুমকির সম্মুখীন করে তাহলে জনগণের অধিকার রয়েছে ঐ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত অথবা পরিবর্তন করার এবং সে স্থানে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করার।[২৫৯] জন লক যদিও মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষার পক্ষে এবং সরকারের বিচ্যুতির বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহের অধিকারের বিষয় উপস্থাপন করেছেন; কিন্তু তাঁর বক্তব্য তেমন স্পষ্ট নয়। তিনি তাঁর নগর সরকার বিষয়ক প্রবন্ধে বলেন : ‘যে আইন সকল মানব প্রণীত আইনের ওপর প্রাধান্য রাখে তা হলো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার- যা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট- জনগণের জন্য সংরক্ষিত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না পৃথিবীর বিচারের সময় আসবে (অর্থাৎ বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত) ততক্ষণ ঐশী ফয়সালার জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে।[২৬০]

কিন্তু এই অবস্থায়ও সমাজের অধিবাসীদের ক্ষুদ্র বা একাংশের দৃষ্টিতে যে সরকার বা শাসক সঠিকভাবে জনগণের অধিকার রক্ষা করছে না তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার রাখে না। যদিও এ অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ক্ষেত্রে আছে।[২৬১]

তাই গণতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থকদের অনেকেই বিদ্রোহ করার অধিকারকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বৈধ বলে মনে করে না, তাদের মতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিদ্রোহের বিষয়টি উপেক্ষা করা উচিত। কারণ, গণতন্ত্র সংখ্যালঘু দলের জন্য মত প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে প্রতিবাদের অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে।[২৬২] ফলে স্বতন্ত্রভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে কারো প্রতিবাদের অধিকার নেই।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিদ্রোহের অবৈধতার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়েছে, যেমন-

এক : যদিও সরকার ও রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে প্রাথমিক যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার ভিত্তিতে জনগণ সরকারকে তাদের শাসনের দায়িত্বভার অর্পণ করেছে, কিন্তু যখন ব্যক্তি দেখছে যে, বর্তমান অবস্থা তার সার্বিক কল্যাণ অর্জনের পথকে হুমকির মুখে ফেলছে তখন সে কেন তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না? কেন এই অবস্থায় সে তার সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে পারবে না?[২৬৩]

দুই : সংখ্যাগুরু শাসকগোষ্ঠী অন্যদের অধিকারকে লঙ্ঘন করে- এ ধারণাটি সবসময় অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ, গণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীও যে ঔপনিবেশিক দমন নিপীড়ন চালায় এবং কখনও কখনও ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে মানুষের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাই তা প্রমাণ করে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সাধারণ ইচ্ছার (এবহবৎধষ রিষষ) প্রতিফলনের নামে অনেক সময় ব্যক্তি- ইচ্ছা, ব্যক্তিস্বার্থ ও স্বৈরাচার বাস্তবায়িত হয়ে থাকে অর্থাৎ সাধারণ ইচ্ছা স্বৈরাচারী শাসনে পরিণত হতে পারে।[২৬৪]

তিন : গণতন্ত্রে যে সংখ্যালঘুদের জন্য যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হয়েছে তা কে নির্ণয় করবে? আর গণতন্ত্রের অধীনে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে কি না তা- ই বা কে বিচার করবে? তাই এতে

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংখ্যালঘুদের প্রতিবাদের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষা হয়েছে- এ দাবি যদি সংখ্যালঘুদের দ্বারা সমর্থিত না হয়, যে কোন কর্তৃপক্ষই তা নির্ণয় করুক, বাস্তবে অধিকার হরণ করা হয়েছে দাবি উঠলে তাদের দাবির সমাধান কে করবে? ফ্রান্টেস নিউম্যানের ভাষায় : 'গণতন্ত্রের পক্ষপাতিরা বিদ্রোহের অধিকারের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের বিষয়ে কোন উপায় ও পথই দেখান নি।'[২৬৫]

চার : যেহেতু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনের ভিত্তি হলো অধিকাংশের সমর্থন, চাওয়া ও সন্তুষ্টি, সেহেতু কেউই সাধারণ ইচ্ছার বিপরীতে কোন কিছুকে আইন বা মূল্যবোধ বা অধিকার হিসেবে দাবি করতে পারে না এবং তার ভিত্তিতে প্রতিবাদ জানাতে পারে না। তাই এ পদ্ধতিতে বিদ্রোহের কোন সুযোগ নেই।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত হয়ে পড়ে এবং অধিকাংশের স্বৈরাচার নৈরাজ্যের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে।[২৬৬] তবে বাস্তবে অবস্থা এর থেকেও শোচনীয়। কারণ, সংখ্যালঘু দল ভোটে তুলনামূলক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর শাসন পরিচালনা করে। ফলে নতুন করে নৈরাজ্যবাদের দাবিকে সোচ্চার করে।

২. 'ঐশী অধিকার' মতবাদ অনুযায়ী বিদ্রোহ করার অধিকার

এ মতবাদে সরকারের বৈধতার ভিত্তি হচ্ছে ঐশী অনুমোদন থাকা যা আল্লাহর সর্বভৌমত্ব থেকে উৎসারিত। এ মতবাদ দীর্ঘদিন ধরে চালু আছে এবং ইতিহাসের পরিক্রমায় বিভিন্নরূপ সমস্যা তাতে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রাচীন প্রাচ্যদেশীয় সম্রাটগণ, মিশরীয় ফিরআউন বংশীয় সম্রাটগণ এবং অন্য শাসকগণ নিজেদেরকে 'খোদা' মনে করত। কিছু কিছু মতবাদ রাজা- বাদশাহদের ক্ষমতার উৎস খোদায়ী বলে মনে করত অর্থাৎ তাদের নেতৃত্বের উৎস হলেন স্বয়ং স্রষ্টা। মধ্য যুগের খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করত যে, শাসকদের ক্ষমতার উৎস হলেন খোদা। প্রাচ্যের দেশগুলোতে এ চিন্তাধারা ছিল যে, শাসকরা (সুলতানরা) হচ্ছেন আল্লাহর আরশের ছায়া যা আল্লাহর সাথে তাঁদের এক ধরনের সম্পর্কের পরিচয় বহন করে।[২৬৭]

এ মতবাদে বিদ্রোহ করার অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম মতভেদ রয়েছে।

বাইবেলের তেরতম অধ্যায়ের প্রথমে এসেছে : 'সবাই যেন শাসকদের হুকুম মেনে চলে, কেননা, সকল শক্তিই খোদা থেকে সৃষ্টি এবং সকল শাসনকর্তাকেই তিনি নিয়োগ করেছেন। অতএব, যে কেউ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে সে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছে এবং নিজেকে আল্লাহের আযাবের দিকে ঠেলে দিয়েছে।'

খ্রিস্টান ধর্মজাযক সেন্ট টমাস এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন যে, 'কোন ব্যক্তির জন্য এটা বৈধ নয় যে, স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে অথবা তাকে হত্যা করবে। যদিও সেই ব্যক্তির (বিদ্রোহী) পেছনে জনগণের সমর্থন ও মদদ থাকে।'[২৬৮]

অতীতের পাশ্চাত্য রাজনৈতিক বিধিমালায় এই বাণী ছিল যে, শাসকেরা আল্লাহর ইচ্ছায় ক্ষমতা হাতে নিয়েছে। এ জন্য অবশ্যই তার আনুগত্য করতে হবে এবং তাকে মেনে নিতে হবে, যদিও সে অত্যাচারী হয়, এছাড়া আর কোন উপায় নেই।[২৬৯]

আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিভঙ্গি

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের নিরঙ্কুশ আনুগত্যের মতবাদ সমর্থন ও গ্রহণযোগ্যতা পায় নি। অধিকাংশ ইসলামী মাযহাব যালেম- অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে জায়েয মনে করে। যদিও ফিতনা- ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা বিস্তারের ভয় আন্দোলন জায়েয হওয়ার ফতোয়ার জন্য এক ধরনের প্রতিবন্ধক।[২৭০] যদিও কোন কোন ব্যক্তি, যেমন ইমাম আবু হানিফা জায়েযের ফতোয়া দেওয়া ছাড়াও নিজেই অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করাকে সমর্থন দিয়েছেন।[২৭১]

এর বিপরীতে কতিপয় মাযহাব, যেমন হাম্বালী মাযহাব বৈধ শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করাকে স্পষ্টভাবে ইসলামের সীমা লঙ্ঘন মনে করে এটাকে নিষেধ করেছে। দুঃখজনকভাবে এ মত অধিকাংশ ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা ও প্রসার লাভ করেছে। কেননা,

প্রথমত, রাসূল (সা.)- এর কিছুসংখ্যক হাদীসের বাহ্যিক অর্থ তাদেরকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। যেমন- 'তাদের (শাসকদের) কথা শ্রবণ কর ও তাদের আনুগত্য কর। নিশ্চয় তারা যা করবে তার দায়িত্ব তাদের এবং তোমরা যা করবে তার দায়িত্ব তোমাদের।'

দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের মতবাদ পোষণকারীদের সাথে শাসকদের সুসম্পর্ক ছিল।

তৃতীয়ত, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতা তাদের মধ্যে লোপ পেয়েছিল এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারার সমর্থক দলসমূহ, যেমন মুতাযিলা মতবাদ দুর্বল হয়ে ছিটকে গিয়েছিল। ইবনে আকিল মুতাযিলি বলেন : 'আমাদের অনুসারীরা অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করাকে ওয়াজিব মনে করে। আশআরী মতবাদের অনুসারীদের- যেমন আবু হামেদ গাজ্জালীর- এ ধরনের বিদ্রোহে বিশ্বাস নেই।' দুঃখজনকভাবে এ ধরনের চিন্তা আহলে সুন্নাতের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে যার ফলে বর্তমান সময়ে আরব দেশসমূহে কিছু কিছু সরকারবিরোধী গোষ্ঠী ও আন্দোলনকারী দল- যারা ধর্মের প্রতি অনুগত তারা এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন যে, সরকারের বিরুদ্ধে তাদের এ আন্দোলন শরিয়তবিরোধী কাজ বলে গণ্য হয় কিনা।

শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, অবাধ্যতা- এ বিষয়গুলো সরকারের বৈধতার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে বিদ্রোহের বৈধতার বিষয়টি 'বৈধ সরকার ও অবৈধ সরকার' শিরোনামে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব।

যালেম ও অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ : যেহেতু শিয়াদের আকিদা আনুযায়ী ইমামদের যুগে ইমামত ও নেতৃত্বের শর্ত হচ্ছে নিষ্পাপত্ব, সেহেতু নিষ্পাপ ইমাম ছাড়া অন্য কোন শাসক, এমনকি ন্যায়পরায়ণ হলেও জবর- দখলকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং শাসন কাজে তার হস্তক্ষেপ অবৈধ। ইমামদের অনুপস্থিতিতে যদি কোন শাসক বর্তমান ইমামের সম্মতিক্রমে

নির্বাচিত না হয়ে থাকে তাহলে তা জবর- দখল হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, এ ধরনের অনুমতি কেবল ন্যায়পরায়ণ ফকীহদের দেওয়া হয়েছে। অন্য কারো জন্য এ ধরনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। সেহেতু যে সরকার সকল শর্তের অধিকারী ফকীহর তত্ত্বাবধানে নেই সে সরকার হচ্ছে জবর- দখলকারী ও তাগুতী সরকার।[২৭২] শরিয়তের বৈধতা ছাড়া কোন শাসকের জনগণকে শাসন করার অধিকার নেই এবং জনগণের জন্য আবশ্যক নয় ঐ সরকারের আইন মেনে চলা। অবশ্য এ ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থায় ও সাধারণ অবস্থায় অত্যাচারী সরকারের (ও শাসন কর্তৃপক্ষের) বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ, যদিও প্রথম ক্ষেত্রে সরকার বৈধ নয়, কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশেষ পরিস্থিতির কারণে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে বিরত থাকতে হবে যাতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ নিশ্চিত হয় অথবা অধিকতর অকল্যাণকে প্রতিরোধ করা যায়। এক্ষেত্রে শাসকের আনুগত্যের বিষয়টি সরকার বৈধ হওয়ার ওপর নির্ভর করে না; বরং এ আনুগত্য জরুরি অবস্থায় দ্বিতীয় পর্যায়ের (বিশেষ অবস্থায় উদ্ভূত) বিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে যা সাধারণ ও প্রকৃত বিধান নয়। উদাহরণস্বরূপ, শিয়া ফকীহগণ জবর- দখলকারী সরকারের সাথে সহযোগিতাকে হারাম মনে করেন। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলমী দেশসমূহে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনের তাগিদে বিশেষ শর্তাধীনে জবর- দখলকারী সরকারের সাথে সহযোগিতা এবং তাদের অনুসরণকে প্রয়োজনীয় মনে করেন। প্রথমত, এটা স্বাভাবিক যে, এ রকম বিষয়ে জবর- দখলকারী সরকারের অনুসরণের অর্থ এই নয় যে, তাকে শরিয়তের বৈধতা দেওয়া। দ্বিতীয়ত, এ রকম অসহায় অবস্থায় ইসলামী সমাজের স্বার্থের জন্য তা প্রয়োজন ছিল। এ ধরনের মতাদর্শের পেছনে ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি রয়েছে। যেমনভাবে অষ্টম ইমাম রেযা (আ.)- কে এক ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত বক্ষীর হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : 'যদি ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে, তবে যুদ্ধ সরকারের শক্তি বৃদ্ধির জন্য নয়; বরং ইসলামী দেশ ও সমাজ রক্ষার জন্য। যদি ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্মান ও মৌলিক কোন বিষয় হুমকির সম্মুখীন হয় তবে ইসলামী সমাজের

কারণেই (ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে) যুদ্ধ করবে- শাসকের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য নয়।'[২৭৩]

বিদ্রোহের পর্যায়সমূহ

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জবর- দখলকারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পর্যায় রয়েছে।

প্রথমত, অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান : জবর- দখলকারী শাসককে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান এবং তার নির্দেশ পালন ও বাইআত থেকে বিরত থাকাই ছিল নিষ্পাপ ইমামদের পথ। যেমন ইমাম আলী (আ.) ও হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.) জীবিত থাকা অবস্থায় খলিফার বাইআত করা থেকে বিরত থেকেছেন।[২৭৪] ইমাম হোসাইনও ইয়াযীদের বাইআত অস্বীকার করে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে বলেন : 'কখনই ইয়াযীদের কাছে বাইআত করব না। কেননা, আমার ভাই হাসানের পরে ঐ খেলাফত আমার।'[২৭৫]

কখন কখন যদিও বাইআত জায়েয নয়, কিন্তু বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে এ হুকুম পরিবর্তন হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম আলী (আ.) ইসলাম ধর্মকে রক্ষা এবং শক্তিশালী করার জন্য খলিফাদের বাহ্যিক সমর্থন ও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাই তিনি বলেন : 'আমি এ বিষয়ে ভীত ছিলাম যে, যদি ইসলাম ও তার অনুসারীদের সাহায্য না করি তাতে ইসলামে ফাটল অথবা উত্তপ্ত অবস্থার (উত্তেজনার) সৃষ্টি হবে যার কষ্ট আমার নিকট তোমাদের ওপর (ন্যায়ের) শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা হারানোর কষ্ট হতে অধিক।'[২৭৬]

কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.)- এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি হচ্ছে যে, ইয়াযীদের হাতে বাইআতের অর্থ হচ্ছে তার যুলুম, অত্যাচার, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে বৈধতা দান। কারণ, ইয়াযীদ প্রকাশ্যে ঐ সকল অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করত। ধর্মকে খেলা মনে করত। যার ফলে ইসলাম ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছিল। ইমাম হোসাইন (আ.) চরম প্রতিকূল অবস্থা ও চাপের মুখেও ফাসেক শাসকের হাতে বাইআত করেননি। ইমাম হোসাইন (আ.) পরিষ্কারভাবে তাঁর বাইআত হতে বিরত থাকার

কারণ সম্পর্কে বলেন : 'নিশ্চয় সুন্নাতকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং বিদআতকে জীবিত করা হয়েছে।'

দ্বিতীয়ত, আন্দোলন ও প্রতিরোধ : অবৈধ শাসকের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা যা মৌখিকভাবে বলার মাধ্যমে শুরু হবে এবং অত্যাচারী শাসক ও সরকারকে বিতারিত না করা পর্যন্ত তা চলবে। এ ক্ষেত্রে আন্দোলন ও বিদ্রোহের বিশেষ গুরুত্ব ও ভূমিকা রয়েছে। ইসলাম ধর্মে বিদআত চালুর অভিযোগে ওসমানের বিরুদ্ধে মুসলমানরা বিদ্রোহ করে যা মুসলমানদের সর্বপ্রথম বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা ছিল। অন্য উদাহরণ হচ্ছে, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলন। ইমাম সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব পালনের জন্য ইয়াযীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ইমাম হোসাইন (আ.) অত্যাচারী শাসকের বিরোধিতা করাকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের অন্তর্ভুক্ত ওয়াজিব দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি আলেমসমাজ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে এ কারণে তিরস্কার করেছেন যে, কেন অত্যাচারীদের সাথে হাত মিলিয়েছে এবং নীরবে বসে আছে।

তিনি বলেন : 'তারা কেন মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে অত্যাচারীদের হাত শক্তিশালী করেছে যাতে তারা (অত্যাচারী গোষ্ঠী) তাদের প্রবৃত্তির কামনা- বাসনাকে চরিতার্থ করতে পারে। আর দুর্বলদেরকে হাতের মুঠোয় আনতে এবং অসহায়দেরকে দমন করতে পারে। আল্লাহর আদেশ- নিষেধ অমান্য করে শাসনক্ষমতাকে নিজের খেয়াল- খুশি মতো পরিচালনা করতে পারে।'

ইমাম হোসাইন (আ.) বনু উমাইয়ার শাসনকে অবৈধ প্রমাণ করা এবং বৈধ শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে সাহায্য ও তাঁর অনুসরণ এবং মুসলিম সমাজের সঠিক ইমাম ও পথপ্রদর্শনকারীর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করে বলেন : 'আমার সত্তার শপথ, ইমাম তিনি ব্যতীত কেউ নন যিনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করেন, ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করেন, সত্যের অনুগত ও অনুসারী হন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন।'[২৭৭]

হুর ইবনে ইয়াযীদ রিয়াহীর সৈন্য বাহিনীকে লক্ষ্য করে ইয়াযীদের শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আবশ্যকতা বর্ণনা করে বলেন : 'এ জাতির ক্ষমতাধররা শয়তানের আনুগত্যকে অপরিহার্য জ্ঞান করেছে, করুণাময়ের (আল্লাহর) আনুগত্যকে ত্যাগ করেছে। প্রকাশ্যে তাঁর বিধানকে লঙ্ঘন করেছে ও তাঁর নির্ধারিত আইন ও বিধিকে অকার্যকর করেছে। বাইতুল মাল ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে আত্মসাৎ করেছে, আল্লাহর বৈধ বিষয়কে হারাম এবং তার নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ ঘোষণা করেছে। এ অবস্থায় আমি এরূপ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকারপ্রাপ্ত।'[২৭৮]

বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

শিয়াদের বিশ্বাস হচ্ছে, বৈধ সরকার ও শাসনব্যবস্থা ইমামদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ইমামের অনুপস্থিতিতে ইমামের অনুমতি ও প্রত্যয়ন প্রয়োজন যা সকল শর্তের অধিকারী ফকীহদের দেওয়া হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, ইমামত ও তাঁদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ নয়। কেননা, তাঁরা হচ্ছেন নিষ্পাপ, তাঁদের থেকে ভুল, পথভ্রষ্টতা ও পাপাচারের কোন সম্ভাবনা নেই। এ দিক থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাঁদের অবাধ্যতা অবশ্যই যুলুমের শামিল হবে এবং তা মোকাবিলা করতে হবে। আল্লামা হিল্লি এ সম্পর্কে বলেন : 'যে কেউ ন্যায়পরায়ণ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে তার সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব।'

কিন্তু কথা হচ্ছে, ইমামদের অনুপস্থিতিতে (গাইবাত) বেলায়াতে ফকীহর শাসন কীভাবে গ্রহণযোগ্য হয়?

যেমনভাবে আমরা জানি যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে ঐ সকল শাসকের আনুগত্য করা বৈধ যে ক্ষেত্রে আল্লাহর অনুমতি আছে, এর বাহিরে কখনই আনুগত্য বৈধ নয়। এই দিক থেকে শরিয়তের বাহিরে ও নিরঙ্কুশভাবে কোন শাসকের আনুগত্য গ্রহণযোগ্য নয়। স্রষ্টার (আল্লাহর) নির্দেশ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কোন সৃষ্টির (বান্দার) আনুগত্য করা যাবে না বা আনুগত্য বৈধ নয়।[২৭৯]

ইমামদের নিষ্পাপত্বের কারণে তাঁরা কখনই শরিয়তবিরোধী কাজ ও নির্দেশ দেবেন না, তাই বিদ্রোহের কোন প্রয়োজনই নেই।

কিন্তু ইমামদের পক্ষ হতে নিযুক্ত শাসকের ক্ষেত্রে আনুগত্য শুধু ধর্মীয় বিধি- বিধান ও সামাজিক বিষয়াদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন ইমাম আলী (আ.) মালিক আশতারকে নিয়োগ দেওয়ার পর মিশরের জনগণের প্রতি মালিকের প্রশংসা এবং তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানানোর পর বলেন : 'যতক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যের পথে চলবে তার আনুগত্য করবে।'[২৮০]

হযরত আলী (আ.) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বসরার শাসক হিসেবে নিয়োগ দানের সময় জনগণকে বলেন : 'যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মেনে চলবে ততক্ষণ তার আনুগত্য করবে আর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিদআতের সৃষ্টি করে অথবা সত্য থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে আমাকে খবর দেবে যাতে তাকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করতে পারি।'[২৮১]

শাসকের কর্মকাণ্ডের সঠিকতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কেবল ঐ সকল ব্যক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে যাদের ইসলামী অধিকার ও শরিয়তের বিধি- বিধানের ওপর বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞান রয়েছে। অন্যদিকে চলমান সময়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রয়েছে।

এছাড়াও শাসকের পথভ্রষ্টতা ও বিচ্যুতির বিভিন্ন কারণ রয়েছে, যেমন খোদাভীতির অভাব ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে দূরে সরে যাওয়া, ইসলামের বিধি- বিধানের সঠিক ব্যাখ্যা না জানা, সমসাময়িক বিশ্বকে বিশ্লেষণে ব্যর্থতা, সামাজিক কোন প্রেক্ষাপট বুঝতে না পারা ইত্যাদি।[২৮২]

এ জন্য এ দুই বিষয়ে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। কেননা, খোদাভীতি ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে দূরে সরে যাওয়া কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। এরূপ ক্ষেত্রে শাসক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষমতা থেকে অপসারিত হবে ও শাসনের বৈধতা হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু সামাজিক বিষয়াবলির ক্ষেত্রে যদি ভুল করা বা বিষয়কে সঠিকভাবে বিশ্লেষণে ব্যর্থ হওয়া বা কোন ঘটনার পরিণতি কী হতে পারে তা নির্ণয় করতে না পারা- এরূপ ঘটনা তার (শাসক) ক্ষেত্রে খুব কম ঘটে তবে তা উপেক্ষণীয়। তেমনি নিজের মতকে প্রাধান্য দান এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো যদি

শাসক ফকীহ থেকে কদাচিৎ দেখা যায় এবং পুনঃপুনঃ না ঘটে তবে তা বুদ্ধিবৃত্তি ও শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ও উপেক্ষা করার মতো। কারণ, এধরনের অনিচ্ছাকৃত ভুল পৃথিবীর সকল শাসনেই কম- বেশি ছিল। যেমন শহীদ বাকের সাদর এ ক্ষেত্রে বলেন : 'যদি কোন মুজতাহিদ তাঁর সর্বসাধারণ কর্তৃত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের সার্বিক বিষয়ে কোন হুকুম (নির্দেশ জারি) করেন, যদিও সে বিষয়ে তিনি ভুল করেছেন বলে কেউ নিশ্চিত হয়, তদুপরি কারো জন্য বৈধ নয় যে, সে ঐ সেই শাসকের হুকুমকে এড়িয়ে নিজের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করবে।'[২৮৩]

কিন্তু শাসক যদি একের পর এক ভুল করতে থাকে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলি বুঝতে অক্ষম হয় এবং নেতৃত্বের সঠিক কর্মকৌশল জানা না থাকে তাহলে উত্তম হচ্ছে এ পদের জন্য যে যোগ্য তাকে নেতা হিসেবে নিয়োগ করা।

প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

বিভিন্ন প্রকার বিদ্রোহের মধ্যে একটি হলো ইসলামী শাসনের অধীনে কর্মরত বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। শহীদ বেহেশতী এ সম্পর্কে বলেন : 'প্রশাসন যদি চলমান বিভিন্ন ইসলামবিরোধী দলের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নেয় তাহলে জনগণ ও বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের উচিত দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের কাছে বিভিন্নভাবে দাবি জানানো যে, তাঁরা যেন সঠিকভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। যদি তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন না করেন এবং ইসলামবিরোধী তৎপরতা সামাজিক শান্তি- শৃঙ্খলা এবং নৈতিকতার জন্য হুমকিস্বরূপ হয় তাহলে ইসলামী দলসমূহ সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার কাছ থেকে ফতোয়া (তাদের করণীয় নির্দেশ) চাইবে এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে। আর এভাবে তারা একদিকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে রক্ষার দায়িত্ব পালন করল, অন্যদিকে রাষ্ট্রে কোন বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি হলো না।

হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) বিভিন্ন কর্মকর্তাদের নিজ দায়িত্ব পালনে অবহেলার ক্ষেত্রে জনগণের জন্য প্রতিবাদের পথকে উন্মুক্ত রেখেছিলেন এবং তাঁর রাজনৈতিক ও ঐশী অসিয়তনামায় বলেন : 'শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম বলে গণ্য যে কোন বিষয় এবং ইরানী জাতি এবং এই ইসলামী

প্রজাতন্ত্রের লক্ষ্য ও সম্মানের পরিপন্থী সকল কাজ কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা সকলেরই দায়িত্ব। বিপ্লবী জনগণ এবং যুবকরা যদি ঐ রূপ কোন বিষয় দেখেন তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবাদ জানাবেন। আর যদি তাঁরা গুরুত্ব না দেন (সংশোধিত না হন) তখন বিপ্লবী জনগণ এবং যুবকরাই তা মোকাবেলা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন।'[২৮৪]

আশুরা এবং ধর্ম ও রাজনীতির সংযোগ

২৬ নং প্রশ্ন : ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলন ও আশুরার সংস্কৃতি কি সেক্যুলার বিশ্বাসকে (ধর্ম ও রাজনীতি পরস্পর পৃথক) বাতিল প্রমাণ করে?

উত্তর : কিছুসংখ্যক ব্যক্তি 'ধর্ম রাজনীতি থেকে পৃথক'- এটাকে প্রমাণ করার জন্য এ রকম বলে থাকেন যে, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলন শতভাগ গণতান্ত্রিক ছিল এবং জনগণের দাবির কারণে তা ঘটেছে। এর দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলনের সাথে খোদায়ী নেতৃত্বের কোন সম্পর্ক নেই।

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কুফার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ প্রথমে মদীনা থেকে মক্কা, অতঃপর সেখান থেকে কারবালা গমনের কারণ ছিল জনগণের লিখিত ও মৌখিক দাওয়াত। কুফার গোত্রপতি ও জনগণের উদ্দেশ্য ছিল উমাইয়াদের যুলুম ও অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ এবং শাসনক্ষমতা লাভ করা। জনগণের পক্ষ থেকে ইমামকে আহ্বান ছিল শতভাগ গণতান্ত্রিক। যুদ্ধ, শাহাদাত অর্থাৎ ইমাম হুসাইন এবং তাঁর সঙ্গীসাথিদের আন্দোলন ও বিপ্লব এক প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ ছাড়াও ইসলাম ও তাঁর পরিবারের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষামূলক পদক্ষেপ ছিল। যা এ বাস্তবতার প্রতি নির্দেশ করে যে, ইসলাম ও ইমাম হোসাইনের দৃষ্টিতে খেলাফত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইয়াযীদ ও অন্যান্য খলিফার জন্য নয়। এমনকি ইমাম হোসাইন (আ.) এবং আল্লাহও এর অধিকারী নন; বরং এ ক্ষমতার উৎস হলো জনগণ অর্থাৎ রাষ্টীয় ক্ষমতা হলো জনগণের এবং তারা

নিজেদের নির্বাচনের মাধ্যমে এ ক্ষমতার প্রয়োগ করবে।[২৮৫] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইমাম হোসাইনের বাণী ও ইতিহাসের বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করলে এটাই স্পষ্ট হয় যে, ইমামের রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল খোদায়ী ও ঐশী উদ্দেশ্যে যা সেক্যুলারদের আকিদাকে বাতিল করে দেয়। ইমাম হোসাইনের আন্দোলন কোন্ ধরনের শাসনের ভিত্তিতে ছিল, এ বিষয়ে জানার জন্য প্রথমে প্রয়োজন হচ্ছে খোদায়ী শাসন ও ধর্ম নিরপেক্ষ শাসনের পার্থক্য জানা। কেননা, এ দুই ধরনের শাসনের মূল দর্শন, লক্ষ্য, শাসনের বৈধতার ধরন এবং শাসকের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে মূল পার্থক্য রয়েছে। তাই ইমাম হোসাইন (আ.)- এর দৃষ্টিতে উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করব।

এক. শাসনের লক্ষ্য ও দর্শন

ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁর শাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ঊর্ধ্বের এক বিষয় বলে উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ তিনি জনগণের সুখ- সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়কে তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেননি।

তিনি কুফাবাসীর দাওয়াত ও বাইআতের বিষয় আলোচিত হওয়ার পূর্বেই মদীনা ত্যাগ করার সময় তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ইসলামী সমাজের সংস্কার সাধন, ধর্মীয় দায়িত্ব পালন ও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ বলে ঘোষণা করেন।

انّا خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدّی ارید ان ءامر بالمعروف و انھی عن المنکر

‘আমি বের হয়েছি কেবল আমার নানার উম্মতকে সংশোধন করার জন্য। আমি চাই, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে।’[২৮৬]

ইমামের এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদিও তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে সরকার গঠন করা সম্ভব হবে না এবং কুফাবাসীরা তাদের বাইআত ভঙ্গ করবে তবুও তিনি তাঁর আন্দোলন থেকে দূরে সরে যান নি। কেননা, তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে জীবিত করা। নেতৃত্ব ও শাসনক্ষমতা ছিল পরবর্তী পর্যায়ে।

ইমাম হোসাইন (আ.) মুয়াবিয়ার জীবনের শেষ পর্যায়ে হজের মৌসুমে মিনায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। সেখানে শত শত জনতা এবং সে সময়ের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর শাসনক্ষমতার লক্ষ্য- উদ্দেশ্যকে এভাবে বর্ণনা করেন- 'হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমি যা করছি তা ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতার জন্য নয়। আমি এর মাধ্যমে পার্থিব সম্পদ লাভ করতে চাই না। আমি কেবল চাই আপনার ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং আপনার জমিনে সংস্কার সাধন করতে, যাদের ওপর যুলুম করা হয়েছে তাদেরকে মুক্তি ও নিরাপত্তা দান করতে। আর সকল ফরয, সুন্নাত ও ঐশী বিধি- বিধানকে বাস্তবায়িত করতে।'

(তুহাফুল উকুল, পৃ. ২৪৩)

তিনি তাঁর এ বক্তব্যের পর না ক্ষমতা দখল ও জনগণের ওপর কর্তৃত্ব লাভের কথা বলেছেন, আর না কোন পার্থিব সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর উদ্দেশ্যকে এভাবে বর্ণনা করেন-

১. আল্লাহর দ্বীনের নিশানাকে স্পষ্ট করা।

২. পৃথিবীতে সংস্কার করা।

৩. অসহায় মানুষের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

৪. আল্লাহর সুন্নাত, বিধান ও ওয়াজিবসমূহের আমল করা।[২৮৭]

ইমাম হোসাইন (আ.) মক্কা থেকে কুফার পথে ফারাযদাকের সাথে কথোপকথনের সময় বলেন : 'হে ফারাযদাক! এ জাতি (বনু উমাইয়্যা) শয়তানের আনুগত্যকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করেছে, পরম করুণাময়ের আনুগত্যকে ত্যাগ করেছে। তারা পৃথিবীতে অনাচার সৃষ্টি এবং আল্লাহর বিধি- বিধানকে বাতিল প্রতিপন্ন করেছে। মদপান করছে এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। এ অবস্থায় আমি হলাম সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর দ্বীনে সাহায্য করার জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত। তাঁর শরিয়তকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করা এবং তাঁর পথে জিহাদের দায়িত্ব আমার ওপরই ন্যস্ত যাতে আল্লাহর বাণী সমুন্নত ও উচ্চকিত হয়।'

এই অংশে ইমাম হোসাইন উমাইয়াদেরকে সত্যিকার অর্থে সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, তাদের চিন্তা- ভাবনা হচ্ছে আল্লাহর বিধানকে শাসনক্ষমতা থেকে দূরে রাখা। ইসলামী সমাজে সর্বপ্রথম তারাই এই চিন্তার বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। ইমাম হোসাইন (আ.) এদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা এবং আল্লাহের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করাকে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে মনে করেন। তিনি হুকুমতের মূল দর্শন ''كلمة الله هي العليا''- 'আল্লাহর বাণীকে (বিধান) সমুন্নত ও উচ্চকিত করা' বলে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন। এটা স্পষ্ট যে, পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত দ্বীন ইসলামই হচ্ছে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা দানকারী।

দুই. শাসনক্ষমতার খোদায়ী বৈধতা (আল্লাহ্ প্রদত্ত বৈধ শাসন)

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর বক্তব্য এটাই প্রমাণ করে যে, সরকারের বৈধতা কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট হবে। শরিয়তের দৃষ্টিতে ঐ শাসনই বৈধ যেখানে ফকীহরা (ইমামদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হন। এ ক্ষেত্রে জনগণের রায় ও বাইআতের কোন প্রভাব এতে নেই, যদিও তা ক্ষমতায় আসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি তেমন নয় যেমনটি কিছু কিছু অজ্ঞ, পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত এবং স্যেকুলার শাসনের সমর্থকরা মনে করে। তারা এমনকি নিষ্পাপ ইমামদের উপস্থিতির যুগেও শাসনের ঐশী বৈধতা থাকার অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করে।

মদীনার গভর্নর যখন ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কাছ থেকে ইয়াযীদের জন্য বাইআত চেয়েছিল তখন ইমাম বলেন :

'হে শাসক (ওয়ালীদ ইবনে ওকবা)! আমরা হলাম নবুওয়াতের গৃহের সদস্য, রেসালাতের খনি, ঐ গৃহের অধিবাসী যেখানে ফেরেশতাদের আনাগোনা ছিল এবং আল্লাহর রহমত নাযিলের স্থান। আল্লাহ আমাদের (বংশের রাসূলের নবুওয়াত) দ্বারাই শুরু করেছেন এবং আমাদের (বংশের ইমাম মাহদীর শাসন) দ্বারাই শেষ করবেন। ইয়াযীদ মদ্যপায়ী, পাপাচারী, এমন সম্মানিত ব্যক্তিদের হত্যাকারী যাদের হত্যা নিষিদ্ধ, সে প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত হয়। তাই আমার মতো ব্যক্তি ইয়াযীদের মতো ব্যক্তির হাতে বাইআত করতে পারে না।'[২৮৮]

এ বাক্যের দ্বারা ইমাম হোসাইন (আ.) সমাজের ওপর নিজ শাসনের বৈধতার দলিল পেশ করেন এবং ইয়াযীদের শাসনকে অবৈধ ও খোদাবিরোধী বলে ইঙ্গিত করেন। সমাজের শাসক হওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ঐশী দলিল ইয়াযীদের নেই; বরং আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন ও হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে তার বাইআত বৈধ না হওয়ার দলিল আছে।

মুসলমানদের অধিকাংশই ইয়াযীদের হাতে বাইআত করা সত্ত্বেও ইমাম হোসাইন (আ.) ইয়াযীদের কাছে বাইআত না করা এবং তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা এটাই প্রমাণ করে যে, ধর্ম ও রাজনীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও শাসকের জন্য খোদায়ী বৈধতার প্রয়োজন- যা স্যেকুলার মতবাদকে বাতিল করে দেয়। যদি ইমাম হোসাইন (আ.) আন্দোলন না করতেন তাহলেও শুধু ইয়াযীদের বাইআত থেকে দূরে থাকাই এ বিষয়টি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল। অনেক বর্ণনাতেই ইমাম হোসাইন তাঁর ও অন্য ইমামদের নেতৃত্ব দানের অধিকার যে খোদাপ্রদত্ত অর্থাৎ তাঁরা যে ঐশীভাবে শাসনের বৈধতা লাভ করেছেন তার উল্লেখ করেছেন। তাই তিনি বলেন :

ان مجاری الامور و الاحکام علی یدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه

‘শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয় ও ধর্মীয় বিধি বিধান বাস্তায়নের দায়িত্ব আল্লাহওয়ালা আলেমদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে যারা তাঁর হালাল ও হারামের রক্ষক ও এ বিষয়ে বিশ্বস্ত তার অধিকারী।’

রেওয়ায়াতে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, জনগণের ওপর শাসন করার অধিকার শুধু হালাল- হারামের ওপর বিশেষজ্ঞ ও দ্বীনের তত্ত্বাবধায়ক ও আমানতদার আলেমগণের- যাঁদের মধ্যে নিষ্পাপ ইমামগণ শীর্ষস্থানীয়।[২৮৯]

যখন ইবনে যুবাইর ইমাম হোসাইন (আ.)- কে ইয়াযীদের হাতে বাইআত সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তখন ইমাম না- বোধক উত্তর দিয়ে বলেন :

انی لا ابایع له ابدا لان الامر انّا کان لی من بعدی اخی الحسن

যার মর্ম হলো এমন- আমি কখনই তার (ইয়াযীদের) হাতে বাইআত করব না। কেননা, আমার ভাই (ইমাম) হাসানের (শাহাদতের) পর খেলাফতের বৈধ অধিকারী হচ্ছি আমি।[২৯০]

তেমনিভাবে ইমাম বসরার জনগণের উদ্দেশে লিখিত চিঠিতে বলেন : 'আমরা হচ্ছি রাসূল (সা.)-এর বংশধর এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী। তাঁর (রাসূলের) প্রতিনিধিত্বের জন্য আমরা হচ্ছি সবার চেয়ে যোগ্য। অন্যরা আমাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে। আমরা ঐক্যের স্বার্থে তা মেনে নিয়েছি। এটা ঐ অবস্থায় ছিল যখন জানতাম যারা শাসনকর্তৃত্ব দখল করে নিয়েছে এ বিষয়ে আমরাই তাদের চেয়ে উত্তম ও যোগ্য।'[২৯১]

এছাড়াও কুফার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে তিনি লিখেছিলেন : 'আল্লাহর রাসূলের সাথে (আত্মীয়তা ও আধ্যাত্মিক) নৈকট্যের কারণে এ পদের জন্য আমিই সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখি।'[২৯২]

তিন. ইসলামী শাসকের শর্তসমূহ

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর দৃষ্টিতে শাসন- কর্তৃত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মীয় বিধি- বিধান ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা যা মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য দান করবে এবং তার বৈধতা কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হবে। তাই এটা স্পষ্ট যে, ঐ শাসককে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে:

১. খোদায়ী বিধি- বিধান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা : খলিফাদের সাথে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর বিরোধিতার এটি ছিল অন্যতম মূল কারণ। ইমাম এক বক্তব্যে দ্বিতীয় খলিফাকে লক্ষ্য করে বলেন:

صرت الحاكم عليهم بكتاب نزل فيهم لا تعرف معجمه ولا تدرى تاويله الاّ سماع الاذان

'তুমি ঐ কিতাবের দোহাই দিয়ে তাদের শাসক হয়েছ যা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)- এর পরিবারের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তুমি তাঁর বাণীসমূহ শুধু কানেই শুনেছ, কিন্তু তার প্রকৃত ও অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে অবহিত নও।'[২৯৩]

ইমাম হোসাইন (আ.) মিনায় উপস্থিত বিশিষ্ট ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের উদ্দেশে বলেন : ‘শাসনক্ষমতা সেই ধর্মীয় ব্যক্তিদের হাতে থাকবে যারা আল্লাহর হালাল ও হারাম বিধানের আমানতদার ও রক্ষক। ইমামতের যুগে আহলে বাইতের ইমামরাই হচ্ছেন এ পদের অধিকারী।’

২. কোরআন ও সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা : এ সম্পর্কে ইমাম হোসাইন (আ.) কুফার জনগণের উদ্দেশে লিখিত চিঠিতে উল্লেখ করেন :

فلعمری ما الامام الاّ العامل بالکتاب و الآخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس نفسه علی ذات الله

‘আমার সত্তার শপথ, উম্মাহর ইমাম ও নেতা কেবল আল্লাহর কিতাবের ওপর আমলকারী, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী, সত্যের প্রচারক ও আল্লাহর জন্য নিজের প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রক।’[২৯৪] এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, শাসকের শর্ত হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে আমল, ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা এবং নিজেকে আল্লাহর পথে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত ও উৎসর্গ করা।

৩. ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা : ইমাম হোসাইন (আ.)- এর দৃষ্টিতে ইসলামী শাসকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। যেমনিভাবে কুফাবাসীর উদ্দেশে লিখিত চিঠিতে উল্লেখ করেন : ‘والآخذ بالقسط’ অর্থাৎ ন্যায় ও সুবিচারকারী এবং আরো অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি এ বিষয়টিকে উমাইয়া শাসকদের অবৈধতার কারণ হিসেবে অভিহিত করেন।

তাই ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলন ও আশুরার সংস্কৃতির মূল শিক্ষা হচ্ছে, ধর্ম এবং রাজনীতির মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন গভীর ও দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে তা স্পষ্ট করা। তাঁর দৃষ্টিতে কোন সরকারের বৈধতা, শাসক হওয়ার শর্তসমূহ, শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা, কর্মসূচি সবকিছুই ইসলামী বিধিবিধান ও শিক্ষার ভিত্তিতে হতে হবে, আর তার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই জনগণের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য নিশ্চিত হবে।

ইবনে যিয়াদকে গুপ্তহত্যা না করা

২৭ নং প্রশ্ন : ইবনে যিয়াদকে হত্যা করার সুযোগ পেয়েও কেন হযরত মুসলিম তা থেকে বিরত হন?

উত্তর : মহান আল্লাহ ও নিষ্পাপ পবিত্র আহলে বাইত যুলুম- অত্যাচার এবং ধোঁকাবাজি দ্বারা শত্রুর ওপর জয়লাভ করাকে নিন্দা করেছেন।

যেমন হযরত আলী (আ.)- এর খেলাফতের সময় কোন এক যুদ্ধে শত্রুরা জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল, এক ব্যক্তি পরামর্শ দিল যে, জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হোক। হযরত আলী (আ.) এ ধরনের যুলুম থেকে বিরত থাকার জন্য বলেন : 'لا اطلب النصر با لجور' 'আমি অন্যায় পথে (যুলুমের সাহায্যে) বিজয়ী হতে চাই না।'[২৯৫]

হযরত মুসলিমও ইসলাম ও আহলে বাইত (আ.)- এর শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন। তাই যখন হানি ইবনে উরওয়া ও শারিক ইবনে আওয়ার অসুস্থ হন তখন কথা ছিল ইবনে যিয়াদ তাঁদেরকে দেখতে আসবে। শারিক হযরত মুসলিমকে বলেন : 'যখন সে আসবে তখন তাকে হত্যা করবে। অতঃপর তার প্রাসাদ দখল করবে!' কিন্তু হানি ইবনে উরওয়া এর বিরোধিতা করেন। ইবনে যিয়াদ এসে কিছুক্ষণ কথা বলার পর চলে যায়। তখন শারিক হযরত মুসলিমকে এই প্রশ্নটিই করেন। তিনি বলেন : ''দু'টি কারণে ইবনে যিয়াদকে হত্যা করিনি। প্রথমত, এ কাজে হানি ইবনে উরওয়ার অনুমতি না থাকা। কেননা, তিনি বলেছিলেন : 'আমি চাই না তার রক্ত আমার বাড়িতে ঝরবে।' দ্বিতীয়ত, রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'ان الایمان قید الفتک و لا یفتک المومن' 'ঈমান আকস্মিক হামলা ও গুপ্তহত্যার প্রতিবন্ধক এবং মুমিন গুপ্তহত্যা করে না।'' হানি ইবনে উরওয়া বলেন : 'হ্যাঁ, যদি তাকে হত্যা করতে তাহলে একজন ফাসেক, কাফের ও ধোঁকাবাজকে হত্যা করতে। কিন্তু আমি রাজি হইনি এবং পছন্দ করিনি যে, তার রক্ত আমার বাড়িতে ঝরুক।'[২৯৬]

গুপ্তহত্যা শরিয়তবিরোধী কাজ

২৮ নং প্রশ্ন : মুসলিম ইবনে আকিলের ঘটনার প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তির কি অধিকার আছে ইসলামী সমাজে কাউকে হত্যা করবে বা কাউকে হত্যার নির্দেশ দেবে? অথবা বিচারকের হুকুম ছাড়াই সরাসরি কাউকে হত্যা করবে?

উত্তর : ইসলাম এমন এক ধর্ম যা সকল মানুষের (মুসলমান, অমুসলমান, বিদেশি, ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী) জীবন ও সম্মান রক্ষা করাকে ইসলামী সরকারের অন্যতম দায়িত্ব বলে মনে করে। মানুষের জীবন রক্ষা করাকে ইসলাম ধর্মে এমনভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, একজন নিষ্পাপ মানুষের জীবন রক্ষা করাকে সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করার সমান বলে অভিহিত করেছে।[২৯৭]

তাই মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার হচ্ছে এক ঐশীদান। ইসলামী শরিয়তে বর্ণিত হয়েছে : ফাসেক, সীমাহীন পাপাচারী, ধর্মত্যাগী, নিরীহ মানুষের হত্যাকারী ও ইসলামী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ছাড়া কাউকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু কিছু কিছু যালেম- অত্যাচারী ও আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি খোদা প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করে নিজেকে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে; কিসাসের (হত্যার কারণে মৃত্যুদণ্ড) মতো শাস্তিকে নিজের জন্য ডেকে আনে। যদিও এ সকল বিষয় কেবল ইসলামী শাসনের অধীনে ন্যায়পরায়ণ বিচারকের দ্বারা শরিয়তের বিধান অনুযায়ী বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব। কিন্তু কাউকে গুপ্তহত্যা করা বৈধ কিনা- এ প্রশ্নের স্পষ্ট জবাবের জন্য 'গুপ্তহত্যা' শব্দটির পারিভাষিক অর্থ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য জানা প্রয়োজন। ডেভিড অরভিন শোয়ার্টজ তাঁর লিখিত 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও ইসলামী আইন' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'এ বিষয়টিকে সঠিকভাবে জানার জন্য পাশ্চাত্যের দেওয়া আইনি সংজ্ঞার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। পশ্চিমাদের এ বিষয়টিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে মোকাবিলা করার জন্য প্রথমেই উচিত গবেষণা করা যে, ইসলাম এ সম্পর্কে কী বলেছে অর্থাৎ শরিয়ত কীভাবে সন্ত্রাস ও সহিংসতাকে ব্যাখ্যা করেছে এবং কীভাবে তার জবাব দিয়েছে।[২৯৮]

১. পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস

পাশ্চাত্যের অভিধানগুলোতে সন্ত্রাস হচ্ছে এমন এক ত্রাস সৃষ্টিকারী সহিংস আচরণ যা একজন অথবা একদল ব্যক্তি কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ ও ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ কোন রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ত্রাস ও সহিংসতামূলক কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নেওয়াই হলো সন্ত্রাসবাদ।

পশ্চিমাদের সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় অনেক অস্পষ্টতা রয়েছে। প্রত্যেক দেশ তাদের নিজস্ব স্বার্থ অনুযায়ী সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করেছে, আর এ জন্যই এতে মতভেদ দেখা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যে সকল দল গোপনে তাদের অধিকার ও ভাগ্য নির্ধারণের জন্য যে সহিংসতামূলক পদক্ষেপ নেয় সেটা কি সন্ত্রাসের শামিল হবে?

ফিলিস্তিনবাসীরা- যাদের ভূমি যায়নবাদী ইসরাইল কর্তৃক জবর- দখল হয়েছে এবং তারা তাদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, এই অবস্থায় তারা যে ইসরাইলীদের মোকাবিলা করছে এতে কি তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করছে এবং তারা কি অত্যাচারী ইসরাইলের কাছে আত্মসমর্পণ করবে? এ ধরনের সহিংসতামূলক আচরণের উৎস সম্পর্কে অত্যাচারী ইসরাইল কিংবা অন্তত ঐ সকল সরকার যারা অন্যায়ভাবে ফিলিস্তিনী জনগণকে তাদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে তারা কী জানে?

২. ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস

ইসলামের দৃষ্টিতে এ শব্দের অর্থ হচ্ছে কাউকে অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে হত্যা করা। ইসলামী ফিকাহশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বলা যায় :

১. নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হারাম তা যে কোন দলের বা ধর্মের বা যে কোন স্থানেরই হোক না কেন। বর্তমান ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হামলাকে ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করেন। তিনি নির্বিচারে নিরীহ মানুষ হত্যা- হোক সে মুসলমান অথবা খ্রিস্টান বা অন্য কোন ধর্ম ও মতে বিশ্বাসী, যে কোন স্থানেই হোক অথবা যে কোন অস্ত্রের মাধ্যমেই হোক- তা অ্যাটম বোমা বা দূর পাল্লার

ক্ষেপণাস্ত্র, জীবাণু অস্ত্র বা রাসায়নিক অস্ত্র অথবা যাত্রীবাহী ও জঙ্গি বিমানের মাধ্যমে এবং যে কোন প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র বা ক্ষমতাবান ব্যক্তির (প্রভাবশালী ব্যক্তিদের) দ্বারাই সংঘটিত হোক, তা যে হারাম ও নিষিদ্ধ তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বলেন : এরূপ হত্যাকাণ্ড জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি, লেবাননের কানআ এবং সাবরা ও শাতিলা, ফিলিস্তিনের দাইর ইয়াসিন অথবা বসনিয়া ও কসোভা, ইরাক, নিউইয়র্ক বা ওয়াশিংটন- যেখানেই ঘটুক তাতে কোন পার্থক্য নেই (অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রেই তা অন্যায় ও নিন্দনীয়)। এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : 'الایمان قید الفتک' অথবা 'الاسلام قید الفتک'

ইসলাম গুপ্তহত্যাকে নিষিদ্ধ করেছে। যদি ধরে নিই যে, এ হাদীস সত্য, তবে এটা শুধু এ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। যদিও সর্বসাধারণভাবে বর্ণিত এ হাদীসটির বিধান অন্য হাদীসের দ্বারা- যা পরবর্তীকালে আসবে- সীমাবদ্ধ হবে।

২. যে সকল ব্যক্তি হত্যাযোগ্য অপরাধ করেছে এবং যাদের রক্তকে মূল্যহীন ঘোষণা করা হয়েছে সে সকল লোককে হত্যা করা ওয়াজিব। সম্ভবত তাদের অপরাধ মুসলমানদের ও ইসলামী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা (যেমন কাফের হার্বী বা যুদ্ধরত কাফের) অথবা ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা, যেমন রাসূল (সা.) ও ইমামদের গালিগালাজ ও কুৎসা রটনা করা বা তাঁদেরকে কষ্ট দেওয়া অথবা অত্যাচারী ও তাগুত সরকারকে সহযোগিতা করা- যদি তাদের হাতে অনেক মুসলমানের রক্ত ঝরে।

এটা ইতিহাসের স্পষ্ট উদাহরণ যে, রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান সৈন্যবাহিনী মক্কা শহরে প্রবেশের পূর্বেই সেনাপতিদের সকলকে ডেকে বললেন, 'আমি চাই কোন রক্ত ঝরানো ছাড়াই মক্কা জয় করতে, তাই যে সকল লোক বাধা সৃষ্টি করবে তাদের ব্যতীত অন্যান্য লোককে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু দশ জন বিশেষ অপরাধীকে যেখানেই পাবে, এমনকি যদি তারা কাবা ঘরের পর্দাও ধরে থাকে তবুও তাদের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করবে।'

ঐ দশ জন হচ্ছে আকরামা ইবনে আবু জাহল, হুব্বার ইবনে আসওয়াদ, আবদুল্লাহ ইবনে সাদ আবিহ সারাহ্, মুকাইশ ছাবাবে লেইছি, হুয়াইরেছ ইবনে নুফাইল, আবদুল্লাহ ইবনে

খাতল, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, ওয়াহশী ইবনে র্হাব (হযরত হামযার হত্যাকারী), আবদুল্লাহ ইবনে আল-যুবাইর এবং হারেস ইবনে তালাতালাহ এবং চার জন মহিলা। এর মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা এবং দু'জন গায়িকা যারা রাসূল (সা.)-কে তিরস্কার করে বিভিন্ন কুৎসিত গান গাইত; এই সকল ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের আপরাধের সাথে জড়িত ও চক্রান্তকারী ছিল। রাসূল (সা.) তাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি করেন।[২৯৯]

যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এ কাজের বাস্তবায়নের পদ্ধতি :

প্রথমত, মূলত এ নির্দেশটি লুক্কায়িত ও গোপনীয় কোন বিষয় নয়। যখন মুসলমানদের সর্বোচ্চ নেতা নির্ণয় করবেন যে, কোন ব্যক্তি বা দল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করছে বা ইসলামের নির্দিষ্ট কোন শাস্তি থেকে পলায়ন করছে বা ইসলামী শাসনের গণ্ডির মধ্যে নেই সে ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রকাশ্যে এ ধরনের নির্দেশ জারি করবেন। যেমনভাবে রাসূল (সা.) সেনাপতিদের মাধ্যমে সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন উল্লিখিত ব্যক্তিদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করবে।[৩০০] তাই যেমন মুসলমান সৈন্যবাহিনী জানত কোন্ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে, অনুরূপ কাফেররাও জানত কোন্ ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ জারি করা হয়েছে।[৩০১]

এ বিষয়টির অর্থ এই নয় যে, ইসলামী শাসন জনগণকে তাদের নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করে বরং প্রাথমিক নীতি হচ্ছে সমস্ত জনগণের জান, মাল, সম্মান ও অন্যান্য অধিকার রক্ষা করা ফরয- তা যে কোন দল, মাযহাব বা বিশ্বাসের লোক হোক না কেন, যদি না সে কোন বিশ্বাসঘাতকতামূলক ও মারাত্মক অপরাধ করে। এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট বিধান বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইমাম খোমেইনী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সালমান রুশদীর ব্যাপারে এ নির্দেশ জারি করেছিলেন এবং তিনি বলেন : 'বিশ্বের সকল আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমানকে জানাচ্ছি যে, 'স্যাটানিক ভার্সেস' বইয়ের- যা ইসলাম, কোরআন এবং রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে লেখা এবং প্রকাশ করা হয়েছে- লেখক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। বিশ্বের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমানদের প্রতি আমার আবেদন যেখানেই তাকে পাবেন সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করবেন যাতে আর কেউ ইসলামের অবমাননার সাহস না পায়। যদি কেউ এ পথে নিহত হন তিনি শহীদ হিসেবে গণ্য

হবেন। যদি কেউ তাকে হাতের কাছে পায়, কিন্তু তাকে হত্যা করার মতো শক্তি নেই, তাহলে জনগণের কাছে তাকে যেন পরিচয় করে দেন যাতে সে তার নিকৃষ্ট আমলের প্রতিদান পায়।’[৩০২]

যেমনভাবে বর্তমান রাহ্বার সহিংসতার বৈধতা ও অবৈধতার আলোচনায় স্পষ্টভাবে বলেন, ইসলামী শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের হত্যার নির্দেশ ইসলামে আছে। কিন্তু যখনই কোন ইসলামী শাসক এ ধরনের পদক্ষেপ নেবে প্রকাশ্যে জনগণের মাঝে তা ঘোষণা করবে যাতে কোন বিষয় লুক্কায়িত না থাকে (যাতে গোপন হত্যা বলে বিবেচিত না হয় এবং এধরনের অপরাধীরা সতর্ক হয়ে যায় ও এরূপ কর্মের দুঃসাহস না দেখায়)।

দ্বিতীয়ত, যে সকল ক্ষেত্রে শাস্তির জন্য বেত্রাঘাত অথবা আহত করার প্রয়োজন আছে সেসব ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হবে (তবে নবী ও ইমামদের গালিগালাজ ও অবমাননাকারীদের ক্ষেত্রে এরূপ অনুমোদনের প্রয়োজন নেই) :

ক. এ বিষয়টি অবশ্যই ইসলামের বিজ্ঞ ও যুগসচেতন নেতার (অর্থাৎ নবী, ইমামগণ এবং বর্তমানে গাইবাতের যুগে যোগ্য ফকীহ্ ও মুজতাহিদগণ) অনুমতিক্রমে হতে হবে।[৩০৩]

খ. যখন ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত ও এর মূল ক্ষমতা ন্যায়পরায়ণ ও বিজ্ঞ ফকীহর হাতে ন্যস্ত থাকবে তখন সরকারই এ ব্যবস্থা হাতে নেবে। কিন্তু যখন ইসলামী শাসন না থাকবে এবং রাষ্ট্র ওয়ালিয়ে ফকীহ্ দ্বারা পরিচালিত না হবে সে ক্ষেত্রে যে কোন একজন বিশিষ্ট ফকীহ মুজতাহিদের নির্দেশে তা হতে হবে।

গ. এ ধরনের অনুমতি নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে কিছুসংখ্যক ব্যক্তির ওপর অর্পণ করা যেতে পারে। যেমন ইরানী বিপ্লবের সময় সাবেক তাগুত সরকারকে উৎখাত করার আন্দোলনের অনুমতি হযরত ইমাম খোমেইনী একদল আলেমের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন যাঁরা তাঁর অনুপস্থিতিতে এ কাজটি করেছেন। তিনি তাঁর বিরল প্রতিভা ও গভীর ফিকাহর জ্ঞানের ভিত্তিতে ধর্মীয় ব্যুৎপত্তির অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে উপযুক্তদের মনোনীত করেছিলেন।

তৃতীয়ত, রাসূল (সা.), ইমামগণ এবং হযরত ফাতেমা (আ.)- কে গালিগালাজ করার শাস্তির বিধান আলাদাভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৩০৪]

মূলকথা হচ্ছে, ইসলাম নিরপরাধ মানুষ হত্যার বিরোধী, তা যে ভাবেই হোক না কেন- সন্ত্রাস বা অন্য কোন নামে অথবা রাজনৈতিক ও মাযহাবগত উদ্দেশ্যে এবং খ্রিস্টান বা ইহুদি বা মুসলমান যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন এবং তা বিশ্বের যে কোন স্থানেই হোক না কেন; বরং এ কাজ হচ্ছে অপরাধ; যে এ কাজ করবে তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।

ইসলামী বিপ্লবের পূর্বে যে সকল হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তা ছিল দুই ধরনের:

ক. যে সকল হত্যাকাণ্ড এমন একদল বিপ্লবী ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হয়েছে যারা ধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গী ও শরিয়তের বিধি- বিধানের প্রতি অনুগত ছিল এবং কোন মারজায়ে তাকলীদ বা উপযুক্ত সার্বিক যোগ্যতার অধিকারী মুজতাহিদের সাথে তাদের সম্পর্ক (অনুমোদন) ছিল।[৩০৫] এ ধরনের হত্যার পেছনে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের মুজতাহিদের ফতোয়া ছিল। কারণ, চরম অনাচারী ও অপরাধী হিসেবে কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে হত্যা করা ওয়াজিব ছিল। সুতরাং শরিয়তের বিধান এরূপ হত্যাকে সমর্থন করেছে। কেননা, সকল শর্তের অধিকারী মুজতাহিদের ফতোয়া ইসলামের বিধান অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য দলিল।

খ. যে সকল হত্যাকাণ্ড রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ঘটেছে যার পেছনে শরিয়তের কোন বৈধতা বা মুজতাহিদের কোন ফতোয়া ছিল না। যেমন মুজাহিদিনে খাল্ক ও কম্যুনিস্টদের দ্বারা যে সকল হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। তাদের ঐ সকল কাজের পেছনে শরীয়তের কোন বৈধতা ছিল না। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে এটা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়।

আশুরা ও ইরানের ইসলামী বিপ্লব

২৯ নং প্রশ্ন : কোন দলিলের ভিত্তিতে দাবি করেন যে, ইরানের ইসলামী বিপ্লব ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলন ও শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত? এ বিপ্লবের সফলতার পেছনে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলনের কি প্রভাব ছিল?

উত্তর : ইরানে ইসলামী বিপ্লবের সফলতার কারণ নিয়ে অনেক চিন্তাবিদ ও গবেষকই মতামত দিয়েছেন। তাঁদের মতে এ বিপ্লবের সফলতার মূল কারণ হচ্ছে[৩০৬] শিয়া মাযহাব।

ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ দার্শনিক এবং নব- আধুনিকতাবাদের (POST MODERNISM) অন্যতম প্রবক্তা মিশেল ফুকো ইরানে ইসলামী বিপ্লবের কারণসমূহ পর্যালোচনা করতে গিয়ে এ বিপ্লবকে রাজনৈতিক আধ্যাত্মিক প্রবণতা দ্বারা উৎসারিত বলেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে এ বিপ্লবের মাধ্যমে ইরানীরা তাদের অভ্যন্তরে এক ধরনের পরিবর্তনের চেষ্টায় ছিল। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি,সমাজ,রাজনীতি এবং মানুষের চিন্তাতে এক ধরনের মৌলিক পরিবর্তন আনা। তারা এ সংস্কারের পদ্ধতি হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করেছে। ইসলাম তাদের জন্য এক দিকে ব্যক্তি-সমস্যার সমাধান ছিল অন্য দিকে সামাজিক ক্রটি ও অসুস্থতার প্রতিকারক।[৩০৭]

আসেফ হোসেন তাঁর 'ইসলামী ইরান : বিপ্লব ও প্রতি বিপ্লব' গ্রন্থে লিখেছেন, এ বিপ্লবকে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এর আদর্শগত উপাদান, ইসলামবিরোধী পক্ষসমূহের ভূমিকা, বৈধতার দিক, শিক্ষাসমূহ, বিশেষত নেতৃত্বের বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।[৩০৮]

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. হামিদ আলগার তাঁর ইসলামী বিপ্লবের ভিত্তিসমূহ বইয়ে তিনটি উপাদানকে (শিয়া মাযহাব, ইমাম খোমেইনীর নেতৃত্ব এবং ইসলামকে একটি আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন) এ বিপ্লবের ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।[৩০৯]

অন্যদিকে ইসলামী বিপ্লব প্রতিষ্ঠা ও তা বাস্তব রূপ লাভের প্রক্রিয়ায় যে সকল রাজনৈতিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, আন্দোলনের নেতারা তাঁদের বক্তব্য, বিপ্লবী ঘোষণা এবং স্লোগানে যা বলেছেন সেগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, এ বিপ্লবের মূল উপাদান হচ্ছে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলন ও শিক্ষা।[৩১০]

আশুরার শিক্ষাসমূহ নিম্নরূপ :

১. শাহাদাতের সংস্কৃতি।

২. বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করার শিক্ষা।

৩. তাগুতের সাথে সংঘাত ও তাগুতকে নিশ্চিহ্ন করা।

৪. মহান আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জন এবং মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করা।

৫. যুলুম ও অত্যাচারের প্রতিরোধ এবং সরকারের কর্মকাণ্ডকে সার্বক্ষণিক নজরে রাখা ও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের শিক্ষা।

এই শিক্ষাসমূহ ইরানী ইসলামী বিপ্লব প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং বিপ্লবকে রক্ষা করাও এই শিক্ষাসমূহের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এখন বিস্তারিত তথ্যের জন্য আলোচনাকে কয়েক ভাগে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব।

এক : ইসলামী বিপ্লবের উৎপত্তিতে আশুরা সংস্কৃতির প্রভাব

১. বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা ও উদ্দেশ্যের ওপর প্রভাব

ইসলামী বিপ্লব প্রতিষ্ঠার পেছনে ইরানের জনগণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল যুলুম, অত্যাচার, স্বৈরতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের মূলোৎপাটন এবং ঐশী ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা ও ইসলামী বিধি বিধান প্রতিষ্ঠা করা এবং বহিঃশক্তির ওপর- নির্ভরশীল হওয়া থেকে দূরে থাকা ও তাদেরকে বিতারিত করা- যা ইমাম হোসাইনের আন্দোলনেরও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। তাই নতিনি বলে,

انّا خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی

'আমি আমার নানার উম্মতকে সংশোধনের জন্য বের হয়েছি। আমি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে চাই এবং আমি আমার নানা ও পিতা আলী ইবনে আবি তালিবের পথে চলতে চাই।'

ইয়াযীদ যেমন ফাসেক, অত্যাচারী ও পাপাচারী ছিল, পাহলভী বংশও ঠিক তেমনি ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রেযা শাহ ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলার লক্ষ্যে ফারসি সালকে হিজরি থেকে পাহলভী সালে রূপান্তরিত করেছিল। ইমাম খোমেইনী (র.) ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে আশুরার প্রভাব সম্পর্কে বলেন, 'ইমাম হোসাইন (আ.) আমাদের শিখিয়েছেন যে, অন্যায়, অত্যাচার ও যালেম শাসকদের বিরুদ্ধে আমাদের কী করতে হবে।' কিছু কিছু আলেম বিশ্বাস করেন যে, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা

করা। ইমাম খোমেইনী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন : ‘ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জীবনের লক্ষ্য এবং ইমাম মাহদী (আ.) এবং সকল নবীর জীবনের লক্ষ্য একই ছিল। হযরত
আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষনবী রাসূল (সা.) পর্যন্ত সকলেরই মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারী শাসকের মোকাবিলা করা এবং ন্যায়ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা।’[৩১১]

২. বিপ্লবের নেতার ওপর ইমাম হোসাইনের আন্দোলনের প্রভাব

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর নেতৃত্ব এবং তাঁর সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ইমাম খোমেইনীর মতো নেতা ও বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছে। ইরানী জনগণ ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সাহসিকতা, বীরত্ব, দৃঢ়তা, আপোসহীনতা এবং বিপ্লবী মনোভাবকে ইমাম খোমেইনী (রহ)- এর ব্যক্তিত্বে দেখতে পেয়েছিলেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের একজন শাসকের যে সকল বৈশিষ্ট্য ইমাম হোসাইন (আ.) বর্ণনা করেছিলেন তার সবই তাঁর মধ্যে তারা পেয়েছিল। বিপ্লবীদের স্লোগান- ‘খোমেইনী, খোমেইনী, তুমি হোসাইনের উত্তরাধিকারী’- এ কথাই প্রমাণ করে।

৩. সংগ্রামের পদ্ধতির ওপর আশুরার আন্দোলনের প্রভাব

বস্তুবাদী চিন্তাধারার মতে, খালি হাতে অল্পসংখ্যক লোকের জন্য কখনই অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু ইরানী জনগণ ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলনে উজ্জীবিত হয়ে ইমাম হোসাইন (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের আত্মত্যাগের ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। যখন ইরানী যুবকরা ‘আল্লাহু আকবার’ স্লোগান দিয়ে ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রসজ্জিত অত্যাচারী শাহ বাহিনীর মোকাবিলা করছিল তখন ইমাম খোমেইনী বলেন : ‘অল্প সংখ্যক লোককে কিভাবে স্বৈরাচারী শাসনের মোকাবিলা করতে হয় তা ইমাম হোসাইন (আ.) এ জাতিকে শিখিয়েছেন।’[৩১২]

৪. শোক পালনের স্থান ও দিনসমূহের প্রভাব

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোক পালনের দিন ও তাঁর জন্য শোকানুষ্ঠান পালনের স্থানসমূহ বিশেষ করে মসজিদ, ইমামবাড়ি ও তাঁবুসমূহ বিপ্লবের কার্যক্রম পরিচালনা এবং জনগণকে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী পাহলভী শাসন সম্পর্কে অবহিত করার সর্বোত্তম কেন্দ্র ও মাধ্যম ছিল।

তাদেরকে বিভিন্ন বিক্ষোভ মিছিলের জন্য একত্র করা ও ইমাম খোমেনীর বিপ্লবী বাণী তাদের কাছে পৌছানোর জন্য এ দিনগুলোকে বেছে নেয়া হত এবং এ দিনগুলোর স্মরণের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হত। বিশেষ করে মুহররম ও সফর এই দুই মাস বিপ্লব শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল বিশেষ করে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর স্মরণে তাসুয়া (নয় মুহররম) ও আশুরা (দশ মুহররম) ও দিন আয়োজিত সমাবেশগুলো অত্যাচারী শাহানশাহী রাজবংশের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সে সময় সাভাক (ইরানের নৃশংস গোয়েন্দা) বাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা তাদের পর্যালোচনায় বলেছিল, 'যদি আমরা এই মুহররম ও সফর মাসকে অতিক্রম করতে পারি (বিপ্লবীদের ঠেকিয়ে রাখতে পারি) তাহলে পাহলভী বংশ টিকে যাবে।' কিন্তু আমরা সকলেই দেখেছি যে, ১৩৯৯ হিজরি সালে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের চল্লিশ দিন পালনের পর ২৫০০ বছরের শাহানশাহী রাজবংশ এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে বিলুপ্ত হয়।[৩১৩]

দুই. ইরানী ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ে আশুরা সংস্কৃতির প্রভাব

এ বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এর মূল ভিত্তি রচিত হয়েছিল ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোক পালনের সময় এবং তা ছিল আশুরা আন্দোলনেরই শিক্ষা।

১. ১৫ই খোরদাদের আন্দোলনটিও- যেটাকে বিপ্লবের সূচনা মনে করা হয়- আশুরার বিকাল বেলায় (১৩ই খোরদাদ, ১৩৪২ ফারসি সাল) ইমাম খোমেইনীর দৃঢ় কণ্ঠের বক্তব্যের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল। তিনি ১৫ই খোরদাদের আন্দোলন সম্পর্কে বলেছেন : 'এ মহান জাতি আশুরা আন্দোলনের শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে ১৫ই খোরদাদ এক গণ- বিস্ফোরণমুখী আন্দোলন করেছে। যদি আশুরার উদ্দীপনা ও বিপ্লবী মনোভাব জনগণের মধ্যে না থাকত তাহলে এ ধরনের আন্দোলন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া সফল করা সম্ভব হতো কি না নিশ্চিত করে বলা যায় না।'[৩১৪]

২. বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ১৭ই শাহরিভার (ফারসি মাস)- যা আশুরার শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছে। ১৭ই শাহরিভার আশুরার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। শুহাদা চত্বর

কারবালার প্রান্তরে এবং আমাদের শহীদরা কারবালার শহীদে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এ জাতির বিরোধিতাকারী ও তাদের সমর্থকরা ইয়াযীদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।[৩১৫]

৩. ১৩৫৭ সালের ২১শে বাহ্মান (১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯) ইমাম খোমেইনীর ঐতিহাসিক ঘোষণা সামরিক বাহিনীর ভিত্তিকে ভেঙে দিয়েছিল, যাদের পরিকল্পনা ছিল বিপ্লবের মূল নেতাদেরকে গ্রেপ্তার করা এবং বিপ্লবকে চিরদিনের জন্য মুছে ফেলা; বাস্তবে যা আশুরার কালজয়ী বিপ্লবের বিজয় হিসেবে অভিহিত হয়েছে।

জনগণ বর্তমান যুগের হোসাইনের নির্দেশে রাস্তায় নেমেছিল ও শাহ্ বাহিনীর সকল চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। এ সম্পর্কে ইমাম খোমেইনী (রহ) বলেন : 'যদি ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলন না থাকত তাহলে আজকে আমরা বিজয় লাভ করতে পারতাম না। এক কথায় আমাদের বিপ্লব বিজয়ের মূল কারণ হচ্ছে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর (আজাদারি) শোক অনুষ্ঠান পালন এবং এ অনুষ্ঠানসমূহই ইসলামকে প্রচার করেছে ও টিকিয়ে রেখেছে।[৩১৬]

তিন. ইসলামী বিপ্লব রক্ষায় আশুরা শিক্ষার প্রভাব

আশুরার শিক্ষা ও সংস্কৃতি শুধু বিপ্লব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রই প্রস্তুত করেনি; বরং বিভিন্ন পর্যায়ে বিপ্লবকে রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ইসলামী বিপ্লব যে আদর্শের ওপর প্রতির্ষ্ঠিত হয়েছে যদি তা রক্ষা করতে চায় তাহলে সেটাকে কারবালার শিক্ষা ও আদর্শের তথা আত্মত্যাগী মনোভাব, স্বাধীনতার চেতনা, আত্মসম্মানবোধ, যুলুম ও অত্যাচারের প্রতিরোধ, ইসলামী বিধি- বিধান লঙ্ঘনের বিরোধিতা ইত্যাদির ওপর দৃঢ় থাকতে হবে।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে, যেমন পররাষ্ট্র নীতি, অভ্যন্তরীণ ও স্বরাষ্ট্র নীতি, অর্থনীতি, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যেন ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট প্রভাব অনুভূত হয়।

যদি ইসলামী বিপ্লব শত্রুদের সকল চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিয়ে সফলতায় পৌঁছে থাকে, আট বছরের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ইসরাইল, ব্রিটেনসহ সকল পরাশক্তি ও বিশ্বের শক্তিধর দেশসমূহের সরাসরি সাহায্যপ্রাপ্ত সাদ্দামকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়ে থাকে, ইসলামের শত্রুদের হুমকিকে ভ্রুকুটি দেখিয়ে বিপ্লবের অস্তিত্বকে দৃঢ়তর করে থাকে, সাম্রাজ্যবাদীদের অপপ্রচারের মোকাবেলায় নিজেদের শক্তিশালী অবস্থানকে তুলে ধরে থাকে, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, সামরিক অভ্যুত্থান কোন কিছুই বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ফাটল ধরাতে ব্যর্থ হয়ে থাকে, এসবের পেছনে একটিই কারণ, আর তা হলো আশুরার শিক্ষা এ জাতির মধ্যে পুরোদমে জাগ্রত ছিল।[৩১৭] তাই এ পাহাড় টলায়মানকারী ষড়যন্ত্রগুলো এ জাতির অগ্রযাত্রায় বিন্দুমাত্র বিঘড়ব ঘটাতে পারেনি।

এ সম্পর্কে ইমাম খোমেইনী বলেন : 'মুহররমকে জীবিত রাখ। কেননা, আমরা যা কিছু পেয়েছি এই মুহররম থেকেই পেয়েছি। যদি আমরা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শাহাদাতের গভীর তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই আজও সমগ্র বিশ্বে তার প্রভাব রয়েছে। যদি এ সকল আজাদারি, শোক ও মাতম অনুষ্ঠান, ওয়াজ- মাহফিল না থাকত আমরা জয়লাভ করতে পারতাম না। সকলেই ইমাম হোসাইন (আ.)- এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে আন্দোলন করেছিল। ইরান- ইরাক যুদ্ধের সময় ইরানী যোদ্ধাদের (আত্মোৎসর্গী ভূমিকা, চেতনামূলক বক্তব্যমালা, শাহাদাতপূর্ব অন্তিম বাণী, নামায, কোরআন পাঠ, দোয়া ও নফল ইবাদতের) যে চিত্রগুলো তখন ধারণ করা হয়েছে সেগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে, তারা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আদর্শে কীভাবে উদ্বুদ্ধ ছিল ও তাঁর ভালোবাসায় যুদ্ধ ক্ষেত্রকে উষ্ণ রেখেছিল।[৩১৮]

তিনি অন্যত্র বলেন : 'ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আত্মত্যাগ ইসলামকে জীবিত রেখেছে... জেনে রাখ, যদি তোমরা বিপ্লবকে রক্ষা করতে চাও তাহলে ইমাম হোসাইনের আন্দোলনকে রক্ষা কর।[৩১৯]

চতুর্থ অধ্যায়

শোকানুষ্ঠানের দর্শন

৩০ নং প্রশ্ন : শোকানুষ্ঠানের দর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করা যুক্তিসঙ্গত কি?

উত্তর : প্রকৃতপক্ষে বাহির থেকে কোন বিষয়ের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা বর্তমান সময়ের মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নতুন এ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে যদি কোন ব্যক্তি বাহির থেকে শোকানুষ্ঠানের বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করে ও একে বিশ্লেষণ করে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত এর সপক্ষে তার বুদ্ধিবৃত্তির কাছে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যা না পায় অথবা অন্তত এটি তার বুদ্ধিবৃত্তির সাথে সাংঘর্ষিক নয় তা অনুধাবন করে ততক্ষণ শোক পালনের বিষয়টি গ্রহণ এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না।

বিষয়সমূহের প্রতি এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই ভালো। কেননা, তা ইসলামী ও শিয়া সংস্কৃতি গঠনকারী শিক্ষার উপাদানসমূহের ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞানের ভিত্তিসমূহকে শক্তিশালী করে। আর এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, এ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উপস্থাপিত প্রমাণসমূহ মানুষের ঈমানকেও আরো দৃঢ় ও উন্নত করবে। কেননা, ঈমান জ্ঞান ও জ্ঞানের অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এ কারণেই যদি শোক পালন করার বিষয়ের গ্রহণযোগ্য বর্ণনা ও যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে এ সম্পর্কে যুবক ও নতুন প্রজন্মের বিশ্বাসের ভিত্তি শক্তিশালী হবে।

আহলে বাইত (আ.)- এর জন্য শোকানুষ্ঠান পালনের দর্শন ও উপকারিতা

৩১ নং প্রশ্ন : আহলে বাইত (আ.)- এর জন্য শোকানুষ্ঠান পালনের দর্শন কী ও এর কী উপকারিতা রয়েছে?

উত্তর : শোক পালন করার দর্শন নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে খুঁজে পাওয়া সম্ভব :

ক: ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের দৃষ্টিতে শোক প্রকাশ . কোরআন ও রেওয়ায়াত রাসূল (সা.)- এর পরিবারের প্রতি ভালোবাসাকে আবশ্যক করেছে।[৩২০] এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের কিছু প্রয়োজনীয় শর্ত রয়েছে। নিষ্ঠার সাথে ভালোবাসাকারী ব্যক্তি তিনিই হবেন যিনি

বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার শর্ত যথাযথ পূরণ করেন। বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, তাদের সুখ ও দুঃখের সময় সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করা।[৩২১] এ কারণেই হাদীসে আহলে বাইতের সুখে ও আনন্দে আনন্দ অনুষ্ঠান পালন এবং দুঃখের সময় সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশের ওপর অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

হযরত আলী (আ.)- এর নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে :

يفرحون لفرحنا و يحزنون لحزننا

‘(আমাদের শিয়ারা) আমাদের সুখে সুখী ও আমাদের দুঃখে দুঃখী হয়।’[৩২২]

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন :

شيعتنا جزء منا خلقوا من فضل طينتنا يس و ؤهم ما يس ؤنا و يس رّهم ما يس رّنا

‘আমাদের শিয়ারা আমাদেরই অংশ, আমাদের মাটির অতিরিক্ত অংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে; যা আমাদেরকে ব্যথিত ও আনন্দিত করে, তা তাদেরকেও ব্যথিত ও আনন্দিত করে।’[৩২৩]

এছাড়াও, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিগত ও ধর্মীয় দায়িত্ব যে, আহলে বাইতের জন্য শোক প্রকাশের দিনগুলোতে অশ্রু বিসর্জন ও আহাজারির মাধ্যমে নিজেদের শোক ও দুঃখকে প্রকাশ করা এবং দুঃখিত ও ব্যথিত ব্যক্তির মতো কম খাওয়া ও কম পান করা।[৩২৪]

পোশাকের দিক থেকে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে যে সকল পোশাক রং এবং পরিধানের ধরনের দিক থেকে শোক ও দুঃখের প্রকাশ ঘটায় সেগুলো পরিধান করাই বাঞ্ছনীয়।

খ: মনুষ্যত্ব ও মানবতাবোধ তৈরির দৃষ্টিতে শোক প্রকাশ . যেহেতু শিয়া সংস্কৃতিতে শোক প্রকাশ অবশ্যই জ্ঞান ও পরিচিতির ভিত্তিতে হওয়া অপরিহার্য, সেহেতু শোকানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো সম্মানিত ইমামদের সাথে একাত্মতা ও সমবেদনা প্রকাশ করা, তাঁদের মর্যাদা, গুণ এবং আদর্শের স্মরণ করা। প্রকৃতপক্ষে এ কাজটি মানুষকে তাঁদের নিকট থেকে আদর্শ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

যে ব্যক্তি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সহকারে শোকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি ও আবেগ- উদ্দীপনা এবং জ্ঞান ও হৃদয়ের অনুভূতির মধ্যে সমন্বয় ঘটে। এর ফলে তার ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়। আর যখন সে শোকের অনুষ্ঠান থেকে বের হয়ে আসে তখন একজন

কর্মতৎপর অগ্রগামী প্রেমিকে পরিণত হয়, যে নিজের মধ্যে প্রেমাস্পদের পূর্ণতার গুণাবলি সৃষ্টির জন্য সংকল্পবদ্ধ।

গ: সমাজ গঠনের দৃষ্টিতে শোক প্রকাশ . যেহেতু শোকানুষ্ঠান পালন প্রকৃত মানুষ গড়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে সেহেতু এর ফলে মানুষের অন্তরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয় যার প্রভাব সমাজে পড়ে এবং মানুষ সচেষ্ট হয় আহলে বাইতের আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে।

অন্য ভাষায়, আহলে বাইতের প্রতি শোক প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে একটি মাধ্যম যা আমাদেরকে তাঁদের আদর্শ রক্ষা ও বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করে। এ কারণেই বলা যায় যে, শোক প্রকাশের একটি দর্শন হলো ইসলামের আদর্শ অনুসারে সমাজ গঠন করা।

ঘ: শিয়া সংস্কৃতি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্থানান্তর . কেউ এ চরম সত্যটিকে অস্বীকার করতে পারবে না যে, নতুন প্রজন্ম শিশুকাল থেকেই শোক প্রকাশের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আহলে বাইতের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে শোকানুষ্ঠান পালন ইমামদের তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক শিক্ষা ও আদর্শকে পরবর্তী প্রজন্মের নিকট স্থানান্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। শোকানুষ্ঠান পালন, এর ধরন ও বিষয়বস্তুর কারণে এটি আহলে বাইতের বাণী এবং কর্মের সাথে পরিচিত হওয়া এবং নতুন প্রজন্মকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত করা ও গড়ে তোলার সবচেয়ে উত্তম পথ।

৩২ নং প্রশ্ন : ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য শোক প্রকাশের দর্শন কী?

উত্তর : ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোকানুষ্ঠানে মানুষ ও সমাজ গড়া এবং পরবর্তী প্রজন্মের নিকট আশুরা সংস্কৃতির উপাদানগুলো পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি শক্তিশালীভাবে বিদ্যমান। কেননা, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলন ও প্রশিক্ষণমূলক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক শিক্ষা মানুষ এবং সমাজের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে মৌলিক অবদান রেখেছে। কারবালার ঘটনার মূল উপাদান আশুরা ও শিয়া সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে যা শোকানুষ্ঠানের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের নিকট স্থানান্তরিত হয়।

আশুরার ঘটনা বর্ণনা ও এ সম্পর্কিত আলোচনা ও স্লোগানগুলোর মধ্যে মানুষ ও সমাজ এবং বিপ্লবী সংস্কৃতি তৈরির মূল উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইবাদত, ত্যাগ, বীরত্ব, আল্লাহর ওপর নির্ভরতা, ধৈর্য, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, ইয়াযীদী শাসনের অধীনে ইসলামের ধ্বংস, ইয়াযীদীদের মতো ব্যক্তির হাতে বাইআত গ্রহণ নিষিদ্ধ, অপমানের চেয়ে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ, পরীক্ষার ময়দানে সত্যপথ অবলম্বনকারীদের স্বল্পতা, অবৈধ ও বাতিল শাসকের সময়ে শাহাদাত কামনার প্রয়োজনীয়তা, শাহাদাত মানুষের জন্য সৌন্দর্য বলে গণ্য হওয়া, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দায়িত্ব, সত্য ও সঠিক ইমামের বৈশিষ্ট্য, আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর সন্তুষ্ট থাকা, সত্য সংগ্রামে শাহাদাতকামীদের সহযোগিতা করা, ঈমানদার, জ্ঞানী ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের জন্য অপমান সহ্য করা নিষিদ্ধ হওয়া, মৃত্যুকে চিরস্থায়ী বেহেশতে প্রবেশের সাঁকো হিসেবে গণ্য করা, সত্য প্রতিষ্ঠা ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সবসময় সকল মানুষের কাছে সহযোগিতা কামনা করা এবং এ ক্ষেত্রে স্বাধীন ও সাহসী হওয়া।[৩২৫]

হোসাইনের আচরণ দুনিয়াকে স্বাধীনতার শিক্ষা দিয়েছে

হোসাইনের চিন্তা- চেতনা মানুষের অন্তরে সাহসের বীজ বপণ করেছে।

যদি তুমি পৃথিবীর কোন ধর্মে বিশ্বাসী না হও, কমপক্ষে স্বাধীনচেতা মানুষ হও

এটি হোসাইন এর বিস্ময়কর বক্তব্য।

অপমানের জীবন থেকে সম্মানের মৃত্যু উত্তম

এটি হোসাইন এর কণ্ঠ থেকে উত্থিত সুমিষ্ট সংগীত।

এ ছাড়া নিচের বিষয়গুলো ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোক প্রকাশের দর্শনের অন্তর্ভুক্ত :

১. সকল যুগের অন্যায়- অত্যাচারীদের প্রতি এক ধরনের প্রতিবাদ[৩২৬] ও বিশ্বের মযলুমদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা।

২. মানুষের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠার অনুভূতিকে প্রবল ও অত্যাচারীদের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করার প্রবণতাকে শক্তিশালী করা।

৩. মুসলিম সমাজকে সত্যের প্রতিরক্ষায় উদ্বুদ্ধ ও বিজয়ী করার জন্য প্রস্তুত করা।

রেওয়ায়াতে শোক প্রকাশ [৩২৭]

৩৩ নং প্রশ্ন : আহলে বাইত (আ.)- এর জন্য শোকানুষ্ঠান পালন করার ক্ষেত্রে কোন রেওয়ায়াত রয়েছে কি?

উত্তর : এ সম্পর্কে অনেক রেওয়ায়াত রয়েছে। আহলে বাইতের জন্য শোক প্রকাশ করার বিষয়ে তিনটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করাকে যথেষ্ট বলে মনে করছি।

১. ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন :

رحم الله شيعتنا، شيعتنا والله هم الم ؤمنون فقد والله شركونا فى المصيبة بطول الحزن و الحسرة

‘আল্লাহ আমাদের শিয়া ও অনুসারীদেরকে রহমত ও দয়া করুন। আল্লাহর শপথ, আমাদের অনুসারীরাই হলো ঈমানদার যারা তাদের দীর্ঘ দুঃখণ্ডশোক প্রকাশ ও অনুশোচনা দ্বারা আমাদের ওপর আপতিত মুসিবতে অংশীদার হয়।’[৩২৮]

২. ইমাম রেযা (আ.) বলেন :

من تذكر مصابنا و بكى لما ارتكب مناكان معنا فى درجتنا يوم القيامه ومن ذكر بمصابنا فبكى وابكى لم تبك عينه يوم تبكى العيون ومن جلس مجلسا يحيى فيه امرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب

‘যে আমাদের মুসিবতকে স্মরণ করে ও আমাদের ওপর যে যুলুম ও অত্যাচার হয়েছে তার জন্য ক্রন্দন করে কিয়ামতের দিন সে আমাদের সাথে থাকবে; আমাদের যে সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে তা লাভ করবে। যে ব্যক্তি আমাদের মুসিবতসমূহকে বর্ণনা করবে অতঃপর নিজে ক্রন্দন করবে এবং অন্যকে কাঁদাবে, কিয়ামতের দিনে তার (ইমামদের শোকে ক্রন্দনকারী) চোখ ব্যতীত সকল চোখ ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকবে। যে আমাদের নির্দেশের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে, তার অন্তর সেদিন জীবিত থাকবে যেদিন সকল অন্তর মরে যাবে।’[৩২৯]

৩. ইমাম জাফর সাদিক (আ.) ফুদাইলকে বলেছেন :

تجلسون و تَدثون؟ قال: نعم جعلت فدا ك، قال: ان تلك المجالس احبها فاحيوا امرنا يا فضيل، فرحم الله من احيی امرنا يا فضيل من ذکرنا اوذکرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفرالله له ذنوبه لو کانت اکثر من زبدالبحر

'তোমরা কি (আমাদের কথা স্মরণ করে শোকানুষ্ঠান পালন করার উদ্দেশ্যে) একসঙ্গে বস এবং (আমাদের ওপর যা বিপদ-মুসিবত আপতিত হয়েছে তা নিয়ে) আলোচনা কর? ফুদাইল বললেন : 'জী, অবশ্যই, আপনার জন্য আমি উৎসর্গিত!' ইমাম (আ.) বললেন : 'এ ধরনের শোকানুষ্ঠানকে আমরা পছন্দ করি। অতঃপর হে ফুদাইল! আমাদের নির্দেশকে বাস্তবায়ন কর। যারা আমাদের নির্দেশের বাস্তবায়ন করে তারা আল্লাহর দয়া ও রহমতের অন্তর্ভুক্ত হয়। হে ফুদাইল! যে কেউ আমাদেরকে স্মরণ করবে ও যার নিকট আমাদের স্মরণ করানো হবে এবং তাতে কারো চোখ থেকে মাছির পাখার সমপরিমাণেও অশ্রু ঝরবে, আল্লাহ তার সকল গুনাহকে ক্ষমা করে দেবেন, যদিও তার গুনাহের পরিমাণ সাগরের ফেনার থেকেও অধিক হয়।'[৩৩০]

শোক প্রকাশের ইতিহাস

৩৪ নং প্রশ্ন : ইমাম (আ.)- দের জীবদ্দশায় ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য শোক পালনের কোন নজির আছে কি?

উত্তর : ইমামদের জীবদ্দশায় শোক পালনের নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে যার কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনা তুলে ধরা হলো :

ঐতিহাসিক ইয়াকুবি তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোকে উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামার অঝরে ক্রন্দনের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। উম্মুল মুমিনীন বলেন : "যেদিন হোসাইন শহীদ হন আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)- কে স্বপ্নে ধূলি ধুসরিত ও শোকে মূহ্যমান অবস্থায় দেখলাম। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম : 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার এ অবস্থা কেন?' তিনি

বললেন : ‘আমার সন্তান হোসাইন ও তার আহলে বাইতকে আজ শহীদ করা হয়েছে। আমি এইমাত্র তাদের দাফন সম্পন্ন করে আসলাম।’[৩৩১]

১. শহীদদের নেতা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য বনি হাশেমের শোক প্রকাশ : ইমাম জাফর সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : ‘কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার পর বনি হাশেমের কোন নারী সুরমা ও মেহেদী ব্যবহার করে নি এবং বনি হাশেমের কোন ঘর থেকে খাবার রান্না করার চিহ্ন হিসেবে উনুন থেকে কোন ধোঁয়া বের হতে দেখা যায় নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইবনে যিয়াদ নিহত ও ধ্বংস হয়। কারবালার মর্মান্তিক ও রক্তাক্ত ঘটনার পর নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদের চোখে অশ্রু ছিল।’[৩৩২]

২. ইমাম সাজ্জাদ (আ.)- এর শোক প্রকাশ : ‘তীব্র শোক ইমাম সাজ্জাদ (আ.)- এর ওপর এমন প্রভাব ফেলেছিল যে, তাঁর সমগ্র জীবন ছিল ক্রন্দনময়। তিনি তাঁর পিতা শহীদদের নেতার মুসিবতের জন্য সবচেয়ে বেশি অশ্রু ঝরিয়েছেন। তাঁর ভাই, চাচা, চাচাতো ভাই, ফুফু ও তাঁর বোনদের ভাগ্যে যা ঘটেছিল তা স্মরণ করে তিনি অজ¯ ধারায় ক্রন্দন করতেন। এমনকি যখন তাঁর সামনে পান করার জন্য পানি নিয়ে আসা হতো তখন তিনি পানি দেখে ক্রন্দন শুরু করে দিতেন এবং বলতেন : ‘কিভাবে পান করব যখন রাসূল (সা.)- এর সন্তানদের পিপাসার্ত অবস্থায় শহীদ করা হয়েছে।’[৩৩৩]

আর তিনি বলতেন : ‘যখনই আমার দাদী ফাতিমা যাহরা (আ.)- এর সন্তানের শাহাদাতের কথা স্মরণ হয় তখনই আমার কান্না পায়।’[৩৩৪]

ইমাম সাদিক (আ.) তাঁর অন্যতম সাহাবী যুরারাকে বলেছেন : ‘আমার দাদা আলী ইবনুল হোসাইন (আ.) যখনই হোসাইন ইবনে আলী (আ.)- কে স্মরণ করতেন তখন এত বেশি ক্রন্দন করতেন যে, তাঁর দাড়ি ভিজে যেত ও তার ক্রন্দন দেখে উপস্থিত ব্যক্তিরাও ক্রন্দন করত।’[৩৩৫]

৩. ইমাম বাকির (আ.)- এর শোক প্রকাশ : ইমাম বাকির (আ.) আশুরার দিন ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য শোকানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন ও তাঁর ওপর মুসিবতের কথা স্মরণ করে

ক্রন্দন করতেন। এ রকম কোন একটি শোকানুষ্ঠানে ইমাম বাকিরের উপস্থিতিতে কুমাইত নামক একজন কবি কবিতা পাঠ করেন। যখন কবিতা পাঠ করার এক পর্যায়ে এ অংশে এসে পৌঁছেন- قتيل بالطف অর্থাৎ 'তাফের ভূমিতে নিহত', ইমাম (আ.) এ অংশ শোনামাত্র কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন : 'হে কুমাইত! এই কবিতার পুরস্কার হিসেবে আমার কাছে কোন সম্পদ থাকলে তোমাকে পুরস্কৃত করতাম। কিন্তু তোমার পুরস্কার হিসেবে ঐ দোয়াটি করব যা রাসূল (সা.) হাস্সান ইবনে ছাবিত সম্পর্কে করেছেন। আর দোয়াটি হলো : 'আমাদের আহলে বাইতের পক্ষ সমর্থন ও তাদের প্রতিরক্ষা করার জন্য যখনই পদক্ষেপ নেবে তখনই রুহুল কুদেসর (পবিত্র আত্মার) সমর্থন ও সহায়তা লাভ করবে।'[৩৩৬]

৪. ইমাম জাফর সাদিক (আ.)- এর শোক প্রকাশ : ইমাম মূসা কাযিম (আ.) বলেন : ''যখনই পবিত্র মুহররম মাস আসত, আমার পিতা ইমাম বাকির (আ.) আর হাসতেন না; বরং দুঃখ ও শোক তাঁর চেহারাতে স্পষ্ট হয়ে উঠত। তাঁর গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। এভাবেই আশুরার দিন উপনীত হতো, এই মুসিবতের দিনে ইমামের দুঃখ ও শোক সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছত। তিনি বিরামহীনভাবে ক্রন্দন করতেন এবং বলতেন : 'আজকে এমন একটি দিন যে দিন আমার দাদা হোসাইন ইবনে আলী শাহাদাত বরণ করেছেন'। ''[৩৩৭]

৫. ইমাম মূসা কাযিম (আ.)- এর শোক প্রকাশ : ইমাম রেযা (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন : 'যখন পবিত্র মুহররম মাস আসত তখন আমার পিতা মূসা কাযিম (আ.)- কে কেউ হাসতে দেখত না; এভাবে চলতে থাকত আশুরার দিন পর্যন্ত; এ দিনে দুঃখশোক, মর্মপীড়া- মুসিবত আমার পিতাকে ঘিরে ধরত; তিনি ক্রন্দন করতেন এবং বলতেন : 'এ দিনে হোসাইন (আ.)- কে হত্যা করা হয়েছে। ''[৩৩৮]

৬. ইমাম রেযা (আ.)- এর শোক প্রকাশ : ইমাম রেযা (আ.)- এর ক্রন্দন এত বেশি পরিমাণ ছিল যে, তিনি বলতেন : 'ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মুসিবতের দিন আমাদের চোখের পাতাকে আহত করেছে, আমাদের অশ্রুধারা প্রবাহিত করেছে।'[৩৩৯]

বিশিষ্ট শিয়া কবি দেবেল খুজায়ী ইমাম রেযার নিকট আসলেন। ইমাম রেযা ইমাম হোসাইনের জন্য ক্রন্দন ও শোকের কবিতার গুরুত্ব তুলে ধরে বললেন : 'হে দেবেল! যে ব্যক্তি আমার দাদার মুসিবতে ক্রন্দন করে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেন।' অতঃপর তাঁর পরিবার ও উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে পর্দা টেনে দিলেন যাতে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মুসিবতে তাঁরা ক্রন্দন করতে পারেন।

অতঃপর ইমাম রেযা (আ.) দেবেল খুজায়ীকে বললেন : 'যতদিন জীবিত থাকবে ইমাম হোসাইনের জন্য শোকগাথা পাঠ কর। যতক্ষণ তোমার শারীরিক শক্তি থাকবে ততক্ষণ আমাদেরকে সহযোগিতা করতে কার্পণ্য কর না।' এ কথা শুনে দেবেল খুজায়ী ক্রন্দনরত অবস্থায় একটি কবিতাটি পাঠ করেছিলেন যার বিষয়টি ছিল এমন:

হে ফাতিমা! যদি হোসাইনকে কারবালার যমিনে পড়ে থাকতে দেখতেন; যিনি ফুরাত নদীর তীরে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন অত্যধিক দুঃখ ও কষ্টের কারণে নিজের হাত দিয়ে মুখ চাপড়াতেন এবং আপনার গাল দিয়ে চোখের পানি প্রবাহিত হতো।'

এ কবিতা শুনে ইমাম রেযা (আ.) ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন শুরু করলেন।[৩৪০]

৭. ইমাম মাহদী (আ.)- এর শোক প্রকাশ : রেওয়ায়াত অনুসারে ইমাম মাহদী (আ.) (আল্লাহ তাঁর আগমনকে ত্বরান্বিত করুন) আত্মগোপনকালীন এবং আত্মপ্রকাশের পর উভয় অবস্থায় তাঁর দাদার শাহাদাতের জন্য ক্রন্দন করছেন এবং করবেন। তিনি তাঁর সম্মানিত পিতামহ শহীদদের নেতা ইমাম হোসাইন (আ.)- কে উদ্দেশ্য করে বলেন :

فلئن اخرتنى الدهور و عاقنى عن نصرك المقدور ولم اكن لمن حاربك محارباً و لمن نصب لك العداوة مناصبا
فلاندبنك صباحاً و مساء ولابكين لك بدل الدموع دما، حسرة عليك و تأسفاً على ما دهاك

'যদিও সময় আমাকে পশ্চাদ্বর্তী করেছে এবং আপনাকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে ভাগ্য আমাকে দূরে রেখেছে যে কারণে আপনার প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণকারীদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করতে পারি নি, কিন্তু এখন প্রত্যেক সকাল- সন্ধ্যা আপনার জন্য ক্রন্দন করি এবং আপনার মুসিবতে

আমার দু'চোখ থেকে অশ্রুপাতের বদলে রক্ত বর্ষিত হয়। আপনার ওপর ঘটে যাওয়া মুসিবত আমার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করেছে।'[৩৪১]

৩৫ নং প্রশ্ন : ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য শোকানুষ্ঠান সাফাভীদের সময় থেকে চালু হয়েছিল কি?

উত্তর : ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য শোকানুষ্ঠান তাঁর শাহাদাতের সময় থেকে চালু হয়েছিল, তবে আলে- বুইয়া বংশ ক্ষমতায় আসার (৩৫২ হিজরি) পূর্ব পর্যন্ত এই শোকানুষ্ঠান গোপনে অনুষ্ঠিত হতো।[৩৪২] চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য শোকানুষ্ঠান প্রকাশ্য ছিল না; বরং গৃহসমূহে গোপনে পালিত হতো। কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শোকানুষ্ঠান অলিতে- গলিতে সর্বত্র প্রকাশ্যে পালিত হতো। সাধারণতভাবে মুসলিম ঐতিহাসিকরা বিশেষ করে যাঁরা সারা বছরের বিভিন্ন ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁরা ৩৫২ হিজরি ও তার পরবর্তী বছরগুলোর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আশুরার দিনে শিয়াদের শোকানুষ্ঠান পালন সম্পর্কে লিখেছেন। এদের মধ্যে ইবনে জাওযির 'মুনতাজেম', ইবনে আসিরের 'কামিল', ইবনে কাসিরের 'আল- বিদায়া ওয়ান নিহায়া', ইয়াফেয়ীর 'মিরআতুল জিনান' গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য, এছাড়াও যাহাবী ও আরো অনেকে এ সম্পর্কে লিখেছেন।

ইবনে জাওযি বর্ণনা করেছেন : ৩৫২ হিজরিতে মুইয্যুদ্দৌলা দায়লামী জনগণকে আশুরার দিনে একত্র হয়ে শোক প্রকাশের নির্দেশ দেন। এ দিনে বাজারগুলো বন্ধ থাকত, কেনা- বেচা হতো না; কসাইরা ভেড়া, দুম্বা জবাই করত না, হালিম রান্না করত না। জনসাধারণ পানি পান করত না, বাজারগুলোতে তাঁবু টাঙ্গানো হতো ও শোক প্রকাশের নিয়ম অনুসারে তাঁবুগুলোতে চট ঝুলানো হতো, নারীরা তাদের মাথা ও মুখ চাপড়ে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য শোক প্রকাশ করতেন।[৩৪৩]

হামাদানীর বর্ণনা অনুসারে : এদিনে নারীরা অগোছালো চুলে শোক প্রকাশের প্রথা অনুযায়ী নিজেদের চেহারাকে কালো করত ও গলিতে পথ চলত এবং ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোকে নিজেদের চেহারায় আঘাত করত।[৩৪৪]

শাফেয়ীর বর্ণনা অনুসারে : প্রথম বারের মতো কারবালার শহীদদের জন্য প্রকাশ্যে শোক প্রকাশের ঘটনা ছিল এটা।[৩৪৫] ইবনে কাসির ৩৫২ হিজরির ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, সুন্নিরা শিয়াদের এ কাজে বাধা দিত না। কেননা, শিয়ারা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল এবং সরকারও তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করত।

৩৫২ হিজরি থেকে পঞ্চম হিজরি শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত আলে বুইয়া শাসকরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এ সময়ে বেশির ভাগ বছরগুলোতে উল্লিখিত রীতি অনুসারে সামান্য পরিসরে হলেও শোকানুষ্ঠান পালন করা হতো। যদি আশুরার দিন ও ইরানী নববর্ষ বা ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীদের শরৎকালীন ফসলী নববর্ষের প্রাচীন উৎসব একই সময়ে পড়ত, সেক্ষেত্রে আশুরার সম্মানে প্রাচীন নববর্ষের আনন্দ উৎসবকে দেরিতে উদ্যাপন করত।[৩৪৬]

এই বছরগুলোতে ফাতিমী ও ইসমাইলী সম্প্রদায় সবেমাত্র মিশরে ক্ষমতা দখল করে কায়রো শহরকে নির্মাণ করেছিল এবং তারাই আশুরার শোকানুষ্ঠানকে মিশরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মাকরিজীর লিখিত দলিল অনুসারে : ৩৬৩ হিজরির আশুরার দিনে শিয়াদের একটি দল প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ইমাম হাসান (আ.)- এর এর দুই কন্যাসন্তান সাইয়্যেদা কুলছুম ও সাইয়্যেদা নাফিছার দাফনস্থলে যেতেন এবং এই দু'টি পবিত্র স্থানে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য শোকগাথা পাঠ ও ক্রন্দন করতেন (এই বাক্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, উল্লিখিত অনুষ্ঠান এর পূর্বের বছরগুলোতেও যথারীতি প্রচলিত ছিল)। ফাতিমীদের শাসনকালে আশুরার অনুষ্ঠান যথারীতি প্রতি বছর পালিত হতো। এ কারণে বাজারগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হতো; জনসাধারণ সমবেত হয়ে কারবালার শোকাবহ কথা স্মরণ করে শোকগাথা পাঠরত অবস্থায় কায়রোর জামে মসজিদে যেত।[৩৪৭]

এর পরে মিশরে শিয়াদের বিচ্ছিন্নতা ও সমাজের সাথে সংশ্রবহীনতার কারণে শোকানুষ্ঠান অতটা প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হতো না। যদিও শোকানুষ্ঠান আলে বুইয়ার শাসকদের পূর্বের অবস্থার চেয়ে উত্তম ছিল। কিছু সূত্র থেকে প্রমাণিত হয় ইরানের সাফাভী শাসনের প্রতিষ্ঠার পূর্বেও ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য শোকানুষ্ঠান পালন করা হতো।[৩৩৮] বিশেষ ভাবে কাশেফীর গ্রন্থ ‘রওজাতুশ শুহাদা’র বর্ণনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। ইরানের সাফাভীদের আমলে শিয়া মাযহাবের প্রসারের কারণে শোকানুষ্ঠান সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও প্রকাশ লাভ করে।

শিকল মারা ও বুক চাপড়ানো এবং তাজিয়ার উৎপত্তি

৩৬ নং প্রশ্ন : শিকল মারা ও বুক চাপড়ানো[৩৪৯] এবং তাজিয়া কোন্ জাতি এবং কোন্ সংস্কৃতি থেকে উৎপত্তি ঘটেছে?

উত্তর : শিকল মারার সংস্কৃতি ভারত ও পাকিস্তান থেকে ইরানে এসেছে। সেখানে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি এমনভাবে শিকল দিয়ে নিজেকে আঘাত করে শোক প্রকাশ করে যে, তাদের শরীরে ক্ষত সৃষ্টি ও রক্ত বের হয়। এ কারণে কিছুসংখ্যক আলেম এ বিষয়টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যদি এ বিষয়টি এমনভাবে পালন করা হয় যেখানে শরীরে কোন ক্ষত সৃষ্টি হবে না ও বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিতে তা অপছন্দনীয় নয় অথবা তা আশুরার শিক্ষার অবমাননার কারণ না হয় তাহলে এ ধরনের শোক প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই। যেহেতু ইরানের জনগণ বিশেষভাবে শিকল মারার ক্ষেত্রে শোক প্রকাশের কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা রক্ষা করে চলে সেহেতু এ ধরনের শোক প্রকাশ প্রচলিত রয়েছে।[৩৫০]

‘বুক চাপড়ানো’ শোক প্রকাশের একটি প্রথা হিসেবে পূর্ব থেকে আরবদের মাঝে প্রচলিত ছিল এবং পরে এই বিষয়টি সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে। গুরুগম্ভীর শোক- গাথা পাঠের সাথে বিশেষ ছন্দে বুক চাপড়িয়ে শোকপ্রকাশ প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে প্রচলিত ছিল, কিন্তু পরে যখন সাফাভীদের

সময় প্রকাশ্যে শোক প্রকাশের প্রসার ঘটেছিল তখন শোকানুষ্ঠান ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সামষ্টিক ও সামাজিক রূপ লাভ করেছিল।[৩৫১]

তাজিয়া (تعزیه)- পারিভাষিক অর্থে আশুরার হৃদয়বিদারক ঘটনাকে অভিনয়ের মাধ্যমে চিত্রায়ন করাকে বোঝায়। প্রথম করিম খাঁন যান্দ এবং সাফাভীদের শাসনকালে বাহ্যত ইরানে এ ধরনের শোক প্রকাশের প্রচলন ঘটে এবং তা নাসির উদ্দিন শাহের সময় ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ইউরোপ সফরে গিয়ে নাসির উদ্দিন শাহ থিয়েটার বা মঞ্চ নাটক দেখেছিলেন। তিনিই পরবর্তীকালে অন্যদেরকে আশুরার ঘটনাকে বাস্তব রূপ দানের উদ্দেশ্যে নাট্যরূপে উপস্থাপনে উৎসাহিত করেছিলেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তাজিয়া (অভিনয়ের মাধ্যমে কারবালার ঘটনাকে চিত্রায়িত করা) শুধু ইরানের সংস্কৃতি হিসেবে প্রচলিত ছিল না, অন্যান্য মুসলিম দেশ ও শিয়া অঞ্চলেও এ সংস্কৃতির প্রচলন ছিল। বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস ও বিভিন্ন উপকরণ ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা করা হতো। বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানে এ ধরনের সংস্কৃতির প্রচলন ছিল।

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোক প্রকাশের উপকরণ হিসেবে এক বা কয়েক ব্যক্তি কর্তৃক ভারী লৌহদণ্ডের ওপর লৌহ নির্মিত ময়ূর বহনের আচারটি বিভিন্ন আশুরা উদ্যাপন কমিটি পালন করে থাকে। এ ধরনের উপকরণ কাজার বংশের শাসনামলে ইরান ও ইউরোপের সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার পর খ্রিস্টানদের ধর্মীয় আচার থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ উপকরণে এমন কিছু বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে শোক প্রকাশকারীকে শোক প্রকাশের মূল লক্ষ্য ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের মর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।[৩৫২]

৩৭ নং প্রশ্ন : ইসলামের শুরুতে শোক প্রকাশের যে পদ্ধতিগুলোর প্রচলন ছিল না সেগুলোকে ইসলামে প্রচলন করা এক ধরনের বেদআত সমতুল্য নয় কি?

উত্তর : প্রথমত, স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শোক প্রকাশের ধরন স্বয়ং শোক প্রকাশ করা থেকে ভিন্ন এক বিষয়। প্রকৃতপক্ষে শোক প্রকাশের বিষয়টি ভিন্নভাবে ও পদ্ধতিতে প্রকাশ লাভ করতে পারে। তাই শোক প্রকাশের পদ্ধতি এক্ষেত্রে একটি উপকরণ বা মাধ্যম ছাড়া অন্য কিছু নয়।

দ্বিতীয়ত, শোক প্রকাশের উপকরণ বা মাধ্যম ও পদ্ধতি অবশ্যই শোক প্রকাশের মূল লক্ষ্য ও এর বার্তার সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে অর্থাৎ তার প্রকাশ এমনভাবে হতে হবে যে, সাবলীল, কার্যকর ও উত্তম রূপে আশুরার বার্তাকে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় যে, যদি আশুরার শিক্ষাকে একজন ব্যক্তির গায়ের জামার সাথে তুলনা করা হয় তাহলে এমন একটি জামা হতে হবে যা কোন ব্যক্তির গায়ের সাথে মানানসই হয়- যেন ছোট বা বড় না হয়। যদি ছোট হয় তাহলে সমস্ত শরীরকে ঢেকে রাখবে না অর্থাৎ আশুরার সকল বার্তাকে পৌঁছাবে না। আর যদি জামাটি বড় হয় তাহলেও বার্তাগ্রহণকারীদের বিচ্যুত করবে ও বাস্তবতা অনুধাবন থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

তৃতীয়ত, আশুরার প্রকৃত বার্তা প্রচার ও প্রসারের জন্য অবশ্যই বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার পছন্দনীয় উপকরণ[৩৫৩] ও উপাদান থেকে উপকৃত হতে হবে ও এগুলো ব্যবহার করতে হবে। যেমন ভারতে ইসলাম ধর্মকে প্রচারের জন্য উর্দু ভাষাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কিংবা দর্শনশাস্ত্রকে গ্রীক সভ্যতা থেকে গ্রহণ করে ওহীর শিক্ষার প্রচারে ব্যবহার করা হয়েছে...

চতুর্থত, ইসলাম ইসলামের মৌলিক বিষয়বস্তুর সাথে সংঘর্ষিক না হওয়া শর্তে সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি ও প্রথাকে সম্মান দেখায়। এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের সীমাবদ্ধতা আরোপ করে না। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম সকল জাতির ভাষা, পোশাক- আশাক, খাদ্যাভ্যাস, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদিকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে, যদি না এর মৌলিক বিশ্বাস ও সারসত্তার পরিপন্থী হয়।

ওপরে উল্লিখিত বিষয় অনুসারে, ইসলামের দৃষ্টিতে আহলে বাইতের জন্য শোক প্রকাশ বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতিতে প্রচলিত থাকতে ও বাস্তবায়িত হতে পারে যতক্ষণ না তা আশুরার সত্যিকার বার্তাকে পৌঁছানোর পথে বাধা সৃষ্টি করে; বরং তা ভালোমত শ্রোতার

মন-মগজে পৌঁছাতে সাহায্য করে। এ কারণেই শোক প্রকাশের এ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার- যেগুলো ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত ছিল না (যেমন শিকল মারা, বুক চাপড়ানো, তাজিয়া) সেগুলো বেদআত তো নয়ই বরং ইসলামের প্রচার-প্রসারে সাহায্যকারী হিসেবে গণ্য হবে; এগুলো নিজের গণ্ডির মধ্যে আশুরার বাণীকে বর্তমান সময়ের মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছে এবং তাদের অন্তরকে বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করেছে।

আবারো গুরুত্ব আরোপ করছি যে, এগুলো উপকরণ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। অবশ্যই সবসময় এ বিষয়গুলোকে উপকরণ ও মাধ্যম হিসেবে সীমানা রক্ষা করে চলতে হবে। আল্লাহ্ না করুন, কেউ যেন কোন বিষয়ের

উপকরণ বা মাধ্যমকে আসল বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দান না করে। উপকরণ ও মাধ্যম কেবল একটি ব্রিজের মতো যা দিয়ে আসল বিষয়ে পৌঁছানো সম্ভব এবং এগুলো কখনই প্রকৃত উদ্দেশ্য হতে পারে না। দুঃখের বিষয় যে, এ ক্ষেত্রে অনেকে অজ্ঞতাবশত বাহ্যিক রূপ ও আচারকে অভ্যন্তরীণ সারসত্তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রকৃত বিষয়বস্তু থেকে দূরে সরে যায়।

৩৮ নং প্রশ্ন : কেন অন্য ইমামদের জন্য শোক প্রকাশ ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোক প্রকাশের মতো নয়?

উত্তর : এ বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে আশুরার ঘটনার পরিমাণ ও গুণগত বিস্তৃতির (গভীর প্রভাবের) কারণে ঘটেছে। একদিকে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর সময় মুসলমান ও ইসলামী ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাজমান বিশেষ অবস্থা, তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর অবস্থা ও তাদের অত্যধিক যুলুম এবং সার্বিকভাবে মানবতা ও স্বাধীনতা হরণ ও ইসলাম সংকটাপন্ন হওয়া, মুসলিম উম্মাহর অবমাননা, সর্বত্র নিরাপত্তাহীনতা, শিয়াদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের শিক্ষাকে ভুলে যাওয়া, ধর্মে বেদআতের প্রবেশ ও প্রচার করা, মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী ঐক্য বিনষ্ট করা, ইসলামী ও মানবীয় মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাওয়া ইত্যাদি কারণ (যা ইসলামের লক্ষ্য ও গতিকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত

করে দিয়েছিল। তাই এ অবস্থাকে পূর্বের পথে ফিরিয়ে আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল), অপর দিকে কারবালায় আবু আবদিল্লাহ হোসাইন (আ.)- এর মাযলুমিয়াত (অন্যায় ও নিপীড়নের শিকার হওয়া) ও একাকিত্ব, ইমামের সাথে বন্ধু বেশধারী মুসলমানদের আচরণ, যুদ্ধের ধরন (অসম যুদ্ধ ও সীমাহীন অনাচার ও চরম নৃশংসতার পরিচয় দান), ইমাম ও তাঁর পরিবার এবং অনুসারীদের সাথে শারীরিকভাবে অবমাননাকর আচরণ এবং সেসাথে কারবালার ঘটনায় বিশেষ করে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মধ্যে বিদ্যমান সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণমূলক যে অফুরন্ত শিক্ষা রয়েছে সে দিক থেকে এ শোক প্রকাশ স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নতার দাবি রাখে।[৩৫৪]

এই ঘটনার বিশেষ ধরন ও ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন জটিলতা উন্মোচনকারী ভূমিকা ও গভীর তাৎপর্যের কারণে গবেষকদের অনেক প্রশ্নের উদ্রেক ও সমাধান দান করেছে। ফলে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত হাজার হাজার বই লেখা হয়েছে।

হযরত রাসূল (সা.), ইমাম আলী (আ.), হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.), ইমাম হাসান (আ.) ও অন্য ইমামগণ (আ.) ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শাহাদাত ও কারবালার ঘটনার অনুপম ও অতুলনীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে একে শোকানুষ্ঠানের ছাঁচে উজ্জীবিত রাখার ওপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৩৫৫]

আশুরার ঘটনার ভিন্ন দিক একে ঐতিহাসিক নজিরবিহীন ঘটনায় পরিণত করেছে। একারণেই ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন :

لا يوم كيومك يا ابا عبد الله

‘হে আবা আবদিল্লাহ (হে হোসাইন)! আপনার (শোকের) দিনের মতো কোন (দুঃখজনক) দিন নেই।’[৩৫৬]

এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, কোন ঘটনার প্রভাবের ব্যাপকতা ও গভীরতার ওপর ঐ ঘটনার সম্মান-মর্যাদা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এ দিক থেকে আশুরার ঘটনাটি এমন একটি ঘটনা যা

পরিমাণ, ব্যাপকতা ও গুণগত দিক থেকে অন্য কোন ঘটনার সাথে তুলনীয় নয়। তাই এর স্মরণও অনন্য ও অসাধারণভাবে হয়ে থাকে।

কালো পোশাক পরিধান

৩৯ নং প্রশ্ন : শোক প্রকাশের দিনে কালো পোশাক পরিধানের দর্শন কী?

কালো রং বিভিন্ন দিক থেকে ভিন্ন প্রভাব এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এর বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা অনুসারে কিছু বা বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে এর ব্যবহার করে থাকে। কালো রং একদিকে বস্তুকে অন্ধকারে গোপন ও ঢেকে রাখে তাই কখনও কখনও এ রঙ কোন কিছুকে ঢেকে রাখা বা গোপন রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়।[৩৫৭] আবার অন্যদিকে তা ব্যক্তিত্বের নিদর্শন হিসেবে পরিচিত। এ কারণেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের আনুষ্ঠানিক পোশাক (বিশেষত বহিরাবরণ, যেমন কোট, ব্লেজার ইত্যাদি) সাধারণত কালো বা গাঢ় সুরমা রঙের হয়। ইতিহাসে এরূপ অনেক বর্ণনা পাওয়া যায় যে, বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্য এ ধরনের রঙ ব্যবহার করতেন।[৩৫৮]

কালো রঙের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব হলো, এ রঙটি প্রকৃতিগতভাবে দুঃখ, বিষাদ ও বিষণ্নতার পরিচায়ক যা শোক প্রকাশের উপযোগী। এ কারণে বিশ্বের অনেক মানুষ এ রঙকে তাদের প্রিয়জনের মৃত্যুর দুঃখ, শোক ও বিষণ্নতা প্রকাশে ব্যবহার করে থাকে।

এ বিষয়টি স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শোক প্রকাশের দিনগুলোতে কালো রঙ নির্বাচনের মধ্যে উপরোল্লিখিত যুক্তিগুলো ছাড়াও আবেগ- অনুভূতির বিষয়ও জড়িত রয়েছে। যে ব্যক্তি তার প্রিয় মানুষের শোকে নিজে কালো পোশাক পরিধান করে এবং দেওয়ালগুলোকে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয় প্রকৃতপক্ষে সে এ কাজ দ্বারা বলতে ও বুঝাতে চায়- '(হে বিদায়ী) তুমি আমার চোখের জ্যোতি ও মণি ছিলে, তোমার মরদেহ মাটিতে দাফন হওয়া আমার কাছে পশ্চিম আকাশে চন্দ্র ও সূর্যের অস্তমিত হওয়ার মতো; (তোমার বিদায়) জীবনকে আমার চোখে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছে; সময় ও স্থানকে গ্রাস করে ফেলেছে।'

হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর মৃত্যুর অষ্টম দিনে পিতার কবরের নিকট গিয়ে ক্রন্দন করে নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠ করেছিলেন

يا ابتاه انقطعت بك الدنيا بانوارها و زوت زهرتها كانت ببهجتك زاهرة فقد اسود نهارها فصار يحكى حنادسها رطبها و يا بسها...والْسى... لازمنا

'হে পিতা! তুমি চলে গেছ, তোমার চলে যাওয়ার কারণে দুনিয়া এর আলো আমাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, এর নেয়ামতসমূহ থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে, বিশ্বজগৎ তোমার সৌন্দর্যে উজ্জ্বল ও আলোকিত ছিল, (কিন্তু তোমার বিদায়ের পর) এর দিনের আলো অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে, এর (দুনিয়ার) সিক্ততা ও শুষ্কতা, এর অন্ধকার রাতের নির্দেশ করে... এবং দুঃখ ও মর্মবেদনা আমাদের সবসময়ের সঙ্গী...।'[৩৫৯]

এ কারণেই কালো পোশাক পরিধান করার কারণ কালো রঙে লুক্কায়িত থাকা গোপন রহস্যের মধ্যে নিহিত এবং এর প্রকৃতিগত (দুঃখ ও শোকবাহী) রূপটিই একে যুক্তিসঙ্গত একটি প্রথায় পরিণত করেছে। আহলে বাইত (আ.)- এর অনুসারীরা শোক প্রকাশের দিনগুলোতে কালো পোশাক পরিধান করে। কারণ, এ পোশাক তাঁদের প্রতি প্রেম ও বন্ধুত্বের নিদর্শন বহন করে, স্বাধীনচেতাদের মহান নেতা ও আদর্শপুরুষ ইমাম হোসাইনের প্রতি নিবেদিত থাকার প্রতিশ্রুতি দান করে। এর মাধ্যমে সত্য- মিথ্যার রণাঙ্গনে তাঁকে সহযোগিতার ঘোষণা দেয় ও নৈতিকভাবে তাঁর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে।[৩৬০] ইমামদের বিশেষ করে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোকানুষ্ঠানে কালো পোশাক পরে বাহ্যিক কালোর অবয়বে তাঁর সাথে সহমর্মিতা দেখানোর মাধ্যমে নিজের অন্তরকে আলোকিত করা হয়; যদিও বাহ্যিকভাবে তা কালো, কিন্তু ভেতরে উজ্জ্বল ও তাঁর আদর্শে আলোকিত।

৪০ নং প্রশ্ন : অন্যান্য জাতির মধ্যে কালো পোশাক পরিধান করার প্রচলন রয়েছে কি? কালো পোশাক পরিধান করার সংস্কৃতি ইসলামের আগমনের পর আব্বাসী খলিফা অথবা আরব জাতি থেকে ইরানে প্রবেশ করেছে, ইরানী সভ্যতায় এ ধরনের সংস্কৃতি ছিল না।

উত্তর : প্রথমত, শোকের সময় কালো পোশাক পরিধানের রীতি বিভিন্ন জাতির মধ্যে গ্রহণযোগ্য এক প্রথা হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ইরান থেকে শুরু করে গ্রীক সভ্যতা, এমনকি আরবের জাহেলী সংস্কৃতিতেও এর প্রচলন ছিল।

দ্বিতীয়ত, কালো পোশাক পরিধান আব্বাসী খলিফাদের সময় অথবা ইসলাম আগমনের পর আরবদের নিকট থেকে ইরানে প্রবেশ করেনি; বরং এর মূল প্রাচীনকাল থেকেই ইরানী সংস্কৃতিতে নিহিত ছিল এবং বাহ্যিকভাবে তাদের ব্যবহারিক জীবনে এর প্রচলন ছিল। নিচের বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে :

১. অনেক ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক বর্ণনা এ বিষয়টি স্পষ্ট করে যে, পৃথিবীর অনেক জাতি ও গোষ্ঠী প্রাচীনকাল থেকে শোকের দিনগুলোতে কালো পোশাক পরিধান করত। উদাহরণস্বরূপ ইরান, গ্রীক ও আরব সংস্কৃতির কিছু নমুনা তুলে ধরলাম :

ক. প্রাচীন ইরানের কালো পোশাক পরিধানের সংস্কৃতি : প্রাচীন ইরানের পাণ্ডুলিপিগুলোতে অনেক প্রমাণ রয়েছে যে, কালো পোশাক শোকের চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ইরানী বিখ্যাত সাহিত্যিক ফেরদৌসী 'শাহনামা'তে ইরানী প্রাচীন সংস্কৃতির বিভিন্ন ঘটনাতে কালো পোশাক শোকের চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

বিশেষ করে যখন রুস্তমের ভাই 'শুগাদ' তাকে কাপুরুষের মতো হত্যা করেছিল, ফেরদৌসী তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

এক বছর সিস্তানে শোক ছিল, তাদের জামাসমূহ কালো ছিল।

সাসানীদের যুগে যখন বাহরাম গুর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল, তার উত্তরাধিকারী ইয়াজ্দর্গাদ শোকানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

পথে চল্লিশ দিন পিতার শোক পালন করেছিল,

সৈন্যরা কালো পোশাক পরিধান করেছিল।

ফেরেইদুন যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল তার উত্তরাধিকারী ও সন্তানরা এ কাজ করেছিল :

মানুচেহর এক সপ্তাহ যন্ত্রণায় ছিল, দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ ও চেহারা হলুদ ছিল; সকলে পরেছিল কালো পোশাক, রাজা পেলেন মনোবল সৈন্যদের সম্মিলিত সমবেদনা প্রকাশে।

এ কালো পোশাক পরার সংস্কৃতি এখন পর্যন্ত ইরানে চালু রয়েছে।[৩৬১]

খ. গ্রীক সভ্যতায় কালো পোশাক পরিধানের সংস্কৃতি : গ্রীসের প্রাচীন কল্পকাহিনীতে এসেছে : 'হেক্টরের হাতে প্রটিসিলাস নিহত হওয়ার ঘটনায় টাইটাস অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে শোকের চিহ্ন হিসেবে সবচেয়ে কালো পোশাক পরিধান করেছিল।'

এ বিষয়টি গ্রীক সভ্যতায় কবি হোমারের যুগে কালো পোশাক পরিধান করার প্রথার প্রমাণ বহন করে। ইহুদিদের মধ্যে প্রাচীনকালে আত্মীয়- স্বজনের শোকে এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, সকলে মাথা কামিয়ে ছাই মাখত এবং তাদের পোশাক কালো অথবা কালোর কাছাকাছি কোন রংয়ের ছিল।[৩৬২]

বুসতানী তাঁর 'বিশ্বকোষ'- এ কালো রঙ ইউরোপীয় সভ্যতার সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতে শোক পালনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত রং হিসেবে গণ্য হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন : শোক পালনের সময় মৃত ব্যক্তির আত্মীয়তার নৈকট্যের শ্রেণিভেদে তারা এক সপ্তাহ থেকে এক বছর পর্যন্ত শোকানুষ্ঠান পালন করে। বিশেষ করে বিধবা নারীরা কমপক্ষে এক বছর শোক পালন করে এবং এই সময়ে তাদের পোশাক থাকে কোন ধরনের নকশা ও অলংকার ছাড়া কালো রংয়ের।[৩৬৩]

গ: লো পোশাক পরিধানের সংস্কৃতিআরব জাতির কা . আরবদের ইতিহাস, কবিতা ও ভাষা সাক্ষ্য দেয় যে, মিশর হতে সিরিয়া, ইরাক ও সৌদি আরবসহ সব জায়গায় কালো রঙ শোকের রঙ হিসেবে পরিচিত ছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দীর আরব সাহিত্যিক ও কোরআনের মুফাস্সির যামাখশারী লিখেছেন : একজন সাহিত্যিক বলেছেন : "কালো পোশাক পরিধানকারী সন্যাসীকে দেখে প্রশ্ন করেছিলাম : 'কেন কালো পোশাক পরিধান করেছ?' বলল : 'আরবরা যখন তাদের মধ্য হতে কেউ মারা যায় তখন

কোন্ ধরনের পোশাক পরিধান করে?’ সন্যাসী বলল : ‘আমিও আমার গুনাহের শোকে কালো পোশাক পরিধান করেছি। ”[৩৬৪]

ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে, আরব জাতি তাদের মুসিবতের সময় নিজেদের পোশাককে কালো করত।[৩৬৫]

রাসূল (সা.)- এর যুগে বদরের যুদ্ধের শেষে যখন ৭০ জন মুশরিক ও কুরাইশ মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল তখন মক্কার নারীরা তাদের নিহতদের শোকে কালো পোশাক পরিধান করেছিল।[৩৬৬]

এসকল ঐতিহাসিক বর্ণনা এবং সাহিত্যিক রচনা ও কবিতা প্রমাণ করে যে, কালো রং প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে শোকের চিহ্ন হিসেবে প্রচলিত ছিল। এ বিষয়টি ইরান বা ইসলামী যুগের সাথে বিশেষ ভাবে সম্পৃক্ত নয়; বরং ইসলামের পূর্বে ইরানীরা ও প্রাচীন গ্রীসের আধিবাসীরাও শোক প্রকাশের প্রথা হিসেবে কালো অথবা গাঢ় নীল রংয়ের পোশাক পরিধান করত।[৩৬৭]

২. আহলে বাইত (আ.)- এর মাঝে কালো পোশাক পরিধানের সংস্কৃতি : তথ্যভিত্তিক সংবাদ এই বিষয়টির সুস্পষ্ট বর্ণনা করে যে, রাসূল (সা.) এবং পবিত্র ইমামগণও এই যৌক্তিক প্রকৃতিগত পথকে সমর্থন করেছেন এবং নিজেদের প্রিয় ব্যক্তির শোকে তাঁরা নিজেরাও কালো পোশাক পরিধান করেছেন।

‘নাহজুল বালাগার শারহ’ (ব্যাখ্যা গ্রন্থ)- এ ইবনে আবিল হাদীদ বর্ণনা করেছেন : ইমাম হাসান (আ.) তাঁর পিতা আলী (আ.)- এর শাহাদাতের শোকে কালো পোশাক পরিধান করে মানুষের মাঝে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন।[৩৬৮]

এ কারণে যে হাদীসটি সকল হাদীসবিদ বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : ‘বনি হাশিমের নারীরা আবা- আবদিল্লাহ হোসাইন (আ.)- এর শোকে কালো পোশাক পরিধান করতেন।’

لما قتل الحسين بن علی)ع) لبس نساء بنی هاشم السواد و المسوح و كن لاتشتكين من حر ولابرد و كان علی بن الحسين)ع) يعمل لهن الطعام للمأتم

'যখন ইমাম হোসাইন (আ.) শহীদ হলেন তখন বনি হাশিমের নারীরা কালো ও রুক্ষ- পশমের পোশাক পরিধান করেছিলেন, গরম বা ঠাণ্ডার বিষয়ে তাঁদের কোন অভিযোগ ছিল না, তাঁরা শোক পালনে রত থাকার কারণে (আমার পিতা) আলী ইবনে হোসাইন (আ.) তাঁদের জন্য খাবার তৈরি করতেন।'

আব্বাসীদের কালো পোশাক পরিধান করার কারণ

আব্বাসী খলিফারা উমাইয়া খলিফাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরুর সময় থেকে বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে আহলে বাইতের শহীদদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারী হিসেবে দাবি করেছিল। এ কারণে যখন তারা ক্ষমতা অর্জন করেছিল তখন তাদের শাসনকে আলে মুহাম্মাদ (সা.)- এর শাসন হিসেবে অভিহিত করত এবং বলত যে, এই খেলাফত হচ্ছে আলী (আ.)- এর খেলাফতেরই ধারাবাহিকতা। তাদের প্রধানমন্ত্রী আবু সালামা খাল্লালকে আলে মুহাম্মাদের প্রধানমন্ত্রী এবং তাদের সামরিক বাহিনীর প্রধান আবু মুসলিম খোরাসানিকে আলে মুহাম্মাদের আমিন (বিশ্বস্ত ব্যক্তি) বা নেতা হিসেবে নামকরণ করেছিল।

কালো পোশাক রাসূল (সা.)- এর অবমাননা ও তাঁর আহলে বাইতের ওপর ঘটে যাওয়া হৃদয়বিদারক ঘটনার শোকের প্রতীক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।[৩৬৯] আব্বাসী খলিফারা কালো পোশাক পরিধানের প্রথা ইরানে এবং অন্যান্য ইসলামী শহরে প্রবর্তন করে নি; কেননা, মৃত ব্যক্তির শোকে কালো পোশাক পরিধানের প্রথা সামাজিকভাবে এবং বিশেষভাবে শহীদদের সর্দার ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোকে প্রথম থেকেই প্রচলিত ছিল।

কারবালার মযলুম শহীদ ইমাম হোসাইন এবং বনি উমাইয়ার হাতে নিহত তাঁর নাতি যাইদ ইবনে আলী ও ইয়াহিয়া ইবনে যাইদের রক্তের প্রতিশোধের অজুহাতে আব্বাসী খলিফারা কালো পতাকা ও কালো পোশাক পরিধান করাকে আহলে বাইতের শহীদদের শোক প্রকাশের উপকরণরূপে ব্যবহার করেছে। এই ধরনের কৌশল ব্যবহার করে তারা আহলে বাইতের অনুসারীদের প্রতারিত

করে নিজেদের দলে আনার চেষ্টা করেছে এবং এ ধরনের প্রচার- প্রপাগান্ডার মাধ্যমে মানুষের মনে নিজেদের স্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছে। তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও কালো পতাকা ও পোশাককে সবসময়ের জন্য নিজেদের নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছিল।[৩৭০]

এই প্রতারণার কারণেই ইমাম জাফর সাদিক (আ.) এবং অন্যান্য ইমাম কালো রঙের পোশাকের বিরুদ্ধে ইশারা- ইঙ্গিতে কথা বলতেন। আব্বাসী খলিফারা আনুষ্ঠানিকভাবে কালো পোশাককে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার কারণে ইমামরা এই বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাদের সাথে এ বিষয়ে (কালো পোশাক ব্যবহার) একাত্মতা প্রকাশ করা অত্যাচারী শাসককে স্বীকৃতি দান বলে মনে করা হতো। কিন্তু তাঁরা সার্বিকভাবে আহলে বাইতের শহীদদের শোকে শোকাহত হয়ে কালো পোশাকের সংস্কৃতির বিরোধী ছিলেন না।[৩৭১]

শোক প্রকাশের পদ্ধতি

৪১ নং প্রশ্ন : ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য কী পরিমাণ শোক প্রকাশ করা বৈধ?

ইসলামী শরিয়তের বিধান শোক প্রকাশের পেছনে নিহিত দর্শন ও বুদ্ধিমান সমাজের কাছে সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য নীতিই আহলে বাইত বিশেষ করে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য শোক প্রকাশের সীমানা নির্ধারণ করবে। যদি শোকের আবেগ- উদ্দীপনার মাত্রা তার বুদ্ধিবৃত্তির ওপর এমনভাবে প্রাধ্যান্য লাভ করে যে, এর দর্শন থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে তা শরিয়ত ও বৃদ্ধিবৃত্তির সীমানা থেকে দূরে সরে যাবে। যদি এর ধরন এমন হয় যা বুদ্ধিবৃত্তিগতভাবে সমাজ অপছন্দ ও ঘৃণা করে, তা শিয়া মাযহাব ও এর প্রকৃত শিক্ষার সাথে অবমাননাকর মনে হয় তাহলে অবশ্যই এ ধরনের শোক প্রকাশ অনাকাঙ্ক্ষিত ও বর্জিত হবে।

বলা বাহুল্য, শোক প্রকাশের ধরন এমন হওয়া উচিত যাতে এর শিক্ষার প্রকৃত বিষয়বস্তুকে মানুষের মাঝে সঠিকভাবে প্রচার করতে পারে এবং ইমামদের সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। যদি এ শোক প্রকাশের বাহ্যিক রূপ এমন হয় যে, অভ্যন্তরীণ রূপের আদৌ

প্রকাশ না ঘটায়; বরং মূল বিষয়বস্তুকেই বিতর্কিত করে তোলে তাহলে এ বিষয়টি সঠিক রূপে প্রকাশ লাভ করবে না; আ তা আশুরার রূপকেই বেমানান করে তুলবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছুসংখ্যক লোক ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজেদের শরীরে আঘাত করার মাধ্যমে শোক প্রকাশ করে থাকে। এ ধরনের ব্যক্তিরা শুধু আশুরার প্রকৃত আদর্শকে বিকৃতরূপে প্রচার করল না; বরং যেমনভাবে ইসলামী বিপ্লবের নেতা আলী খামেনেয়ী বলেছেন, তারা আশুরার শিক্ষার প্রতি অবমাননা করল এবং এ অবমাননার কারণে এ ধরনের কাজ বৈধ হবে না।[৩৭২]

৪২ নং প্রশ্ন : যদিও ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব অতুলনীয় তবুও কেন কিছু শোকানুষ্ঠানে তাঁর কেবল হীন ও মযলুম অবস্থা প্রর্দশন করা হয়। কিভাবে এগুলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব?

উত্তর : ‘عزت’ শব্দটির অর্থ কঠিন, শক্তিশালী, দৃঢ় হওয়া। শব্দটি কোরআনের বেশ কিছু আয়াতে পছন্দনীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হয়েছে এবং এ বৈশিষ্ট্যকে আল্লাহ, রাসূল (সা.) এবং মুমিনদের অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করেছে।

ইমাম হোসাইন (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা কোরআনের এই শিক্ষার অনুসরণের ক্ষেত্রে সবসময় অগ্রগামী ছিলেন। কখনই অপমান ও লাঞ্ছনাকে সহ্য করেননি। ফলে এই বিষয়টি هيهات م نّا الذلة ‘অপমান ও লাঞ্ছনা আমাদের থেকে অনেক দূরে’- আশুরার আন্দোলনের অন্যতম স্লোগানে রূপান্তরিত হয়েছে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কিছু সূত্র ও লেখনিতে এমন বিষয় উল্লিখিত হয়েছে যার ভিত্তিতে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর নামে আয়োজিত কিছু শোকানুষ্ঠানে এমন কথা বলা হয়ে থাকে যেগুলোতে তাঁর আন্দোলনে বিদ্যমান সম্মান ও মর্যাদার উপাদানগুলোকে উপেক্ষা করা হয়।

এ পদ্ধতির পেছনে নিহিত মনস্তাত্ত্বিক মূল কারণ হলো হোসাইনী আন্দোলনের প্রচারকারী কতিপয় ব্যক্তি ইমামের আন্দোলনের শিক্ষামূলক বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পরিবর্তে শুধু তাদের কান্নার অনুভূতিকে জাগ্রত করার জন্য চেষ্টা করে। এ কারণে অগ্রহণযোগ্য ও অবিশ্বস্ত সূত্র থেকে শোকের

বিষয়বস্তু বর্ণনা করে এবং হোসাইনী আন্দোলনের অপমানজনক ও লাঞ্ছনাময় চেহারা মানুষের সামনে চিত্রায়িত করে।

যে সকল বিষয়বস্তু বর্ণনার ফলে ইমাম হোসাইন (আ.) ও তাঁর সাহাবীদের সম্মান ও মর্যাদার হানি ঘটে এবং যার বর্ণনা ইসলাম, রাসূল (সা.), আলী (আ.) এবং আহলে বাইতের সুন্নাতের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তা অগ্রহণযোগ্য ও অনাকাঙ্ক্ষিত; এ ধরনের বিষয়বস্তুকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

তবে দলিল সহকারে ও সঠিক সূত্র থেকে হোসাইন (আ.) ও তাঁর সাহাবীরা যে সকল অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছেন তা বর্ণনা ও বিশ্লেষণের অর্থ তাঁদের মর্যাদার হানি ঘটা নয়; বরং এর মাধ্যমে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা মানুষের নিকট আরো সুস্পষ্ট করা হয়। কেননা, শত্রুদের অত্যাচারের ঘটনার বর্ণনা এবং তাদের মোকাবেলায় ইমাম হোসাইনের সাহসী ও ও সংগ্রামী ভূমিকার বিশ্লেষণ এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে যে, কিভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব।

৪৪ নং প্রশ্ন : আশুরার মহত্ত্ব প্রকাশ ও এর গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য কেন আলোচনা- সংলাপকে যথেষ্ট গণ্য করা হয় না? কেন এ ধারণা করা হয় যে, আশুরার ঘটনাকে জীবন্ত রাখার একমাত্র পদ্ধতি হলো মানুষকে অবশ্যই বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করতে হবে, শহরকে কালো রঙে ঢেকে দিতে হবে, অর্ধরাত্রি পর্যন্ত শোকানুষ্ঠান পালন করতে হবে; এমনকি দিনের কিছু সময়ে বা আশুরার পুরো দিন কাজ- কর্ম পরিহার করে রাস্তায় বের হয়ে

সমবেতভাবে মাতম করতে করতে দীর্ঘ পথ হেঁটে যেতে হবে? বিশেষ করে যখন এ ধরনের কাজ অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়; অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি সাধন ছাড়া এ অনুষ্ঠান পালন করা সম্ভব নয় কি? এমন কোন পদ্ধতি কি অবলম্বন করা যায় না যাতে এ ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা কম হবে? উদাহরণস্বরূপ টক শো, বৈঠক অথবা সেমিনারের ব্যবস্থা করা যেখানে শ্রোতারা এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আশুরার স্মৃতিকে জাগ্রত করবে?

উত্তর : শহীদদের নেতা ইমাম হোসাইন (আ.)-এর ব্যক্তিত্বের ওপর এ ধরনের বৈঠক, সেমিনার, আলোচনার অনুষ্ঠান, প্রবন্ধ লিখন, সাংস্কৃতিক, তাত্ত্বিক, গবেষণামূলক কাজ অত্যন্ত কার্যকরী ও জরুরি; তবে ইমামের নাম এবং শোকানুষ্ঠানের বরকতে আমাদের সমাজে এ ধরনের কাজ অনেক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে; সাধারণ মানুষরাও এ থেকে জ্ঞান লাভ করে।

এ ধরনের কর্মতৎপরতার স্বস্থানে প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আশুরার শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট কি? নাকি অন্যান্য প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান, যেমন শোকানুষ্ঠান- যার সঙ্গে মানুষ আগে থেকেই পরিচিত, তারও প্রয়োজন আছে?

এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের মনোবিদ্যার দৃষ্টিতে মানুষের দিকে দৃষ্টি আরোপ করতে হবে এবং দেখতে হবে আমাদের সচেতনমূলক আচরণের পেছনে কোন্ ধরনের উপাদান অধিক কার্যকর। শুধু জ্ঞান ও প্রজ্ঞাই কি আমাদের সামাজিক আচরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখে, নাকি এর সাথে অন্য কোন উপাদান রয়েছে।

আমাদের আচরণগুলোর দিকে মনোনিবেশ করলে দেখতে পাব যে, আমাদের আচরণের মধ্যে কমপক্ষে দু'টি উপাদান মূল ভূমিকা পালন করে। একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও পরিচিতিমূলক উপাদান অপরটি অভ্যন্তরীণ মনোগত উপাদান। এক ধরনের পরিচিতিমূলক উপাদান রয়েছে যার কারণে মানুষ কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করে ও একে গ্রহণ করে। স্বাভাবিক ভাবেই যে কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে তার উপযোগী বৃদ্ধিবৃত্তিক বা অভিজ্ঞতামূলক অথবা অন্য যে কোন দলিল ব্যবহার করা হয়।

নিশ্চিতভাবে কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের আচরণের ওপর অনেক প্রভাব রাখে, কিন্তু তা একমাত্র কার্যকরী উপাদান নয়। আরো অনেক

ধরনের উপাদান রয়েছে, হয়তো আমাদের আচরণের ওপর সেগুলোর প্রভাব পরিচিতিমূলক উপাদানের চেয়েও অধিক। এ ধরনের উপাদানকে সার্বিকভাবে আবেগ, অনুভূতি ও প্রবণতা নামকরণ করা হয়। এগুলো অভ্যন্তরীণ ও মনোগত উপাদান হিসেবে আমাদের আচরণের ওপর কার্যকর ভূমিকা রাখে।

যখনই আপনি আপনার আচরণকে- হোক তা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক অথবা সামাজিক বা রাজনৈতিক- পর্যালোচনা করবেন, লক্ষ্য করবেন যে, যে মূল উপাদানটি আপনাকে এ ধরনের আচরণ করতে বাধ্য করেছে তা হলো উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী কোন উপাদান।

শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ মুতাহহারী এ বিষয়ে বলেন : 'আমাদের অভ্যন্তরে কোন উপাদান থাকতে হবে যা আমাদেরকে উদ্দীপ্ত করবে। কোন কাজের জন্য আমাদের আগ্রহ থাকতে হবে, তবেই আমরা কাজটি সম্পাদন করতে উদ্যোগী হব। শুধু কোন কাজ সম্পর্কে জ্ঞান ঐ কাজ করতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে না, এর সাথে মনোগত কারণও রয়েছে যা ঐ কাজের দিকে উদ্বুদ্ধ করে। এ ধরনের উপাদানকে অভ্যন্তরীণ ও মনোগত উপাদান বলা হয়। এ উপাদানই সার্বিকভাবে কোন কাজে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহ, ভালোবাসা ও উদ্দীপনা তৈরি করে। এ উপাদান না থাকলে কোন কাজ সম্পন্ন হয় না। এমনকি যদি মানুষ কোন খাদ্যের বিষয়ে এ জ্ঞান রাখে যে, তা শরীরের জন্য উপকারী, কিন্তু ঐ খাদ্য খাওয়ার প্রতি তার আগ্রহ না থাকে তাহলে সে ঐ খাদ্য গ্রহণ করবে না। যদি কোন ব্যক্তির খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে যায়, খাওয়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, যতই তাকে বলা হোক যে, খাদ্যটি শরীরের জন্য উপকারী, তবু সে খাদ্যটি খাওয়ার ব্যাপারে কোন আগ্রহ খুঁজে পাবে না। অতএব, কোন কাজের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও পরিচিতি ছাড়াও মানুষের মনের আগ্রহ- উদ্দীপনারও প্রয়োজন রয়েছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ও ঠিক একই রকম। কোন ব্যক্তি কোন আন্দোলনকে ভালো ও উপকারী মনে করলেও যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ আন্দোলনের ব্যাপারে উৎসাহ- উদ্দীপনা খুঁজে পায় ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে না।'

এখন এ বিষয়টিকে আমরা গ্রহণ করেছি যে, মানুষের সচেতনমূলক যে কোন পদক্ষেপ বা আচরণের পেছনে দুই ধরনের উপাদান থাকা অত্যন্ত জরুরি। প্রথম, ঐ বিষয় সম্পর্কে পরিচিতিমূলক জ্ঞান। দ্বিতীয়, ঐ কাজের
জন্য অভ্যন্তরীণ মনোগত উপাদান অর্থাৎ উৎসাহ- উদ্দীপনা। আমরা শহীদদের নেতা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলন মানবজাতির সৌভাগ্যের জন্য কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তা

জানার পরও বুঝতে পারি যে, শুধু এ ঘটনা সম্পর্কে তথ্য ও জ্ঞান আমাদেরকে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী করে তোলে না; বরং যখন ঐ বিষয়ের প্রতি আমাদের মনে উদ্দীপনা ও আগ্রহ সৃষ্টি হবে তখনই কেবল ঐ আন্দোলনকে স্মরণ করে ইমাম হোসাইনের মতো নিজেকে উৎসর্গ করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

শুধু কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান ও পরিচিতি ঐ বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করে না; বরং অভ্যন্তরীণ উৎসাহ- উদ্দীপনা সৃষ্টি হতে হয় যা আমাদেরকে ঐ কাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

সভা- সমাবেশ, আলোচনা- পর্যালোচনা, বক্তব্য প্রথম উপাদানের অর্থাৎ পরিচিতি, তথ্য ও জ্ঞানের চাহিদা পূরণ করে, কিন্তু আমাদের উৎসাহ- উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য অন্য উপাদানের প্রয়োজন রয়েছে। কোন ঘটনার পরিচিতি, স্মরণ ও পর্যালোচনা ঐ কাজে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, তবে যে উপাদানটি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল ভূমিকা পালন করে তা হলো মনের দিক- যা সরাসরি মানুষের আবেগ- অনুভূতির সাথে জড়িত।

যখন কোন মর্মান্তিক ঘটনাকে মঞ্চায়িত করা হয় এবং মানুষ এ ঘটনাকে খুব নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করে তখন সেটার সাথে বই পড়ে অথবা অন্য কারো নিকট থেকে ঐ ঘটনা জানতে পারার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।

এ রকম অভিজ্ঞতা আপনারা নিজেরা অনেকবার অর্জন করেছেন। অনেকবার আশুরার ঘটনা শুনেছেন একং জেনেছেন যে, ইমাম হোসাইন (আ.) কীভাবে কারবালার প্রান্তরে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু শুধু এ ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান কি আপনাদের চোখের অশ্রু প্রবাহিত করে? অবশ্যই, না। অথচ যখন আপনি কোন শোকানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং শোকগাথা পাঠকারী কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা আকর্ষণীয় কণ্ঠে বর্ণনা করেন, বিশেষ করে যদি তাঁর সুর ভালো হয়, তাহলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই আপনার চোখের অশ্রু গড়িয়ে পড়বে।

এ পদ্ধতি আপনার অনুভূতির ওপর অধিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে যা শুধু অধ্যয়ন ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এ কারণেই যা প্রত্যক্ষ করা হয় তা শোনার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি প্রভাব রাখে। এ বিষয়গুলো বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয়টি বোঝানো যে, আমাদের

অবশ্যই জানতে হবে কেন আবু আবদিল্লাহ (আ.) বিদ্রোহ করেছেন, মযলুম অবস্থায় শহীদ হয়েছেন। কিন্তু এর পাশাপাশি আশুরার ঘটনাকে আমাদের সামনে বর্ণনা বা মঞ্চায়নের মাধ্যমে এমনভাবে সাজাতে ও চিত্রায়িত করতে হবে যাতে তা বেশি পরিমাণে আমাদের হৃদয় ও অনুভূতিকে নাড়া দেয় এবং আমাদের মধ্যে আবেগের সৃষ্টি হয়। যত বেশি এ আবেগ সৃষ্টি হবে তত বেশি আমাদের জীবনে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

এ কারণেই আশুরার ঘটনার ওপর শুধু তত্ত্বগত আলোচনা প্রকৃত ভূমিকা পালনে অক্ষম। বরং সামাজিকভাবে এমনভাবে শোকানুষ্ঠান পালন করতে হবে যা মানুষের অনুভূতিকে জাগ্রত করবে। যখন কেউ সকালে ঘর থেকে বাহিরে বের হয়ে দেখতে পায় সম্পূর্ণ শহরকে কালো কাপড়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে এবং সর্বত্র কালো পতাকা স্থাপন করা হয়েছে, এ পরিবর্তনটি মানুষের অন্তরকে অধিক নাড়া দেয়।

যদিও মানুষ জানে আগামীকাল মুহররমের প্রথম দিন, কিন্তু এ তথ্য তাদের অন্তরকে ঐ রকম প্রভাবিত করতে পারে না যতটা সকল স্থানে কালো পতাকা ও সকলকে কালো পোশাক পরিহিত দেখা তাকে প্রভাবিত করবে। তাই সামষ্টিক ভাবে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে মর্সিয়া পাঠ ও বুক চাপড়ানোর অনুষ্ঠান পালন করার মাধ্যমে যতটা প্রভাব ফেলা সম্ভব, অন্য কোন কিছুতে তা সম্ভব নয়।

এখান থেকে ইমাম খোমেইনী (রহ.) যে বক্তব্যগুলো অসংখ্য বার পুনরাবৃত্তি করতেন সেগুলোর কারণ অনুধাবন করা সম্ভব। তিনি বলতেন : 'আমাদের যা কিছু (মূল্যবোধ) রয়েছে তা মুহররম ও সফর থেকে।' তিনি শোকানুষ্ঠানকে ঐতিহ্যবাহী প্রচলিত পদ্ধতিতে পালন করার ওপর গুরুত্ব দিতেন। কেননা, গত তের শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় প্রমাণ হয়েছিল যে, আবেগময় পদ্ধতিতে শোক পালনের বিষয়টি মানুষের মধ্যে উৎসাহ- উদ্দীপনা ও আত্মত্যাগী অনুভূতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে কত বেশি ভূমিকা রাখে এবং কীরূপ অলৌকিক পরিবর্তন ঘটায়!

অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে, ইরানের ইসলামী বিপ্লব ও সাদ্দামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে যে সকল বিজয় অর্জিত হয়েছে তার সবই আশুরার শিক্ষা এবং শহীদদের নেতা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর

নামের বরকতে অর্জিত হয়েছে। এই প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও অচিন্তনীয় ছিল। কোন বস্তুর বিনিময়ে এ ধরনের মহামূল্যবান অনুভূতি সমাজের মধ্যে সৃষ্টি করা সম্ভব? এরূপ শোকানুষ্ঠানগুলো কি ধরনের পবিত্র প্রেমের সৃষ্টি করে যা মানুষকে শাহাদাত বরণ করার জন্য প্রস্তুত করে? যদি বলি যে, প্রকৃত ইসলাম ছাড়া অন্য কোন সমাজ ও মতাদর্শেই এ ধরনের উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না, তাহলে অর্থহীন কোন কথা বলি নি।

শোকানুষ্ঠান পালন করার সময়

৪৪ নং প্রশ্ন : কেন আমরা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর ক্ষেত্রে তাঁর শাহাদাতের দিন আসার পূর্বেই (আশুরার দিনের পূর্বে) শোক পালন শুরু করি?

উত্তর : আশুরার পূর্বে শোকানুষ্ঠান পালন হচ্ছে আশুরার শোকানুষ্ঠানের ভূমিকাস্বরূপ। আবু আবদিল্লাহ (আ.)- এর জন্য শোক পালনের মূলনীতি ইসলামী শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ অনুষ্ঠানের ধরন ও সময় বিভিন্ন সমাজ ও জাতিতে প্রচলিত প্রথা ও রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন কিছু অঞ্চলে ইমাম হোসাইনের শোকানুষ্ঠান ৭ মুহররম থেকে শুরু হয়ে ৩রা সফর পর্যন্ত চলতে থাকে, কিছু অঞ্চলে ১লা মুহররম থেকে আশুরার দিন পর্যন্ত চলে; কিছু অঞ্চলে সারা বছর বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে শোকগাথার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়; কিছু অঞ্চলে মুহররম মাসের শুরু থেকে সফর মাসের শেষ দিন পর্যন্ত শোকানুষ্ঠান চলে।

এ সকল ধরন আসলে কোন সমস্যা নয়। কারণ, শোকানুষ্ঠান এবং মৃত্যুবার্ষিকী পালন বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি ও রীতিনীতির সাথে সম্পর্কিত। সাধারণত মৃত্যুবার্ষিকী পরবর্তী বছরগুলোতে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর রাতে পালন করা হয়। যেহেতু শাহাদাত অনেক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছে সেহেতু শোকানুষ্ঠানগুলো বছরের যে কোন সময়ে পালন করা হোক না কেন, এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে ঘটেছে।

শোকানুষ্ঠান পালনের সওয়াব

৪৫ নং প্রশ্ন : রেওয়ায়াতে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য শোক পালনের পুরস্কার হিসেবে অসংখ্য ও সীমাহীন সওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; এ ধরনের রেওয়ায়াত কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

উত্তর : শহীদদের নেতা আবু আবদিল্লাহ হোসাইন (আ.)- এর জন্য শোকানুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যম এবং এর জন্য অসংখ্য পুণ্য ও পুরস্কার রয়েছে। এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে, যেমন উসূলে কাফী গ্রন্থে অসংখ্য রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে, এর মধ্যে অনেক সহীহ হাদীসও রয়েছে।

এ বিষয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে :

১. এ ধরনের রেওয়ায়াতগুলোর কিছু সঠিক এবং কিছু মিথ্যা ও বানানো।

২. যে সকল রেওয়ায়াতে বিশেষ আমলের বিশেষ ফলাফলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই রেওয়ায়াতগুলোর অর্থ এই নয় যে, শুধু ঐ বিশেষ আমলের ফলে ঐ বিশেষ ফলাফল অর্জিত হবে; বরং এর অর্থ হলো ঐ আমল নির্দিষ্ট ফল লাভের আংশিক বা সহায়ক কারণ। কোন কিছু বাস্তব রূপ লাভের জন্য সার্বিক কার্যকরী কারণসমূহ বিদ্যমান থাকা এবং এর প্রতিবন্ধক সকল বাধা দূরীভূত হওয়া অপরিহার্য। এ দুই বিষয় (নিয়ামকসমূহের উপস্থিতি ও প্রতিবন্ধকের অনুপস্থিতি) এক সঙ্গে থাকলেই কেবল তা পরিপূর্ণ কারণ বলে বিবেচিত হবে। এ ধরনের পরিপূর্ণ কারণ উপস্থিত থাকলে তার কাঙ্ক্ষিত ফল অপরিহার্য। কখনই এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভব নয়। অথচ ‘আংশিক’ বা ‘সহায়ক কারণ’ কোন কিছু ঘটার একটি শর্ত মাত্র। যদি এ বিষয়টি বাস্তবায়নে কোন বাধা না থাকে তাহলে এই ঘটনাটি ঘটবে, কিন্তু যদি বাধা থাকে তাহলে এর বাস্তবায়ন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বস্তুজগতে ও প্রকৃতিতে কার্য- কারণের এ নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। যদি বলা হয়- আগুন কাঠ পোড়ানোর কার্যের কারণ, তবে তা এর ‘আংশিক’ বা

'সহায়ক কারণ' অর্থাৎ আগুন থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য শর্ত, যেমন অক্সিজেনের অভাব ও অন্যান্য বাধা (যেমন : ভিজা কাঠ) দূর না হলে কাঠ পোড়ানোর ঘটনাটি ঘটবে না।

এ কারণে যদি কেউ ভিজা কাঠ আগুনে নিক্ষেপ করে এবং কয়েক মিনিট পরেও কাঠে আগুন না জ্বলে তাহলে আমরা যেন কার্য- কারণতন্ত্রের

প্রতি সন্দেহ পোষণ না করি; বরং আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত, কেন আগুন জ্বলেনি? এ বিষয়টির অর্থাৎ কাঠে আগুন না জ্বলার অন্য কোন শর্ত রয়েছে কি? অথবা এর পেছনে অন্য কোন বাধা রয়েছে কি? তখন দেখতে পাব যে, ঘটনাটি ঘটার জন্য অন্যান্য শর্ত রয়েছে, যেমন : অক্সিজেনের উপস্থিতি, অন্যান্য বাধা, যেমন : কাঠ ভিজা না থাকা, কাঠের দাহ্যতা, কাঠে আগুন জ্বলার জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রার উপস্থিতি থাকা। যদি সম্ভাব্য সকল বাধা দূর করা হয় অর্থাৎ পরিপূর্ণ কারণ উপস্থিত থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবে কাঠ পুড়বে। এর বিপরীত হওয়ার অর্থ হলো এ বিষয়টির মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়া অর্থাৎ (সকল কারণ উপস্থিত ও উপযুক্ত পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও আগুন না জ্বললে তখনই কেবল বলা যাবে) আগুন কাঠ (কার্যের) পোড়ার কারণ নয়। এ ধরনের শর্তের প্রভাব পরিপূর্ণ কারণের অংশ হিসেবে এবং অন্যান্য শর্তের সাথে কাজ করে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ শর্তগুলো কী কী? কোন কিছুর উৎপত্তির জন্য তারা স্বতন্ত্রভাবে কী পরিমাণ ভূমিকা রাখে? এ ধরনের কার্য ও শর্তগুলোর প্রভাব সবক্ষেত্রে কি এক রকম? এটা সম্ভব কি যে, এই কার্যের কারণ এক ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করবে, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে ভিন্ন কোন ভূমিকা পালন করবে? সব কারণের কার্য সাধনের পদ্ধতি কী রকম? অন্য কোন উপাদান এতে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে, নাকি কারণ সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে? এ রকম অনেক প্রশ্ন রয়েছে; মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তার গভীরতা এখনও এ পর্যায়ে পৌঁছেনি যে, এ বিষয়গুলোর যথার্থ উত্তর দিতে সক্ষম। নবীদের দায়িত্ব হলো মানবজাতিকে এ ধরনের উপাদানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যা শুধু বুদ্ধিবৃত্তি বা পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়।

দর্শন ও ধর্মগ্রন্থের নির্ভরযোগ্য বক্তব্যের গভীর অনুসন্ধান করে যা পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা সম্ভব তা হলো কার্যকারণতন্ত্র কেবল বস্তুগত কার্যকারণ দিয়ে গঠিত হয় না; বরং বস্তুজগতের কারণ অবস্তু ও অধ্যাত্ম জগতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত।

৩. ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোক পালন ও ক্রন্দনের জন্য গুণগত এবং সংখ্যাগত দিক থেকে যে পুরস্কারের কথা ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে সেক্ষেত্রে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, তিনি আত্মত্যাগ, বীরত্ব, আল্লাহর ওপর নির্ভরতার এত বড় নমুনা দেখিয়েছেন যে, যা অবিস্মরণীয় ও বিরল; তিনি তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করেছেন। (তিনি এ আয়াতের প্রকৃত দৃষ্টান্ত : নিশ্চয় আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সেই আল্লাহর জন্য যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।[৩৭৩]) তিনি তাঁর নির্ধারিত পরিণতির (শাহাদাতের) প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন[৩৭৪]; তিনি আত্মসম্মানবোধ, আল্লাহর আনুগত্য, ইসলামের প্রতিরক্ষায় মহাত্যাগ, নিষ্ঠা, সাহসিকতা ও ধৈর্যের প্রতীক। তিনি আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে বিয়োগান্ত ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন; এসকল কর্মের বিনিময়ে তিনি এ পুরস্কারের যোগ্য। নিচের ঘটনাটির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে এটি পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

আল্লামা বাহরুল উলূম নিয়মিত সামেররাতে ইমাম হাসান আসকারী ও ইমাম হাদী (আ.)- এর মাযারে যিয়ারত করতে যেতেন। কোন একদিন যিয়ারতের জন্য যাওয়ার সময় পথিমধ্যে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য ক্রন্দন করার কারণে গুনাহ মাফ হওয়ার ফজিলত সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। একজন আরব অশ্বারোহী তাঁর সামনে এসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : ‘হে রাসূল (সা.)- এর বংশধর (সাইয়্যেদ)! আপনাকে বেশ চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে। যদি কোন জ্ঞানগত বিষয়ে প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন; হয়তো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব।’ বাহরুল উলূম বললেন : ‘এ চিন্তায় মগ্ন ছিলাম যে, কীভাবে আল্লাহ তা‘আলা শহীদদের নেতা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর যিয়ারতকারী ও তাঁর ক্রন্দনকারীদের জন্য এত বেশি পরিমাণ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন? উদাহরণস্বরূপ, কোন যিয়ারতকারী যিয়ারতের

উদ্দেশ্যে যখন পা বাড়ায় তখন তার প্রত্যেক পদক্ষেপের জন্য একটি ফরজ হজ ও একটি উমরা হজের সওয়াব তার আমলনামায় লেখা হয়। এক ফোঁটা অশ্রুর বিনিময়ে সমস্ত সগীরা ও কবীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'

ঐ অশ্বারোহী বললেন : "আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। আপনাকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি যাতে বিষয়টি আপনার নিকট সুস্পষ্ট হয়। কোন একজন বাদশা শিকার করার স্থানে তাঁর সঙ্গী-সাথিদের থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। অবশেষে সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জনহীন এক মরুভূমিতে উপনীত হলেন। দীর্ঘক্ষণ চলতে চলতে প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু ফিরে আসার পথ পেলেন না। এদিকে চরম ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত। নিজের জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়লেন। অবশেষে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রইলেন। যখন জ্ঞান ফিরল নিজেকে একটি তাঁবুতে দেখতে পেলেন। সেখানে একজন বৃদ্ধাকে তাঁর সন্তানের সাথে দেখলেন। তাঁদের একটি ছাগল ছিল যার দুধ দিয়ে তারা জীবিকা নির্বাহ করত; এছাড়া তাঁদের আর কিছু ছিল না। বৃদ্ধা ছাগলটিকে জবাই করে খাবার তৈরি করে বাদশার সামনে রাখলেন। বৃদ্ধা বাদশাকে চিনতেন না, শুধু মেহমানের সম্মানের জন্য তিনি এ কাজ করেছিলেন। বাদশা সেখানে রাত্রি যাপন করলেন এবং পরের দিন বৃদ্ধার সন্তানের সাহায্যে প্রাসাদে ফিরে আসলেন। প্রাসাদের লোকদের কাছে গত রাতের ঘটনা বর্ণনা করে বললেন : শিকার করতে গিয়ে সঙ্গীদের থেকে দূরে চলে গিয়েছিলাম, আবহাওয়াও প্রচণ্ড গরম ছিল। ফলে প্রচণ্ড ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে এক বৃদ্ধার তাঁবুতে দেখলাম। সে আমাকে চিনত না। কিন্তু তাদের একমাত্র মূলধন- যা দিয়ে তারা জীবিকা নির্বাহ করত- ছাগলটি আমার জন্য জবাই করল এবং খাদ্য তৈরি করল। এই ভালোবাসা ও সম্মানের বিনিময়ে আমার তাদেরকে কী উপহার দেওয়া উচিত? কিভাবে আমি তাদের প্রতিদান দেব?' একজন মন্ত্রী বললেন : 'তাদেরকে একশ' ছাগল দান করুন।' আরেকজন বললেন : 'একশ' ছাগল ও একশ' স্বর্ণমুদ্রা দান করুন।' অন্য একজন বললেন : 'অমুক ভূমিটি তাদেরকে দান করুন।' বাদশা এ সকল

সমাধান শুনে বললেন : ‘যা কিছুই দিই না কেন, তার বিনিময় বলে গণ্য হবে না। যদি রাজত্ব, রাজমুকুট এবং রাজসিংহাসনের সবকিছু দান করি তাহলেই হয়তো সমপরিমাণ দান করলাম। কেননা, তাদের যা কিছু ছিল সবই আমাকে দিয়েছে ও আমার প্রাণ রক্ষা করেছে; আমারও উচিত আমার সবই তাদেরকে দেওয়া।’

শহীদদের নেতা ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁর ধন- সম্পদ, সন্তান- সন্ততি, ভাই- বোন, মাথা ও শরীর যা কিছু ছিল সবকিছুই আল্লাহর রাস্তায় দান করেছেন। এখন আল্লাহ যদি তাঁদেরকে এত বেশি পুরস্কার দান করেন
তাহলে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছুই নেই। ” এ কথা শেষ হওয়া মাত্র বাহরুল উলূমের সামনে থেকে লোকটি উধাও হয়ে গেলেন।[৩৭৫]

আশুরার যিয়ারতের গুরুত্ব

৪৬ নং প্রশ্ন : আশুরার যিয়ারতের গুরুত্ব এবং এর শিক্ষণীয় বিষয় কী?

উত্তর : শহীদদের নেতা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর যিয়ারতের[৩৭৬] জন্য অনেক রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রসিদ্ধ আশুরার যিয়ারতের ক্ষেত্রে ইমাম জাফর সাদিক (আ.) এবং ইমাম বাকির (আ.)- এর নিকট থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বাকির (আ.) তাঁর একজন সাহাবী আলকামা ইবনে মুহাম্মাদ হাদরীকে এ যিয়ারতটি শিক্ষা দিয়েছেন। যেহেতু এ যিয়ারতটি ইসলামের প্রকৃত ধারার চিন্তার প্রকাশক, সত্য নীতি- আদর্শের ধারক এবং দিকনির্দেশক সেহেতু এতে আশ্চর্য রকমের শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। যেহেতু যিয়ারত বিষয়বস্তু এবং দিকনির্দেশনার দৃষ্টিতে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ও প্রভাবসম্পন্ন সেহেতু ইমামগণ তাঁদের সাহাবীদের যিয়ারত পড়ার ধরন শিক্ষা দিয়েছেন এবং এই গঠনমূলক কাজে বিশেষ দিকনির্দেশনা ও গুরুত্ব দান করেছেন।

যে সকল যিয়ারতনামা পবিত্র ইমামদের নিকট থেকে আমাদের নিকট পৌঁছেছে সেগুলোতে উচ্চতর শিক্ষা রয়েছে, যেমন : যিয়ারতে জামেয়ে কাবীরা, যিয়ারতে আশুরা, যিয়ারতে আলে-ইয়াসিন, যিয়ারতে নাহিয়ে

মুকাদ্দাসাহ। যিয়ারতে আশুরা ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত। ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে প্রকৃত ধারার ইসলামী চিন্তা, মৌলিক বিশ্বাস ও নীতি- আদর্শের প্রকাশে গঠনমূলক প্রভাবের কারণে এ যিয়ারতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ইসলাম থেকে বিচ্যুত বনি উমাইয়ার পথের সাথে প্রকৃত ইসলামের পার্থক্যের রেখা এ যিয়ারতে টেনে দেওয়া হয়েছে। এ যিয়ারত থেকে অর্জিত বিশেষ কিছু ফলাফল ও শিক্ষার বিষয় নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. পবিত্র আহলে বাইতের পরিবারের সাথে আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি ও তাঁদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক বৃদ্ধি করা : তাঁদের প্রতি ভালোবাসার কারণে যিয়ারতকারীরা তাঁদেরকে নিজেদের আদর্শ রূপে গ্রহণ করে ও তাদের চিন্তা, দর্শন ও কর্ম- পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাঁদের মতো হওয়ার চেষ্টা করে। যেভাবে যিয়ারতে আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, আমাদের জীবন ও মৃত্যু যেন তাঁদের জীবন- মৃত্যুর মতো হয়।

اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی محمد و آل محمد

‘হে আল্লাহ! আমার জীবনকে মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের জীবনের অনুরূপ কর এবং আমার মৃত্যুকে মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের মৃত্যুর মতো কর (তাঁদের ন্যায় মৃত্যু দান কর)।’

আহলে বাইত (আ.)- এর প্রতি এই ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা থেকে উৎসারিত; তাঁদের ঐশী রঙে রঙিন হওয়া এবং ¯ষ্টার সাথে সম্পর্কিত হওয়া থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য। এ কারণে তাঁদের যিয়ারত পছন্দনীয় ও কাঙ্ক্ষিত এবং নৈকট্য অর্জনের উৎস।[৩৭৭] এ কারণে যিয়ারতের একাংশে আমরা পড়ি :

اللهم انی اتقرب الیک بالموالاة لنبیک وال نبیک

‘হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নবী ও তাঁর পরিবারের বন্ধুত্বের উসিলায় আপনার নৈকট্য কামনা করছি।’

২. যিয়ারতকারীদের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদের মানসিকতা সৃষ্টি: এ যিয়ারতে আহলে বাইতের প্রতি যুলুমকারীদের প্রতি অভিশাপ, লানত দেওয়ার পুনরাবৃত্তির ফলে যিয়ারতকারীদের অন্যায়ের প্রতিবাদী হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। সত্যের অনুসারী ও আহলে বাইতের বন্ধুদের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ধর্মীয় ভিত্তিকে শক্তিশালী করে। ঈমান (আল্লাহর রাস্তায়) ভালোবাসা ও ঘৃণা ছাড়া অন্য কিছু কি?

هل الايمان الا الحب والبغض

প্রকৃত ঈমানদার অন্যায়-অবিচারের বিপরীতে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে না, সত্যের পক্ষ অবলম্বন করে ও এর সঙ্গী হয়।

يا ابا عبدالله انى سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم

‘হে আবা-আবদিল্লাহ! যে আপনার সাথে সন্ধি করে আমিও তার সাথে সন্ধি করি এবং যে আপনার সাথে যুদ্ধ করে আমিও তার সাথে যুদ্ধ করি।’

৩. বিচ্যুত পথ থেকে দূরে থাকা : এ যিয়ারতে অন্যায়-অত্যাচারের উৎসের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে :

فلعن الله امة اسست اساس الظلم و لعن الله امة دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التى رتبكم الله فيها

‘আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক উম্মতের ঐ সকল ব্যক্তির ওপর যারা যুলুম ও অত্যাচারের ভিত্তি স্থাপন করেছে ও আপনাদেরকে আল্লাহর দেওয়া পদ থেকে অপসারণ করেছে এবং আপনাদের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে।’

আশুরায় যে অন্যায়-অবিচার সংঘটিত হয়েছে, ইতিহাসের গভীরে এর উৎস রয়েছে। ইমাম হোসাইন (আ.)-এর প্রতি যুলুম, সার্বিক অন্যায়-অবিচারের জগতের বলয়ের একটি বলয় মাত্র যা খিলাফতের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতির মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।

৪. শিক্ষা গ্রহণ, হেদায়াতের আদর্শকে আদর্শ হিসেবে নির্ধারণ : যিয়ারতে বর্ণিত হয়েছে :

فاسئل الله الذى اكرمنى بمعرفتكم و معرفة اوليائكم ورزقنى البرائة من اعدائكم، ان يجعلنى معكم فى الدنيا و الآخرة و ان يثبت لى عندكم قدم صدق فى الدنيا و الآخرة

‘(হে নবীর আহলে বাইত!) আমি আল্লাহর কাছে কামনা করছি- যিনি আপনাদের ও আপনাদের বন্ধুদের সাথে পরিচিত করিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন এবং আপনাদের শত্রুদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার তাওফীক দান করেছেন- দুনিয়াতে ও আখেরাতে আপনাদের সাথে থাকার সৌভাগ্য দান করুন। আর তিনি যেন দুনিয়াতে ও আখেরাতে আপনাদের পথে (সকল ক্ষেত্রে) আমার পদক্ষেপকে দৃঢ় রাখুন।’[৩৭৮]

যিয়ারতকারী সত্যের জ্ঞান অর্জন ও অন্যায়কারীদের পরিচিতি লাভ করার পর তাদের কাছে থেকে দূরে সরে আসে। দৃঢ়তার সাথে পবিত্র আহলে বাইতের মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং তাঁদের নির্দেশ অনুসারে আমল করার শপথ নেয় এবং এর মাধ্যমে নিজেকে দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করে। হেদায়াতের আদর্শকে অর্থাৎ যাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত হয়েছেন তাঁদেরকে নিজের জীবনের আদর্শরূপে নির্ধারণ করে ও তাঁদের সাথে একই পথে পা বাড়াতে চায়।

৫. আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ ও শাহাদাত বরণ করার মনোবল বৃদ্ধির সংস্কৃতির প্রসার।

৬. পবিত্র আহলে বাইতের মতাদর্শ, পথ এবং উদ্দেশ্য উজ্জীবিতকরণ।

৪৭ নং প্রশ্ন : কেন ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শত্রুদের প্রতি লানত ও অভিশাপ দেন? এ কাজটি এক ধরনের বর্বর আচরণ ও নেতিবাচক ধারণা করা নয় কি? এটি এ ধরনের নেতিবাচক অনুভূতি যা সভ্য সমাজের মানুষের প্রবণতার সাথে মিলে না। এখন আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করি যেখানে সকল মানুষের সাথে হাসিমুখে আচরণ করা উচিত। এখন জীবনের আনন্দ ও সন্ধির কথা বলা উচিত। লানত, অভিশাপ, সম্পর্ক ছিন্ন করা, কারো কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার প্রবণতা এক ধরনের সহিংসতা; এ সংস্কৃতি এক হাজার ও চারশ’ বছর পূর্বের এক সংস্কৃতি। যে যুগে ইমাম হোসাইন (আ.)- কে শহীদ করা হয়েছে সে সময়ের প্রচলিত রীতি

বর্তমান সময়ে প্রযোজ্য নয়। কারণ, আজকের সভ্য সমাজ, এমনকি সাধারণ জনগণও এ ধরনের আচরণকে অপছন্দ করে। কেন আপনারা এরূপ নেতিবাচক মতে বিশ্বাসী?!

উত্তর : মানুষের প্রকৃতি একদিকে যেমন কেবল জ্ঞান ও পরিচিতি অর্জনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সৃষ্টি হয় নি; তেমনি শুধু ইতিবাচক আবেগ- অনুভূতি নিয়েও সৃষ্টি হয় নি। মানুষ এমন এক সৃষ্টি যার ইতিবাচক অনুভূতি যেমন রয়েছে তেমনি নেতিবাচক অনুভূতিও রয়েছে। যেভাবে তার মধ্যে আনন্দ ও উৎফুল্লতা রয়েছে তেমনি দুঃখ ও বেদনাও উপস্থিত। আল্লাহ্ আমাদেরকে এ রকম দু'টি বিপরীত অনুভূতির সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন।

কোন মানুষই দুঃখ ও আনন্দ ছাড়া জীবন- যাপন করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে হাসি ও কান্না এ দুই বৈশিষ্ট্য দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু হাসি এবং কান্না তার স্ব- স্থানে হওয়া উচিত। আল্লাহ্ প্রদত্ত এ বিশেষ ক্ষমতার ব্যবহার তার যথাস্থানে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আল্লাহ্ তা'আলার মানুষকে ক্রন্দন করার ক্ষমতা দেওয়ার কারণ হলো তার উচিত উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্রন্দন করা। তবে ঐ ক্ষেত্রটিকে আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। তা না হলে ক্রন্দন করার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে লোপ পাবে। এখন প্রশ্ন হলো আল্লাহ্ তা'আলা কেন আমাদের মধ্যে এ অনুভূতিকে সৃষ্টি করেছেন যার কারণে দুঃখণ্ডমর্মপীড়ার সৃষ্টি হলে চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে?

এটি সুস্পষ্ট যে, মানুষের জীবনে ক্রন্দনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আল্লাহর জন্য ক্রন্দন করা- তা শাস্তির ভয়ে হোক অথবা আল্লাহর সাক্ষাতের আগ্রহে হোক, তা মানুষের পরিপূর্ণতায় পৌঁছার ক্ষেত্রে বিশেষ

ভূমিকা পালন করে। তাই যখন মানুষের মন বিগলিত হয় তখন সে ক্রন্দন করে। মানুষ যাকে পছন্দ করে ও ভালোবাসে তাদের মুসিবত ও দুঃখণ্ডকষ্টে সমব্যথী হয়। এ বিষয়টি হচ্ছে মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য যে, যার জন্য তার মনে দয়া থাকে তার দুঃখে সে ক্রন্দন করে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। এর ফলে যারা আমাদের উপকার ও কল্যাণ করেছে (অথবা যাঁদের পূর্ণতা রয়েছে) তাদের প্রতি আমরা আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ

করি। অন্যের প্রতি আমাদের এ ভালোবাসা হতে পারে বস্তুগত অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা আবেগ-অনুভূতির পূর্ণতার কারণে।

মানুষ যখনই কোন পূর্ণতা বা এর অধিকারী কাউকে খুঁজে পায় তখনই তার প্রতি তার ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও মানুষের ভালোবাসার বিপরীতে ঘৃণা ও শত্রুতারও অস্তিত্ব রয়েছে। যেমনিভাবে মানুষের প্রকৃতি হলো, যদি কেউ তার উপকার করে তাহলে তার প্রতি ভালোবাসার সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনিভাবে কেউ তার ক্ষতি করলে সে তার শত্রু হয়ে যায়।

তবে মুমিন বান্দার নিকট দুনিয়া বা বস্তুগত ক্ষতির কোন গুরুত্ব নেই। কারণ, প্রকৃতপক্ষে তার নিকট দুনিয়ারই কোন মূল্য নেই। কিন্তু যে তার ধর্মের শত্রু এবং তার নিকট থেকে তার চিরকালীন সৌভাগ্য অর্থাৎ পরকালকে ছিনিয়ে নিতে চায়, সে শত্রুকে কখনই উপেক্ষা করা যায় না। কোরআন এরূপ এক শত্রুর বর্ণনা দিয়ে বলেছে :

(إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا)

'নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব, তোমরা তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য কর।'[৩৭৯]

যদি আল্লাহর বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত হয় তাহলে আল্লাহর শত্রুদের সাথে শত্রুতাও করা উচিত। এই বিষয়টি মানুষের ফিতরাতের অংশ ও মানবীয় পূর্ণতা ও সৌভাগ্যের কারণ। যদি আল্লাহর শত্রুর সাথে শত্রুতা করা না হয় তাহলে ক্রমে ক্রমে তাদের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হবে। এক সাথে বসবাস করার ফলে তাদের আচরণ তার নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হবে এবং তাদের চিন্তা-বিশ্বাস দ্বারা সে প্রভাবিত হবে এবং সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ঐ ব্যক্তি আরেকটা শয়তানে রূপান্তরিত হবে।

অন্য ভাষায়, শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও তার সাথে শত্রুতা তার ক্ষতি থেকে রক্ষাকবচ ও তার ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাস্বরূপ। মানুষের শরীরের যেভাবে উপকারী উপাদানকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা রয়েছে তেমনিভাবে তার প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ও বিকর্ষণ করার ক্ষমতাও রয়েছে যা তাকে ক্ষতিকর উপাদান ও রোগ- জীবাণু থেকে রক্ষা করে। এ প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা রোগ- জীবাণুর সাথে যুদ্ধ করে এদেরকে ধ্বংস করে; রক্তের শ্বেত কণিকার কাজ এরকমই। যদি

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়, তাহলে জীবাণুগুলো ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হয়ে শরীরকে অসুস্থ করে ফেলবে, এমনকি এর ফলে সে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারে।

যদি মনে করি, শরীরে জীবাণু প্রবেশে কোন সমস্যা নেই, তাই জীবাণুকে আমরা স্বাগত জানাই এবং বলি, 'তোমরা আমাদের অতিথি, তোমাদের সম্মান করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।' এ অবস্থায় কি শরীর ঠিক থাকবে? নাকি অবশ্যই জীবাণুকে ধ্বংস করা উচিত। এটি হচ্ছে আল্লাহর কাজের পদ্ধতি। এটি আল্লাহর কর্মের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার সাথে সম্পর্কিত। তিনি প্রত্যেক জীবিত বস্তুকে দুই ধরনের ব্যবস্থা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। একটি আকর্ষণ ও গ্রহণ, অপরটি বিকর্ষণ ও বর্জন। যেভাবে প্রত্যেক জীবন্ত সত্তার বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণতার জন্য আবশ্যক উপাদানের প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি এর দেহ থেকে ক্ষতিকর বিষাক্ত উপাদান নিষ্কাষণ ও বর্জনেরও প্রয়োজন রয়েছে। যদি মানুষ বিষাক্ত উপাদানকে বর্জন না করে তাহলে তার জীবন অব্যাহত থাকবে না।

জীবিত যে কোন বস্তুর প্রতিরক্ষামূলক ক্ষমতা রয়েছে। এ ক্ষমতা পশু ও মানুষের মধ্যে একই ভূমিকা পালন করে। মানুষের দেহের মতো তার আত্মাতেও এ ধরনের ক্ষমতা রয়েছে। যারা আমাদের জন্য উপকারী তাদেরকে ভালোবাসা ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করার জন্য এক ধরনের আত্মিক আকর্ষণ করার ক্ষমতা থাকা অত্যাবশ্যক যাতে তাদের নিকটবর্তী হয়ে তাদের নিকট থেকে জ্ঞান, পূর্ণতা, আদব- কায়দা ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন করতে পারি।

কেন মানুষ তার পছন্দের মানুষকে ভালোবাসে? কারণ, যখন তাদের নিকটবর্তী হয় তখন তাদের থেকে উপকৃত হয়। যেহেতু যাঁরা সৎ ও মহান তাঁরা মানবিক পূর্ণতার উৎস এবং সমাজের নৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন সেহেতু তাঁদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা উচিত। এর বিপরীতে বাস্তবে যারা সমাজ ধ্বংসের কারণ, তাদের সাথে শত্রুতা করা উচিত।

(قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَه)

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। যখন তারা তাদের জাতিকে বলেছিল : 'তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর তাদের

সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের সাথে আমাদের চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে; যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহর ওপর ঈমান আন।[৩৮০]’’

কোরআন বর্ণনা করেছে : তোমরা ইবরাহীম ও তার সাহাবীদেরকে আদর্শ হিসেবে অনুসরণ কর। আমরা জানি যে, ইসলামী সংস্কৃতিতে ইবরাহীম (আ.)- এর অবস্থান অনেক ঊর্ধ্বে। রাসূল (সা.)ও বলেছেন যে, তিনি ইবরাহীম (আ.)- এর পথের অনুসারী। ‘ইসলাম’ এমন একটি নাম যা হযরত ইবরাহীম (আ.) এ ধর্মের জন্য মনোনীত করেছেন।

هو سماكم المسلمين من قبل

‘তিনি পূর্বে তোমাদেরকে মুসলিম নামকরণ করেছেন।’

আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম (আ.)- কে আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। ইবরাহীম (আ.)- এর ভূমিকা কী ছিল?

অগ্নি উপাসকরা যখন ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে শত্রুতা করা শুরু করল এবং তাঁদেরকে তাঁদের অঞ্চল থেকে বের করে দিল তখন তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন : ‘তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।’ এভাবে তাদের সাথে সম্পর্কোচ্ছেদ করলেন। এটা করেও তিনি ক্ষান্ত হন নি; বরং তাদেরকে বলেছেন : ‘কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা বজায় থাকবে যদি না তোমরা অবিশ্বাস ত্যাগ কর।’

শুধু আল্লাহর বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব করাই যথেষ্ট নয়। যদি আল্লাহর শত্রুদের সাথে শত্রুতা না থাকে তাহলে আল্লাহর সাথেও বন্ধুত্ব থাকবে না। যদি শরীরের রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে খাদ্য ও শক্তি গ্রহণ করার ক্ষমতাও ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের আকর্ষণ- বিকর্ষণের ক্ষেত্র সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা অপরিহার্য। দুঃখের সাথে বলতে হয় কিছু ক্ষেত্রে এ বিষয়টি নিয়ে ভুলের সৃষ্টি হয়। যা কিছুকে আকর্ষণ ও গ্রহণ করা উচিত বাস্তবে তা বিকর্ষণ ও বর্জন করি। যেমন অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে যদি কেউ ভুল বলে ও বোঝে, এর ফলে সঠিক পথ থেকে তার বিচ্যুতি

ঘটে; কিন্তু পরে এ কারণে সে অনুতপ্ত হয় কিংবা যদি কারো নিকট সত্যকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার পর সে তার ভুল স্বীকার করে তাহলে এ দুই ধরনের ব্যক্তির সাথে শত্রুতা করা উচিত নয়। শুধু গুনাহ করার কারণে কোন ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করা উচিত নয়; বরং তাকে সংশোধন করা উচিত। এ ধরনের ব্যক্তিরা হচ্ছে অসুস্থ; তাদের সেবা দেওয়া উচিত। এটি শত্রুতা প্রকাশ করার ক্ষেত্র ও স্থান নয়। কিন্তু যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ্যে গুনাহ্ করে সমাজে তার প্রচলন ঘটাতে চায় সেক্ষেত্রে এ ধরনের কাজকে বিশ্বাসঘাতকতা বলা যায় এবং তার সাথে শত্রুতা করা উচিত।

আমরা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সাথে সম্পর্কিত বরকত (শিক্ষা ও আদর্শ) থেকে উপকৃত হতে পারব না যতক্ষণ না ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শত্রুর প্রতি লানত করব, এরপর ইমাম হোসাইনের উদ্দেশে সালাম পাঠাব। এ কারণেই কোরআনে রাসূল (সা.)- এর প্রকৃত সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় প্র ম অংশে বলা হয়েছে : (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ) ‘কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর।’[৩৮১]

এরপর বলা হয়েছে : (رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) ‘তাদের নিজেদের (মুমিন) মধ্যে সহৃদয়।’[৩৮২]

অতএব, সালামের সাথে অভিসম্পাত ও লানত অবশ্যই থাকতে হবে।[৩৮৩] আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিদের অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্বকে মেনে নেওয়ার সাথে ইসলামের শত্রুদের প্রতি ঘৃণা ও বিকর্ষণ থাকতে হবে।

ক্রন্দন ও শোক প্রকাশ

৪৮ নং প্রশ্ন : হোসাইনী সংস্কৃতিতে ক্রন্দন করার মর্যাদা কী পরিমাণ যে, এর ওপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে?

উত্তর : প্রথমে এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করতে হবে যে, এ অস্তিত্বজগতে অনেক রহস্য রয়েছে এবং মানুষ এ সম্পর্কে জানে না। কিছুসংখ্যক ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে এ জগতের

বাহ্যিক দিকের প্রতিই শুধু লক্ষ্য করে এবং কখনই চিন্তা করে না যে, এর বাহ্যিক দিকের বাইরেও গভীর গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান বিষয় লুকিয়ে রয়েছে। ক্রন্দন এরকমই একটি বিষয়। অনেকে মনে করে যে, ক্রন্দন এমন একটি বিষয় যা শুধু মানুষের দুঃখণ্ডকষ্ট ও অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত। অনেকে ক্রন্দনকে উপহাস করে ও একে মানুষের প্রতিক্রিয়াশীলতার চিহ্ন হিসেবে মনে করে। আরেক শ্রেণি সমালোচনার সাথে বলে : 'ক্রন্দন প্রাণহীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে আসে না। অথচ আজকের পৃথিবী প্রাণচাঞ্চল্য, উৎসাহ- উদ্দীপনা ও খুশির পৃথিবী। বর্তমান মানুষ আনন্দ চায়, চোখের পানি চায় না।'

আশা করি, এ বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংক্ষেপে আলোচনার মাধ্যমে ক্রন্দনের বাস্তবতা ও মর্যাদা সম্পর্কে শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার হবে।

ক. ক্রন্দনের শ্রেণি

ক্রন্দনের বিভিন্ন শ্রেণি ও ধরন রয়েছে; এর মধ্য হতে গুরুত্বপূর্ণ ধরনগুলো নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হলো :

১. ভয়ের ক্রন্দন : এ ধরনের ক্রন্দন সাধারণত শিশুরা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে শিশুরা এর মাধ্যমে তাদের ভয়ের প্রকাশ ঘটায়।

২. সহানুভূতি পাওয়ার ক্রন্দন : এ ধরনের ক্রন্দন দুই শ্রেণির : প্রথমত, প্রকৃতিগত যা অত্যন্ত প্রভাবসম্পন্ন ও উদ্দীপক, যেমন শিশু ও বাচ্চাদের পিতা- মাতা হারানোর ক্রন্দন। দ্বিতীয়ত, কৃত্রিম অর্থাৎ বাহ্যিক কান্নার মাধ্যমে অন্যকে বিশ্বাস করাতে চায় যে, তার মনে দুঃখ ও কষ্ট রয়েছে।

৩. দুঃখ ও শোকের ক্রন্দন : এই ক্রন্দন তার অন্তর জগতের শোকের ছায়ার প্রতিফলনস্বরূপ। এ ধরনের ক্রন্দনের ভালো দিক হচ্ছে তার অন্তর ভারাক্রান্তা অবস্থা থেকে মুক্তি পায়। এ কারণেই এর পরে মানুষ প্রশান্তি অনুভব করে।

৪. আনন্দের ক্রন্দন : এ ধরনের ক্রন্দন নরম মন থেকে উৎপত্তি ঘটে যা কোন বিষয়ে দীর্ঘ সময়ের নিরাশা ও হতাশার পর প্রকাশ পায়।

৫. তাকওয়া ও আত্মিক উন্নয়নের ক্রন্দন : এ ধরনের ক্রন্দন বিশেষ করে ঈমানদার নারী- পুরুষদের আল্লাহর নিকট নিজের অক্ষমতা প্রকাশ, তওবা ও অনুশোচনা, ভারাক্রান্ত অবস্থা ও প্রেমের প্রকাশ। এ ধরনের ক্রন্দন অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও আল্লাহর নৈকট্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

তাকওয়া ও আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনের অশ্রু যদি অন্তরের অন্তস্থল থেকে হয় ও তা মানুষের গাল বেয়ে গড়িয়ে পরে তাহলে সে আল্লাহর নেক দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পেরেছে এবং তার মধ্যে তাঁর রহমত লাভের মর্যাদাকর ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে।

‘যদি মেঘ ক্রন্দন না করে তবে ঘাস কখন হাসে

যদি বাচ্চা ক্রন্দন না করে তবে মায়ের দুধ কখন আসে

এক দিনের বাচ্চাও জানে এ পদ্ধতি

ক্রন্দন করবে যেন এসে পৌঁছায় ধাত্রী বন্ধু

তুমি জান না যে, ধাত্রীদের ধাত্রী (আল্লাহ)

কম সময়ই ক্রন্দন ব্যতীত তার দুধ বিনামূল্যে দান করে

বললেন : ‘সুতরাং তারা যেন অধিক ক্রন্দন করে’ বাক্যটি মনোযোগ দিয়ে শোন

(যদি অধিক ক্রন্দন কর) ফলে সৃষ্টিকর্তা দয়ার দুধ দেবেন ঢেলে।’[৩৮৪]

এই ক্রন্দনের জন্য বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হয়েছে :

৫- ১. গুনাহ থেকে অনুশোচনা : কিছু ক্ষেত্রে মুমিনদের ক্রন্দন যে সকল গুনাহ করেছে সেগুলো থেকে অনুশোচনার কারণে হয়ে থাকে। এ ধরনের অশ্রুপাতের ফলে মানুষ তার মন্দ কাজে অনুশোচিত হয়, এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। যেভাবে ইমাম আলী (আ.) বলেন : ‘সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে প্রভুর আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করল ও তার গুনাহসমূহের কারণে ক্রন্দন করল।’[৩৮৫]

যদি দয়ার কাবার নিকট ঝাঁপিয়ে পড়তে না পার

দুদর্শা থেকে রক্ষাকারীর (আল্লাহর) নিকট দুর্দশা বর্ণনা কর।

শক্তিশালী ক্রন্দন ও বিলাপ হচ্ছে মূলধন

ধাত্রীমাতার (আল্লাহর) সর্বজনীন রহমত অধিকতর শক্তিশালী

ধাত্রীমাতা ও মাতা অজুহাত খুঁজতে থাকে

কখন তাদের শিশু ক্রন্দন করবে।

সে- ই তোমাদের চাহিদার শিশুকে সৃষ্টি করেছে

যাতে ঐ শিশু ক্রন্দন করলে তাঁর (করুণার) দুধের হয় সৃষ্টি।

বলল : আল্লাহকে ডাক, বিলাপহীন হয়ো না

যাতে তার (আল্লাহর) দয়ার দুধ উথলে ওঠে।[৩৮৬]

৫- ২. আল্লাহর দিকে চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতার অনুভূতি : আল্লাহর বুদ্ধিমান প্রেমিকরা সবসময় নিজেকে বিপদের মধ্যে দেখতে পায় ও চিন্তায় থাকে ভবিষ্যতে কী হবে? কীভাবে তারা তাদের উদ্দেশ্যে পৌঁছবে? কী অবস্থায় প্রভুর সামনে হাজির হবে? চিরন্তন উপাস্যের কাছে পৌঁছানোর জন্য নাফস ও শয়তানের প্রতারণা থেকে মুক্ত রয়েছে কি? আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে এ ধরনের অস্পষ্ট অনুভূতির ফলে তারা ক্রন্দন করে? ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এ কারণে মুনাজাতের অংশবিশেষে এ বিষয়টি বর্ণনা করেন :

و ما لی لا ابکی و لا ادری إلی ما یکونو مصری و أری نفسی تخادعنی و ایامی تخاتلنی، و قد خفقت عند رأسی اجنحه الموت ، فمالی لا أبکی، أبکی لخروج نفسی، أبکی لظلمه قبری ابکی لضیق لحدی...

‘আমার কী হয়েছে যে, আমি ক্রন্দন করছি না, যখন আমি জানি না আমার চলার পথ কোন্ দিকে; আমি দেখছি কুপ্রবৃত্তি আমাকে ধোঁকা দেয় এবং আমার (জীবনের) দিনগুলো আমার সাথে প্রতারণা করে এমন অবস্থায় যখন মাথার ওপর মৃত্যুর ডানা আমাকে দিশাহারা করে দিয়েছে। আমার কী হয়েছে যে, তারপরও আমি ক্রন্দন করছি না, আমি ক্রন্দন করি আমার দেহ থেকে আত্মা আলাদা হওয়ার জন্য, ক্রন্দন করি কবরের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার জন্য, আমি ক্রন্দন করি আমার কবরের সংকীর্ণতার জন্য...’[৩৮৭]

৫- ৩. উৎসাহ- উদ্দীপনা ও ভালোবাসার ক্রন্দন : প্রভুর প্রকৃত প্রেমিকরা কেবল তাঁকেই তাদের প্রেমিক মনে করে। কিছু ক্ষেত্রে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার উৎসাহে ক্রন্দন করে, যখন কেউ বন্ধু ও

প্রেমাস্পদের নিকট থেকে দূরে থাকা ও বিরহের কারণে উদ্বেলিত থাকে। এ ধরনের ক্রন্দন বন্ধু ও কাঙ্ক্ষিত পবিত্র সত্তা থেকে দূরে থাকা ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ঘটে থাকে।

বিচ্ছেদের দুঃখে আমার দু'চোখ বেয়ে রক্ত অশ্রু ঝরিয়েছি

কী করব, এগুলো (আল্লাহর সাথে) পরিচিতির কল্যাণের ফুল।[৩৮৮]

৫-৪. আল্লাহর মর্যাদার ভয়ে ক্রন্দন : এ ভীতি মানুষের জ্ঞান থেকে উৎসারিত ও মহান আল্লাহর পরিচিতি ও মর্যাদাকে অনুধাবনের কারণে তাদের মনে এরূপ ভয়ের সৃষ্টি হয়। এ ভীতির পর্যায় মহান আল্লাহর মর্যাদাকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে খোদাকাঙ্ক্ষী নর-নারীদের অবস্থার ওপর নির্ভর করে; যে আল্লাহর মর্যাদাকে যতটা চেনে তার মধ্যে তাঁর ভয়ে ক্রন্দন তত তীব্র হয়।

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেন : 'কিয়ামতের দিনে প্রত্যেক চোখ ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকবে কেবল ঐ চোখ ছাড়া যে চোখ আল্লাহর নিষিদ্ধ কর্ম থেকে নিজেকে দূরে রাখে, যে চোখ আল্লাহর আনুগত্যের কারণে রাত্রি জাগরণ করে এবং যে চোখ গভীর রাতে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে।'[৩৮৯]

৫-৫. প্রকৃত বন্ধুদেরকে হারানোর কারণে ক্রন্দন : যেহেতু কোরআন ও রেওয়ায়াতের দৃষ্টিতে আল্লাহর প্রিয় বন্ধুরাই হচ্ছে প্রকৃত বন্ধু, তাই তাদের প্রতি ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা।[৩৯০] পৃথিবী থেকে এ ধরনের বন্ধুদের বিদায়ের কারণে ঐশী মানবরা ক্রন্দন করে থাকেন। তাঁদের এ ক্রন্দন প্রকৃতপক্ষে চিরন্তন প্রেমিক আল্লাহ ও তাঁর পরের পর্যায়ে পরিপূর্ণ মানবদের থেকে দূরে থাকার কারণে ঘটে থাকে।

এ মুহব্বত ও ভালোবাসা অন্যান্য মুহব্বত ও ভালোবাসা থেকে ভিন্ন;

আল্লাহর প্রেমিকদের প্রতি ভালোবাসা ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা অভিন্ন।

ইমামদের একে অপরের জন্য ক্রন্দন, স্বীয় চাচা হামযা ও স্ত্রী খাদিজা (আ.).এর মৃত্যুতে রাসূল (সা.)- এর ক্রন্দন এ ধরনেরই ছিল।

৫-৬. সত্যপন্থীদের বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতার গুণাবলি নিজের মধ্যে না থাকার কারণে ক্রন্দন : যখন খোদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা একজন পরিপূর্ণ মানুষের পূর্ণতা ও গুণাবলি নিয়ে চিন্তা করে এবং নিজের

মধ্যে এর অভাব লক্ষ্য করে তখন তারা ক্রন্দন করে। এর ফলে তারা ঐ পূর্ণতা ও বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনের জন্য চেষ্টা করে।

পানশালার কোনায় ক্রন্দন করলাম ও লজ্জিত হলাম

আমার নিজের অর্জনের (ভুল ও অন্যায়ের) কারণে লজ্জিত হলাম।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.)- এর দোয়ার অংশ এ ধরনের ক্রন্দনের কারণ নির্দেশ করে :

واعنی بالبکاء الی نفسی فقد افنیت با التسویف و الآمال عمری

'(হে আল্লাহ) আমাকে আমার নিজের জন্য ক্রন্দনে সাহায্য কর, যখন তওবাকে পিছিয়ে দিয়ে (গুনাহ করে পরে তাওবা করব এ ভেবে) ও (দুনিয়াকে পাওয়ার) দীর্ঘ আশা করে আমার জীবনকে ধ্বংস করেছি।'[৩৯১]

খ. মূল্যবোধের ক্রন্দন : যদিও অন্য ধরনের ক্রন্দনের ক্ষেত্রে কোন নিষেধ নেই, কিন্তু কোরআন ও রেওয়ায়াতের শিক্ষায় যে ক্রন্দনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহর ভয়ে ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনের জন্য ক্রন্দন। এ ক্রন্দনের দু'টি দিক রয়েছে। যার এক দিকে অন্তর্জ্বালা অপর দিকে শান্তি, আনন্দ, খুশি ও সম্মান[৩৯২] এবং এক দিকে দুঃখবোধ, অন্তরের অস্থিরতা, অন্যদিকে খুশি, পবিত্র অনুভূতি ও প্রত্যক্ষ দর্শনের আনন্দ।[৩৯৩]

দুঃখে খুশি হও; কেননা, দুঃখ (প্রেমিকের সাথে) সাক্ষাতের ফাঁদ।

এ পথেই ঘটে নিম্ন থেকে উচ্চে আরোহন।

কারো দুঃখ হচ্ছে রত্ন এবং তোমার দুঃখ হচ্ছে খনির মতো।

কিন্তু কে যে এই খনিতে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে।[৩৯৪]

আত্মিক ক্রন্দনের এক দিকে ক্রন্দন হলেও এর অপর দিক হলো উপাস্যের নিকটবর্তী হওয়া।[৩৯৫]

'হে হাফিজ! যদি তাঁর সাথে সাক্ষাতের রত্ন পেতে চাও

তবে চোখের সাগরকে পানি দিয়ে ভরে তাতে ডুব দাও।'

কোরআন ও রেওয়ায়াতের দৃষ্টিতে এ ধরনের ক্রন্দন নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন :

প্রথমত, এ ক্রন্দনের উৎস হলো বোধশক্তি ও অনুধাবন ক্ষমতা অর্থাৎ আত্মিক বিকাশের ক্রন্দনের উৎপত্তি ঘটে অনুধাবন ক্ষমতা থেকে। এটা অনুকরণ ও ধারণা থেকে সৃষ্টি হয় না।

মুমিনের ক্রন্দন অত্যধিক মূর্খ, অন্ধ অনুকরণকারী ও সন্দেহপরায়ণ ব্যক্তির ক্রন্দনের মতো নয়।

তুমি এ (মুমিনের) ক্রন্দনের সাথে ঐ (মূর্খের) ক্রন্দনের তুলনা কর না।

এ ক্রন্দনের থেকে ঐ ক্রন্দনের পথের দূরত্ব অনেক।[৩৯৬]

কোরআনে বর্ণিত হয়েছে : "বল : 'তোমরা কোরআনে বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে যখন তাদের নিকট কোরআন পাঠ করা হয় তাখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।' তারা বলে : 'আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবেই'।"[৩৯৭]

এ আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি উচ্চতর জ্ঞান ও অনুধাবনক্ষমতার অধিকারী হয় তাহলে কোরআনের আয়াত শ্রবণ করে এর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এমতাবস্থায় প্রভুর সামনে উপস্থিত হয়ে স্বীয় মস্তককে মাটিতে অবনত করে এবং অন্তর্জ¡ালা সহকারে ক্রন্দন করে এ আশাতে যে, তার এ অশ্রু আল্লাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ও আল্লাহর রহমত লাভ করবে। সুতরাং যাদের অন্তর্জ্বালা ও চোখের অশ্রু নেই তারা এর অর্থ অনুধাবন করে না।

'পানি বায়ুমণ্ডলে স্থির থাকে না

কারণ, ঐ বায়ুম- ল তৃষ্ণার্ত ও পানি শোষণকারী না।'[৩৯৮]

উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি গুনাহের প্রকৃত রূপ ও অবস্থা সম্পর্কে জানে না তার অন্তরে তা কী ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলে যে, সে ব্যক্তি সহজেই গুনাহ করে। এই গোনাহের ফলে তার হৃদয় কঠোর হয়ে যায় এবং এরূপ কঠোর হৃদয় কখনই ¯ষ্টার থেকে দূরে থাকার ও গোনাহের অনুশোচনার অন্তর্জ্বালা ও কষ্ট অনুভব করে না। ফলে এ ব্যক্তি কোন দিন ক্রন্দনও করে না। এ কারণে রেওয়ায়াতে এসেছে যে, অশ্রুশূন্য চোখ নির্দয় ও নিষ্ঠুর হৃদয়ের প্রমাণ বহন করে। [৩৯৯]

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ ধরনের পরিণতির মূলে রয়েছে অজ্ঞতা ও মূর্খতা।

'যতক্ষণ পর্যন্ত অবাধ্য গুনাহগার নিজের সম্পর্কে জানে না

কিভাবে জানবে তার চোখের পানি কোথায় বর্ষিত হতে হবে?'[৪০০]

দ্বিতীয়ত, ক্রন্দন নাফেসর বিরুদ্ধে জিহাদের মূলধন। মানুষের অভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অস্ত্র অনুশোচনা ও ক্রন্দন। যেমনভাবে হযরত আলী (আ.) দোয়ায়ে কুমাইল- এ বলেছেন :

و سلاحه البكاء 'তার অস্ত্র হলো ক্রন্দন।'

আল্লাহ তা'আলা এই কার্যকরী অস্ত্র সবাইকে দান করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো এর প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে আমরা জানি না।

তৃতীয়ত, ঐশী নেয়ামত ও অনুগ্রহের ক্রন্দন। আল্লাহ তা'আলা কোরআনে বলেছেন : 'এরা তারাই, নবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, আদমের বংশ হতে ও যাদেরকে আমরা নূহের সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলের বংশধর ও যাদের আমরা পথপ্রদর্শন ও মনোনীত করেছিলাম; যখন তাদের নিকট দয়াময় আল্লাহর কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তারা ক্রন্দনরত অবস্থায় সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।'[৪০১]

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে অন্তর্জ্বালা ও ক্রন্দনকে রাসূলদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করেছেন যাঁরা সত্যিকারের খোদাপ্রেমিকদের শিক্ষা দানকারী।

অন্তর্জ্বালা, প্রবহমান অশ্রু, শেষ রাতের আহ ও আফসোস।

এগুলো সবই তোমার দয়া ও অনুগ্রহেই হয়েছে।[৪০২]

চতুর্থত : ক্রন্দন, বান্দার ঐশী হওয়ার চিহ্ন

আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'এবং যখন তারা এই রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বাণী শ্রবণ করে তখন যতটুকু সত্য উপলব্ধি করেছে তার কারণে তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে।'[৪০৩]

পঞ্চমত : ক্রন্দনকারীর অন্তর আনন্দিত ও খুশি

মূল্যবোধের ক্রন্দন আল্লাহর গোপন রহস্যের অন্তর্ভুক্ত যার একদিকে রয়েছে পোড়ানো ও আগুন, কিন্তু অপর দিকে রয়েছে আনন্দ, খুশি, উপভোগ ও আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ।[৪০৪]

(দগ্ধ হৃদয়) আগুনকে পানির রূপ দান করেছে

আগুনের মধ্যে থেকে ঝরনা প্রবাহিত করেছে।[৪০৫]

এক পাশে দুঃখ, মানসিক অস্থিরতা ও অশ্রুর বর্ষণ এবং অপর পাশে অন্তরের খুশি।

'দুঃখের ধুলা মুছে যাবে, তোমার অবস্থার উন্নতি হবে হাফিজ

এ পথে অশ্রু ঝরাতে কার্পণ্য কর না।'

গ. রেওয়ায়াতে মূল্যবেধের ক্রন্দন : মূল্যবোধের ক্রন্দন যা আত্মিক উৎকর্ষ, তাকওয়া ও মানবিক উন্নতির ক্রন্দন নামে অভিহিত তার মূল্য বিভিন্ন রেওয়ায়াত, বিশেষ করে নিম্নলিখিত হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট হয় :

১. ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : 'বান্দার জন্য তার প্রভূর সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থা হলো ক্রন্দনের সাথে সিজদারত অবস্থা।'[৪০৬]

২. ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় অশ্রুর ফোঁটা হলো যা আল্লাহর ভয়ে রাতের অন্ধকারে ঝরে এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কিছু চায় না।'[৪০৭]

৩. 'মাফাতিহুল জিনান'- এ বিশ্বাসীদের নেতা আলী (আ.)- এর যিয়ারতের শেষে আমরা এ দোয়াটি পড়ি :

وأعوذ بک من قلب لا يخشع و من عين لا تدمع

'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন এক অন্তর থেকে যা কখনই ভয় করে না এবং এমন চোখ থেকে যা কখনই ক্রন্দন করে না।'[৪০৮]

৪. রোযার মাসের দোয়াতে যেভাবে রয়েছে :

واعنی بالبکاء علی نفسی

'আমাকে আমার জন্য ক্রন্দনে সাহায্য করুন।'[৪০৯]

৫. ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেন : 'ক্রন্দন করার জন্য যদি তোমাদের চোখে পানি না আসে তাহলে তুমি মনে কান্নার ভাব (দুঃখপীড়িত অবস্থায় থাকার অনুভূতি) সৃষ্টি কর।'[৪১০]

৪৯ নং প্রশ্ন : ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য ক্রন্দন করার নির্দেশবাহী কিছু রেওয়ায়াত বর্ণনা করে ইমাম হোসাইনের জন্য ক্রন্দনের দর্শন সম্পর্কে বলুন?

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য ক্রন্দন করার বিশেষভাবে বর্ণিত কিছু রেওয়ায়াত হলো :

১. মাসুম ইমাম (আ.) বলেছেন : 'সকল চোখ কিয়ামতের দিন কঠিন অবস্থার কারণে ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকবে শুধু ঐ চোখ ব্যতীত যে চোখ ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য ক্রন্দন করেছিল; ঐ চোখ (ঐ দিন) হাস্যোজ্জ্বল ও উৎফুল্ল থাকবে।'[৪১১]

২. ইমাম রেযা (আ.) বলেন : 'ইমাম হোসাইনের জন্য ক্রন্দন কবীরা গুনাহকে মুছে দেয়।'[৪১২]

৩. ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেন : 'যদি ইমাম হোসাইনের স্মরণে মাছির ডানা পরিমাণ পানি কোন ব্যক্তির চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে, এর পুরস্কার দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর এবং আল্লাহ তার জন্য পুরস্কার হিসেবে বেহেশ্ত ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হবেন না।'[৪১৩]

৪. মাসুম ইমাম (আ.) বলেছেন : 'যদি কোন ব্যক্তি ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মুসিবতে নিজে কাঁদে এবং অন্যকে কাঁদায় অথবা দুঃখিত ও মর্মাহত অবস্থায় থাকে তাহলে বেহেশ্ত তার জন্য ফরজ হয়ে যাবে।'

৫. ইমাম রেযা (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : 'হে শাবিবের সন্তান! কোন কিছুর জন্য যদি কাঁদতে চাও তাহলে হোসাইন ইবনে আলীর জন্য কাঁদ; কারণ, যেভাবে ভেড়া জবাই করা হয় সেভাবে তাঁকে জবাই করা হয়েছে। ... হে শাবিবের সন্তান! ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য যদি এমনভাবে কাঁদ যাতে তোমার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে- তা অল্প বা বেশি- আল্লাহ তোমার সকল সগীরা ও কবীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।'[৩১৪]

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর হৃদয়বিদারক ঘটনার স্মরণে ক্রন্দনের আরো কিছু দর্শন বর্ণিত হয়েছে যেগুলো এর প্রকৃত দর্শন নয়। এদের মধ্যে নিম্নে কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো :

ক. ক্রন্দন মৌলিক দৃষ্টিতে ভালো এবং মানুষের অন্তরকে পরিশোধিত করে (যদি তা আল্লাহকে পাওয়ার আশা, গুনাহর অনুশোচনা অথবা আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও ওলিদের বিচ্ছেদ ও বিরহে ঘটে); তবে ইমাম হোসাইনের শোকানুষ্ঠানে অন্তরের পরিশোধন অধিক পরিলক্ষিত হয়।

খ. ইমাম হোসাইনের জন্য ক্রন্দন হলো (ইসলামের রক্ষায় তাঁর অবদানের প্রতিদানস্বরূপ) তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা; তবে একমাত্র ক্রন্দনের মাধ্যমে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সব ক্ষেত্রে সঠিক নয়। কেননা, ইমাম হোসাইনের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যদি ক্রন্দন ছাড়া অন্য কোন উপায় না থাকত, তবে তা করা সঠিক হতো। কিন্তু তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অন্য পথও তো রয়েছে। তাছাড়া এ ধরনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি ইমাম হোসাইনের কোন প্রয়োজন আছে কি?

গ. ইমাম হোসাইন (আ.) আমাদের ক্রন্দন ও শোক প্রকাশ থেকে উপকৃত হন; ক্রন্দন ও শোক প্রকাশের মাধ্যমে যেভাবে আত্মিকভাবে উৎকর্ষ অর্জন করতে পারি তেমনিভাবে ইমামের স্মরণের ফলে তাঁর মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়।

ঘ. সওয়াব ও শাফায়াত লাভ করা।

উল্লিখিত দর্শনগুলো যদিও রেওয়ায়াত ও বিশেষ বিশ্লেষণ অনুযায়ী একটা পর্যায় পর্যন্ত সঠিক, কিন্তু ক্রন্দনের ক্ষেত্রে এর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ দর্শন চিন্তা করা সম্ভব নয় কি? যদি তা সম্ভব হয় তাহলে কেন ইমাম হোসাইন (আ.)-এর জন্য ক্রন্দনের দর্শনকে শাফায়াত, সওয়াব, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করব?

ইমামের জন্য ক্রন্দনের দর্শন হিসেবে আত্মিক উৎকর্ষ ও তাকওয়া বৃদ্ধির যে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে তা ছাড়াও এর আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক দর্শন রয়েছে। এ দু'টি মৌলিক দর্শন তার স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রভাব রাখে।

নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে : প্রথমত এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, শিয়া সংস্কৃতিতে মূল্যবোধের ক্রন্দন প্রথমত এমন এক ক্রন্দন যার ফলে অন্তরের

উৎকর্ষ সাধিত হয়। দ্বিতীয়ত, এ ক্রন্দনের উৎস হলো জ্ঞান। ইমাম হোসাইনের জন্য ক্রন্দনকারী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সত্যিকারের প্রেমিককে- যিনি আল্লাহর সিফাতের (সকল পূর্ণতার গুণের বহিঃপ্রকাশ ছিলেন)- হারানোর (ও তাঁর কল্যাণকর প্রভাব থেকে বঞ্চিত হওয়ার) শোকে কাঁদে। মুমিনদের মাঝে তাঁর উপস্থিতি ঐশী সুবাস ছড়াতো, তাঁর দর্শন ও সান্নিধ্য আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিত। এক্ষেত্রে মুমিনরা ঐশী (গোলাপের) সুগন্ধ তাঁর (গোলাপ জলস্বরূপ) ওলি থেকে পেত।

'যেহেতু ফুলের মৌসুম চলে গেছে এবং ফুলের বাগান নষ্ট হয়েছে
সেহেতু গোলাপের ঘ্রাণ গোলাপজল থেকে নিই।'

মহান ইমাম (আ.) ও তাঁর সঙ্গী- সাথিদের মর্যাদা এবং নিজের অপূর্ণতার কথা চিন্তা করে এ আত্মিক উৎকর্ষ থেকে বঞ্চিত থাকা ও পিছিয়ে পড়ার কারণে ক্রন্দন করে। ক্রন্দন এজন্য যে, হাবিব ইবেন মাজাহের কী ছিলেন এবং আমি কে? আমার কী মর্যাদা রয়েছে? আলী আকবর (আ.)- এর জন্য ক্রন্দন করা হচেছ নিজের জন্য ক্রন্দন করা অর্থাৎ ঐ সাহসী ও নৈতিক গুণসম্পন্ন যুবকের কী পরিমাণ পূর্ণতা ছিল এবং আমার কী পরিমাণ অপূর্ণতা রয়েছে, তা ভেবে দেখা। এ দুয়ের ব্যবধানের স্মরণ করে ক্রন্দন করা (কারণ, এ ব্যবধানই আমাদেরকে তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে)।[৪১৫]

যদিও আমাদের ক্রন্দন এ ধরনের উৎসমূল থেকে অনেক দূরে, কিন্তু আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত মনের আকুতি ও আফসোসকে এ দিকে পরিচালিত করা। এর ফলে আমাদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে। বাস্তবে এ ক্রন্দন দুঃখগুকষ্ট প্রকাশের জন্য- যা মানুষকে সামনে এগিয়ে যেতে বাধ্য করে যার ফলে সে ঐ মাত্রার পূর্ণতায় পৌঁছায়। এ ধরনের ক্রন্দন মানুষের পূর্ণতাদানকারী ক্রন্দন।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে : যদি আবু আবদিল্লাহ (আ.)- এর জন্য ক্রন্দন অন্তর্দৃষ্টি, জ্ঞান এবং নৈতিক কারণে হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে এ মর্মপীড়া মানুষের মনে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সামাজিক পরিবর্তনের

পরিবেশ সৃষ্টি করবে। ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য ক্রন্দন যখন অন্তরের উৎকর্ষ সাধনের জন্য হয় তখন মানুষ তার ব্যক্তিগত ও নৈতিক অবস্থা নিয়ে চিন্তা ও পর্যালোচনা করে। অন্তর জগতে এ ধরনের পরিবর্তন পরিণতিতে ইসলামের মহান উদ্দেশ্যের পথে কাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে।

যখন মানবজাতি অনুধাবন করবে যে, হযরত আবু আবদিল্লাহ কেন এবং কিভাবে আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং কিভাবে রক্তের কালি দিয়ে ইতিহাসের পাতায় চিরন্তন বাণী অঙ্কিত করেছেন তখন এরূপ জ্ঞান- উৎসারিত ক্রন্দন মানুষের অন্তরে এমন পরিবর্তন আনে যা ব্যক্তির গণ্ডি পেরিয়ে সমাজেও ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজকে প্রভাবিত করে। তখন সে চেষ্টা করে সমাজ থেকে ফ্যাসাদ ও পথভ্রষ্টতা দূর করতে, দ্বীনের মধ্যে বিকৃতি রোধ করতে এবং স্বাধীনতা, পৌরুষ, ধার্মিকতাকে শুধু ব্যক্তি জীবনে নয়, সামাজিক জীবনেও প্রতিষ্ঠিত করতে।

অন্য ভাষায়, ইমাম হোসাইনের জন্য ক্রন্দন পরোক্ষভাবে তাঁর আদর্শ রক্ষা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এ কারণে বলা যায়, ইমামের জন্য ক্রন্দনের অন্যতম দর্শন হলো তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করা। ইমাম হোসাইন সম্পর্কে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ এ বাক্য- 'ইসলামের শুরু মুহাম্মাদ (সা.)- এর মাধ্যমে এবং এর স্থায়িত্ব হোসাইন (আ.)- এর মাধ্যমে'- এর অর্থ এ রকমই।

ইসলাম, বিশেষ করে শিয়া আদর্শ ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য ক্রন্দনের মাধ্যমে টিকে আছে।

৫০ নং প্রশ্ন : ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য শোক পালন এবং মর্সিয়া পাঠের সময় কী করলে আমাদের অন্তর বিগলিত হবে ও আমরা ক্রন্দন করব?

উত্তর : প্রথমত, মর্সিয়া পাঠের সময় দুঃখিত ও মর্মাহত হওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া মূল্যবান একটি বিষয়। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়।[৪১৬]

দ্বিতীয়ত, মূল্যবোধের ক্রন্দনের উৎপত্তিস্থল হলো জ্ঞান। এ কারণে যদি অনুভব করি যে, মর্সিয়া পাঠ করার সময় ক্রন্দন আসে নি বা চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে নি, এমনকি অন্তরও প্রভাবিত হয় নি ও দুঃখবোধ জাগ্রত হয় নি, তাহলে নিজের মধ্যে আহলে বাইত (আ.) সম্পর্কে জানার ক্ষেত্র সৃষ্টি ও তাঁদের পরিচয়ের জ্ঞানকে বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করার জন্য প্রচেষ্টা নিতে হবে এবং এ পথে অন্তরায়গুলো দূর করতে হবে। আরো নিশ্চিত হতে হবে যে, না কাঁদার পেছনে কোন শারীরিক কারণ আছে কিনা।

আহলে বাইত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্র সৃষ্টি ও তাঁদের পরিচয়ের জ্ঞানকে বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবে :

১. তাঁদের জীবন ইতিহাস পড়া।

২. তাঁদের বক্তব্য সম্পর্কে জানা ও তা নিয়ে চিন্তা করা।

৩. আল্লাহ- পরিচিতি অর্জন করা। কারণ, তাঁরা হলেন আল্লাহর গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলির পরিচিতি লাভের মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে জানা সম্ভব।[৪১৭]

আমাদের মন্দকর্ম জ্ঞান অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। অসৎ ও মন্দকর্ম এবং পুণ্যের প্রতি অনীহা আমাদের অন্তরকে কঠোর ও নির্দয় করে ফেলে।[৪১৮] নির্দয় অন্তর আবেগ- অনুভূতিকে অকার্যকর ও আমাদেরকে বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যায়। নিম্নে ক্রন্দনের অন্তরায়ের কিছু কারণ তুলে ধরা হলো :

১. অধিক কথা বলা (যিকর ও আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকা ছাড়া)।[৪১৯]

২. অতিরিক্ত গুনাহ।[৪২০]

৩. অতিরিক্ত (বস্তুবাদী) আশা- আকাঙ্ক্ষা।[৪২১]

৪. আমোদ- প্রমোদে ব্যস্ত থাকা।[৪২২]

৫. ধন- সম্পদ পুঞ্জিভূত করা।[৪২৩]

৬. আল্লাহর ইবাদত ত্যাগ।[৪২৪]

৭. পথভ্রষ্ট ও অত্যাচারী ব্যক্তির সাথে চলাফেরা ও ওঠা- বসা করা।[৪২৫]

৮. হীন ও নীচু শ্রেণির মানুষের সাথে ওঠা- বসা করা।[৪২৬]

৯. অতিরিক্ত হাসি।[৪২৭]

অন্তরের নির্দয়তা ও হৃদয়ের কঠোরতা দূর করার জন্য রেওয়ায়াতে অনেক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো :

১. বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ।[৪২৮]

২. উপদেশ শ্রবণ।[৪২৯]

৩. আল্লাহর নিদর্শন, কিয়ামত, নিজ অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করা।[৪৩০]

৪. জ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের সাথে ওঠা- বসা করা।[৪৩১]

৫. নৈতিক গুণাবলিসম্পন্ন ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাথে ওঠা- বসা করা।[৪৩২]

৬. জ্ঞানের বিষয় আলোচনা ও পর্যালোচনা করা।[৪৩৩]

৭. দরিদ্র ও অভাবীদের খাওয়ানো।[৪৩৪]

৮. ইয়াতিমদের প্রতি ভালোবাসা।[৪৩৫]

৯. আল্লাহর স্মরণ।[৪৩৬]

১০. আহলে বাইতের ফযিলত ও মুসিবত বর্ণনা।[৪৩৭]

১১. কোরআন তেলাওয়াত করা।[৪৩৮]

১২. গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা (অধিক আসতাগ্ফিরুল্লাহ পড়া)।[৪৩৯]

এ বিষয়গুলোর মধ্য হতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল্লাহ তা‘আলার নিকট থেকে অক্ষমের মতো কামনা করব যেন আমাদের চোখে অশ্রু দান করেন। এ জন্য আহলে বাইতকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নির্ধারণ এবং তাঁদের নিকট থেকে সাহায্য কামনা করব।[৪৪০]

‘যেহেতু তোমার একাকিত্বের কারণে নিরাশ হয়ে
ছায়ার নিচে সূর্যের সাহায্য কামনা করেছ।
যাও দ্রুত আল্লাহর সাহায্য কামনা কর।
যেহেতু এ রকম করেছ আল্লাহ তোমার সাহায্যকারী হবেন।’[৪৪১]

৫১ নং প্রশ্ন : গুনাহগার ও পাপী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কেবল ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য অশ্রুপাত এবং শোকানুষ্ঠান পালন কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে কি?

'শাফায়াত' সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা এ প্রশ্নের উত্তরকে সুস্পষ্ট করবে। কিছু রেওয়ায়াতে এমন কিছু বিষয় ও কর্মের উল্লেখ আছে যা মানুষকে গুনাহ, আত্মিক অপবিত্রতা, দুনিয়ার প্রতি মোহ ও বস্তুনির্ভরতা থেকে মুক্তি দান করে। শাফায়াতের একটি প্রকার হলো আহলে বাইত (আ.), বিশেষ করে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য ক্রন্দন করা। রেওয়ায়াত অনুসারে শাফায়াতের গোপন রহস্য হলো সকল মানুষকে- গুনাহগার হোক বা না হোক- রাসূল (সা.) ও পবিত্র ইমামদের সাথে সম্পৃক্তকরণ। এর অর্থ হলো দুনিয়াতে যখন একজনের সাথে কারো আত্মিক সম্পর্ক থাকে, তাদের দু'জনের চিন্তা, বিশ্বাস ও পথ একই হয়; জীবনপদ্ধতি একই হয়; তারা দু'জন একে অপরকে চেনে- জানে ও ভালোবাসে তখন তাদের দু'জনের মধ্যে অস্তিত্বগতভাবে বাস্তব সম্পর্ক সৃষ্টি হয় ও তাদের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন এক বন্ধনের রূপ নেয়।

এ কারণে যারা মহানবী (সা.) ও পবিত্র ইমামদের নেতৃত্ব ও বেলায়াতে বিশ্বাস করে, তাদের অনুসরণ করে, যথাসম্ভব তাদের উপদেশ অনুসারে আমল করে, তার চিন্তা- চেতনা ও বিশ্বাস তাঁদের চিন্তা- চেতনা ও বিশ্বাসের নিকটবর্তী (কখনও কখনও সমরূপ ও একীভূত হয়)। এর ওপর ভিত্তি করে তাঁদের প্রতি ভালোবাসা ও জ্ঞান রাখে। এ বিষয়গুলো প্রমাণ করে ঐ ব্যক্তির সাথে মহানবী (সা.) ও পবিত্র ইমামদের আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ তার ও তাঁদের মধ্যে বাতেনী ও রূহের জগতে সম্পর্ক বিদ্যমান এবং অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিকভাবে তাঁরা পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। মহানবী (সা.) ও ইমাম (আ.)- দের সাথে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যার যত বেশি মিল হবে এ সম্পর্কও তত বেশি শক্তিশালী হবে। এর বিপরীত বিষয়টিও সত্য অর্থাৎ যত বেশি অমিল হবে এ সম্পর্কও তত দুর্বল হবে।

যখন অস্তিত্ব ও সত্তাগতভাবে এ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তখন মহানবী (সা.) ও ইমামদের সাথে তার একাত্মতার সৃষ্টি হয়। গুনাহ, অপবিত্রতা ও দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ততা থাকা সত্ত্বেও যেহেতু সে

বিশ্বাস ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে তাঁদের সাথে ঐক্য স্থাপন করেছে সেহেতু এ বিষয়ে তাঁদের সাথে অস্তিত্বগত এক সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে যা কিয়ামতের দিন শাফায়াতের রূপে প্রকাশ পাবে। এ একাত্মতাই তাকে ওপরে টেনে তোলে অর্থাৎ আল্লাহর

সাথে সাক্ষাৎ (রহমত লাভ) ও আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

শাফায়াতের গোপন রহস্য অনুধাবন করলে আমরা বুঝতে পারব যে, শাফায়াতের উপযুক্ততা লাভের জন্য মানুষের মধ্যে বিশেষ প্রস্তুতি ও আল্লাহর দিকে আকর্ষণ থাকা আবশ্যক। তবেই সে শাফায়াতের উপযুক্ত হয়ে গুনাহ ও দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ততা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। এ ধরনের প্রস্তুতি কেবল মহানবী (সা.) ও ইমামদের রঙে রঙিন হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভব। এ শাফায়াত কেবল ঐ সকল ব্যক্তির ভাগ্যে জোটে যারা দুনিয়ার জীবনে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল ছিল এবং তারা আল্লাহ, রাসূল ও পবিত্র ইমামদের সত্য অনুসারী হিসেবে একটা পর্যায় পর্যন্ত তাঁর আদেশ পালনকারী এবং চরম অমান্যকারী এবং বিদ্রোহী ছিল না; তাই আল্লাহ তাদের ব্যাপারে মোটামুটি সন্তুষ্ট ছিলেন।[৪৪২]

এ কারণে এ ধরনের শাফায়াত সবার ভাগ্যেই জুটবে না। কোন ব্যক্তি যা ইচ্ছা তাই করে অর্থাৎ সব ধরনের অন্যায় করে কেবল আবু আবদিল্লাহ (আ.)- এর জন্য ক্রন্দন করে বেহেশতে যেতে পারবে না; তার গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে না। শুধু তাঁর প্রতি লোক- দেখানো ভালোবাসা দেখিয়ে ও ক্রন্দন করে আযাব, মনের ভয়, কবরের কঠিন অবস্থা ও মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। যদিও প্রকৃত ভালোবাসা মানুষকে গুনাহ ও আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি ভালোবাসা থেকে অনেক পরিমাণে দূরে রাখে। কিন্তু এ শাফায়াত পাওয়ার জন্য আল্লাহর (ন্যূনতম) সন্তুষ্টি অর্জন, ঈমান ও সৎকর্মের প্রয়োজন রয়েছে।

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) তাঁর অনুসারীদের চিঠির মাধ্যমে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : 'জেনে রাখ যে, আল্লাহর কোন সৃষ্টি, তাঁর নিকটবর্তী কোন ফেরেশতা, তাঁর কোন প্রেরিত পুরুষ অথবা অন্য কেউ মানুষকে আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্তি দিতে পারে না।

সুতরাং যে ব্যক্তি এ ভেবে আনন্দিত যে, শাফায়াতকারীদের শাফায়াত তার উপকারে আসবে তার উচিত ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর নিকট কামনা করা যেন তিনি তার ওপর সন্তুষ্ট হন।'[৪৪৩]

অতএব, দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ততটুকুই থাকা বাঞ্ছনীয় যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ না হয়। কারণ, কারো প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলে এ ধরনের শাফায়াত অর্জন সম্ভব নয়। যদি কোন ব্যক্তি নিশ্চিন্তে গুনাহ করে, কিন্তু তার গুনাহের জন্য অনুশোচনা ও বিলাপ করে না, এমনকি কীভাবে তার গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে সে সম্পর্কেও চিন্তা করে না, শুধু ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোকানুষ্ঠানে ক্রন্দন করে তাহলে আল্লাহ এ কারণে সন্তুষ্ট হবেন না; ইমাম (আ.)- এর শাফায়াতও অর্জিত হবে না।

কিন্তু যদি কেউ তার আত্মিক অপবিত্রতা ও গুনাহের কারণে অনুশোচনা, অনুতাপ ও বিলাপ করে এবং কীভাবে গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তা, বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে রাসূল ও ইমামদের সাথে একাত্ম হওয়া যায় তার পথ খোঁজে ও এজন্য চেষ্টাও করে, যেহেতু তার অন্তরের গভীরে গুনাহ ও অপবিত্রতার প্রতি ঘৃণা রয়েছে এবং ইমামের সাথে বিশ্বাস, চিন্তা ও আমলের ক্ষেত্রে তার একাত্মতা রয়েছে সেহেতু এ একাত্মতার অনুভূতি তার মনে এক ধরনের আনন্দের সৃষ্টি করবে আর এ বৈশিষ্ট্যই তাকে শোকানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও তাতে অশ্রুবিসর্জনের কল্যাণ থেকে উপকৃত করবে এবং এটিই তার গুনাহের ক্ষমার কারণ হবে।

যদি আমাদের ইমাম হোসাইনের শাফায়াতের আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহলে অবশ্যই তাঁকে ভালোবাসতে হবে; তাঁর বিশ্বাস, চিন্তা- চেতনা, ভালো গুণ, কর্ম, আচরণ ও আকঙ্ক্ষার সাথে ঐক্য থাকতে হবে এবং আমরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করব না। এর থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো আল্লাহ, যিনি প্রকৃত শাফায়াতকারী, তাঁর নিকট থেকে কামনা করব যেন তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির ছায়াতলে ইমামের শাফায়াত থেকে উপকৃত হব।

'হে আল্লাহ! তা- ই কর যা তোমাকে মানায়

সব গর্ত থেকে সাপ আমাকে দংশন করছে।

যদি আমার প্রাণ কঠিন ও হৃদয় লোহার মতো শক্ত না হতো

দুঃখের বিলাপে চোখ দিয়ে রক্ত ঝরত।

আমার সময় সংকীর্ণ ও আমার নিঃশ্বাস বন্ধের উপক্রম হয়েছে

হে আর্তনাদের সাড়াদানকারী! তোমার ক্ষমতা দিয়ে আমাকে সাহায্য কর।

যদি এ বারের মতো সাহায্য কর

যা করা উচিত ছিল না তা থেকে তাওবা করছি।

শেষবারের মতো আমার তাওবা কবুল কর

যাতে চিরদিনের জন্য দৃঢ়তার সাথে তাওবা না করার পথ বন্ধ করতে পারি।

যদি আরেকবার ইচ্ছাকৃত ভুল করি

তাহলে আমার আহ্বান ও দোয়াকে গ্রহণ কর না।’[৪৪৪]

৫২ নং প্রশ্ন : শিয়া সংস্কৃতি কেন শুধু দুঃখগুমর্মপীড়া ও শোকের সংস্কৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত?

উত্তর : প্রথমত, শিয়া সংস্কৃতিতে অনেকগুলো বড় ঈদ ও আনন্দের অনুষ্ঠান রয়েছে, যেমন : ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আযহা, আল্লাহর রাসূল (সা.), হযরত ফাতিমা (আ.) ও বার ইমাম (আ.)- এর জন্মদিন, গাদীরে খুমের ঈদ, রাসূল (সা.)- এর নবুওয়াতে (আনুষ্ঠানিক) অভিষেকের ঈদ...। এসব দিনে আনন্দ ও খুশি রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যদি শিয়া সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরা শোকানুষ্ঠানের মতো করে আনন্দ অনুষ্ঠান পালন না করে তাহলে এ সমস্যা ধারক ও বাহকদের, শিয়া সংস্কৃতির নয়। এর ধারক ও বাহকরা তাদের দায়িত্ব পালন করেনি।

তৃতীয়ত, ইসলামী সংস্কৃতিতে যেভাবে আহলে বাইতের জন্য শোকানুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তেমনিভাবে আনন্দ অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এমনকি রেওয়ায়াতসমূহে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যে অন্যদের খুশি করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) সকল শিশু, এতিম ও মুমিনদের খুশি করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি সুন্দর একটি

হাদীসে বলেছেন : 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে খুশি করল সে আমাকে খুশি করল; যে আমাকে খুশি করল সে আল্লাহকে খুশি করল।'[৪৪৫]

চতুর্থত, শিয়া সংস্কৃতিতে শোকানুষ্ঠান আনন্দ অনুষ্ঠানের চেয়ে বেশি প্রচলিত। এর কারণ হলো আহলে বাইতের ওপর বনি উমাইয়া ও বনি আব্বাসের শাসকগোষ্ঠীর যুলুম- অত্যাচার। এ যুলুমের মাত্রা এত বেশি পরিমাণে ছিল যে, ইতিহাসে তার নমুনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ কারণে স্বাভাবিক যে, ইমামদের ওপর অত্যাচারের ঘটনাসমূহ ও তাঁদের মযলুম (জুলুমের শিকার হওয়া) অবস্থা শোকানুষ্ঠান, মর্সিয়া ও শোকগাথার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও বর্ণিত হয়েছে। এর বিপরীতে আনন্দ অনুষ্ঠানের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। যেহেতু শহীদদের নেতা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর ওপর যে যুলুম করা হয়েছে তা আন্যান্য ইমামের ওপর আপতিত মুসিবত ও যুলুমের তুলনায় অনেক বেশি ও যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করেছে সেহেতু তাঁর শোকের স্মরণ অধিক ও ব্যাপকতর।

৫৩ নং প্রশ্ন : আনন্দ- খুশি ও উৎফুল্লতার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক রয়েছে কি? ধর্ম কি একে শক্তিশালী করে নাকি একে নিরুৎসাহিত ও স্তব্ধ করে?

উত্তর : ধর্মীয় সূত্র অর্থাৎ কোরআন, রাসূল (সা.) ও পবিত্র ইমামদের সুন্নাত ও জীবনী থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ধর্ম আনন্দ ও খুশির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়াও এ ধর্ম অলসতা থেকে দূরে এবং সজীবতা ও কর্মচাঞ্চল্যের পক্ষে। তবে এ আনন্দ কোন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে নয়; বরং নির্দিষ্ট গণ্ডিতে ভারসাম্যপূর্ণরূপে বিদ্যমান।

১. ইসলাম ও মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ : সর্বোত্তম ধর্ম মানব- প্রকৃতি ও এর কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তার ফিতরাতগত চাহিদা পূরণ করে; তা না হলে এ ধর্ম অনুসারে আমল করা সম্ভব নয় এবং মানুষকে সৌভাগ্যবান করা সম্ভব নয়। ইসলামী শিক্ষা এ প্রকৃতিগত চাহিদার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা ও মানুষের ফিতরাতের[৪৪৬] সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণে আরব উপদ্বীপের সীমানা পেরিয়ে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছে। আল্লামা তাবাতাবাঈর

কথা অনুযায়ী : ‘ইসলাম, না মানুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করে এর চাহিদা পূরণ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে, না তার সম্পূর্ণ মনোযোগ ও দৃষ্টি বস্তুগত ও জৈবিক চাহিদাপূরণ ও এ দিকটিকে শক্তিশালী করার ওপর নিবদ্ধ করে। না তাকে যে (বস্তু) জগতে সে বসবাস করে তা থেকে আলাদা করে, না তাকে দ্বীন ও শরিয়তের প্রতি অমুখাপেক্ষী জ্ঞান করে। মানুষ, দ্বীন ও দুনিয়া- এই ত্রিভুজের তিন কোণকে অঙ্কিত করে; মানুষ ত্রিভুজের এ সীমানার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত পূর্ণতা অর্জন করে এবং চিরস্থায়ী সৌভাগ্যে পৌঁছায়। যদি ত্রিভুজের তিন কোণের কোন একটি না থাকে ও গুরুত্ব কমে যায় তাহলে মানুষ পতনের সম্মুখীন হয় এবং মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ সীমা থেকে ধ্বংসের গহ্বরে পৌঁছে যায়।’[৪৪৭]

২. আনন্দ ও খুশির প্রয়োজনীয়তা : খুশি ও আনন্দকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যেমন :

ক. ইতিবাচক অনুভূতি- যা বিজয়ের সন্তুষ্টির অনুভূতি থেকে অর্জিত হয়।[৪৪৮]

খ. দুঃখ ও বেদনা ছাড়া সার্বিক আনন্দ উপভোগকে খুশি বলা হয়।[৪৪৯]

গ. আনন্দ ও খুশি আত্মিক অবস্থাকে বলা হয় যা মানুষের চাওয়া পূরণের মাধ্যমে অর্জিত হয়।[৪৫০]

এ বিষয়গুলো যদিও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিন্তু সকল জ্ঞানী ও পণ্ডিত একমত যে, আনন্দ ও খুশি মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে দাবি করে তার আনন্দের কোন প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজগতের ভিত্তি ও এর দৃশ্যমান বস্তু ও বিষয়সমূহ এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যেন মানুষের মধ্যে আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি করবে। বসন্তকালকে সতেজতা সহকারে, সকালকে কমনীয়তা সহকারে, প্রকৃতিকে সুন্দর ঝরনা সহকারে, ফুলকে বিভিন্ন রঙে; বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ, বৈবাহিক সম্পর্ক, মানুষ... এ সবই আনন্দ বয়ে নিয়ে আসে। যেহেতু আনন্দ ও খুশি মানুষকে পরাজয়, নিরাশা, ভয় ও চিন্তা থেকে দূরে রাখে, এ কারণে মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের মধ্যে আনন্দ ও খুশির সৃষ্টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এ আলোচিত বিষয় আনন্দ ও খুশির প্রয়োজনীয়তার বিষয় নির্দেশ করে।[৪৫১]

'এটাই উত্তম যে সবসময় খুশি থাকব

সকল ব্যথা- বেদনা ও দুঃখমুক্ত থাকব।

দিনগুলো অতিবাহিত হবে হাস্যোজ্জ্বল মুখ ও ভালো ব্যবহারে

ফলে কাজে- কর্মে সুন্দর হৃদয়ের অধিকারী হবে।

যদি খুশি ও আনন্দে সুন্দর হৃদয়ের অধিকারী হও

তোমার খুশি বিরাজমান থাকবে সবসময়।'[৪৫২]

৩. আনন্দ ও খুশির কারণসমূহ : গবেষকদের মতামত এবং নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে মানুষের আনন্দ ও খুশির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় :

১. ঈমান, ২. সন্তুষ্টি ও ধৈর্য, ৩. গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা, ৪. দুশ্চিন্তার সাথে সংগ্রাম করা, ৫. মৃদু হাসি, ৬. গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হাসি- কৌতুক করা, ৭. সুগন্ধি ব্যবহার, ৮. সাজগোজ করা, ৯. উজ্জ্বল পোশাক পরিধান করা, ১০. আনন্দ উৎসবে যোগদান করা, ১১. ব্যায়াম করা, ১২. জীবনের প্রতি আশাবাদী থাকা, ১৩. উন্নতির চেষ্টা করা, ১৪. ভ্রমণ করা, ১৫. পরিমাণমত বিনোদন করা, ১৬. কোরআন তেলাওয়াত করা, ১৭. আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গভীর চিন্তা করা, ১৮. দান- খয়রাত করা, ১৯. সবুজ প্রকৃতি অবলোকন করা এবং ...।[৪৫৩]

'চারটি গুণ রয়েছে যা স্বাধীনচেতা মানুষের দুঃখ করে মোচন

সুস্থ দেহ, উত্তম চরিত্র, সুন্দর নাম ও বুদ্ধিবৃত্তিই সেই ধন।

আল্লাহ যাকে দেন এ চারটি গুণ উপহার

সবসময় থাকে খুশিতে, থাকে না কোন দুঃখ তার।'[৪৫৪]

৪. ইসলাম ও আনন্দ : ইসলাম মানুষের মৌলিক চাহিদা অনুসারে আনন্দ ও খুশিকে অভিনন্দন জানায় এবং একে অনুমোদন দেয় ও সহায়তা করে। কোরআন সর্বোত্তম ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে আনন্দ ও খুশির জীবনকে আল্লাহর নেয়ামত ও রহমত এবং ক্রন্দন, চিৎকার ও

আহাজারির জীবনকে নেয়ামত ও রহমতবিহীন মনে করেছে। এ বিষয়টি কোরআনের এ আয়াত সাক্ষ্য দেয় : فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ‘তাদের উচিত কম হাসা ও অধিক কাঁদা।’[৪৫৫]

এ আয়াতের শানে নুযুল হলো, আল্লাহর রাসূল (সা.) যুদ্ধ করতে সক্ষম ব্যক্তিদের ইসলামী ভূখণ্ডে হামলাকারী কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এক শ্রেণির লোকেরা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে আল্লাহর রাসূলের আদেশ অমান্য করে ঐ সৈন্যদলে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। কোরআন এ আয়াতে এ শ্রেণির লোকদের আযাবের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছে যে, এ হুকুম অমান্যকারী গোষ্ঠী এখন থেকে কম কাঁদবে ও বেশি হাসবে।

এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, মন্দকর্মের প্রতিফল ও শাস্তিস্বরূপ যে অভিশাপ দেওয়া হয় যা অভিশপ্ত ব্যক্তিকে সবসময় আযাব ও কষ্টের মধ্যে ফেলে তা মানুষের সহজাত প্রকৃতি ও ফিত্রাতের বিপরীত আচরণের ফল। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর হুকুম অমান্যকারীদের শাস্তিস্বরূপ কম হাসা ও বেশি কাঁদার কথা বলেছেন; এবং তা তাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আনন্দ- হাসি ও উৎসাহ-উদ্দীপনা থেকে বঞ্চিত করে।[৪৫৬]

কোরআনের অন্য আয়াতে যা কিছু আনন্দ ও খুশির কারণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে তা বিশেষভাবে মুমিনদের জন্য :

(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

‘বল : আল্লাহ নিজ বান্দাদের জন্য যে সকল শোভনীয় ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, কে সেগুলোকে হারাম করেছে? বল : এ সমস্ত নেয়ামত পার্থিব জীবনেও তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে আর কিয়ামতের দিনে বিশেষ করে তাদের জন্য নির্দিষ্ট হবে।[৪৫৭]

“হে রাসূল! (যারা আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতকে নিষিদ্ধ করে তাদেরকে) বল : ‘আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সকল সৌন্দর্যময় ও সুসজ্জিত বস্তু প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন কে সেগুলোকে হারাম করেছে?”

বল : হে রাসূল! এ পবিত্র উপহার ও সৌন্দর্যের উপকরণসমূহ- যা আল্লাহ্ ঈমানদার ব্যক্তিদের এ দুনিয়া এবং আখেরাতের জীবনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ দুই জগতের মধ্যে পার্থক্য শুধু এটা যে, দুনিয়ার সৌন্দর্য মন্দ ও অপবিত্রতার সাথে মিশে আছে; আনন্দ ও খুশিগুলো দুঃখ ও ব্যথার সাথে মিশে আছে। কিন্তু পরকালের সৌন্দর্যগুলো নির্ভেজালভাবে ঈমানদারদের জন্য রয়েছে।'[৪৫৮]

এ আয়াত এ বাস্তবতাকে সুস্পষ্ট করে যে, ইসলাম জীবনের আনন্দ এবং উৎসাহ- উদ্দীপনা দানকারী সৌন্দর্য ও ঐশী উপহারসমূহকে গুরুত্ব দান করে। একে ধার্মিক ও মুমিনদের সৌন্দর্য বর্ধনকারী হিসেবে মনে করে।

ওহীর প্রকৃত ব্যাখাকারী পবিত্র ইমামদের থেকে বর্ণিত হয়েছে :

ক. হযরত রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : 'মুমিন রসিক এবং প্রাণোচ্ছ্বল ও সজীবতায় পূর্ণ।'[৪৫৯]

খ. হযরত আলী (আ.) বলেন : 'আনন্দ ও খুশি অন্তরের প্রশস্ততা আনে'[৪৬০]; 'আনন্দ ও খুশি হচ্ছে অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া সুফলের মতো'; 'যার আনন্দ ও খুশি কম হবে মৃত্যুর সময় তার সহজ ও প্রশান্তির সাথে মৃত্যু ঘটবে।'[৪৬১]

গ. ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেন : 'এমন কোন মুমিন ব্যক্তি নেই যার প্রকৃতির মধ্যে রসিকতা নেই।'[৪৬২]

ঘ. ইমাম রেযা (আ.) বলেন : 'চেষ্টা কর যেন তোমার সময় চার ভাগে বিভক্ত হয় : ১. আল্লাহ্র সাথে একান্তে কথা বলা ও ইবাদাতের সময়, ২. জীবিকা অন্বেষণের সময়, ৩. বিশ্বস্ত বন্ধুদের সঙ্গে কাটানোর সময়- যারা তোমার দোষত্রুটি সম্পর্কে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তোমাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসে, ৪. কিছু সময় নিজের বিনোদন ও উপভোগের জন্য নির্দিষ্ট কর এবং বিনোদনের সময়ের আনন্দ থেকে অন্য সময়ের দায়িত্ব পালন করার জন্য শক্তি সঞ্চয় কর।'[৪৬৩]

পবিত্র ইমামদের জীবনীতে আনন্দ ও খুশির উপাদানের এত বেশি উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁরা এর অনুমোদন দেওয়া ছাড়াও এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। [৪৬৪]

কোন কোন হাদীস আনন্দ ও খুশির সার্বিক গুরুত্ব বর্ণনা ছাড়াও এজন্য নিজেকে প্রস্তুত করা ও তা বজায় রাখার পদ্ধতি বর্ণনা করেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দৈনন্দিন হাঁটা- চলা করা, ঘোড়ায় আরোহণ করা, পানিতে সাঁতার কাটা, সবুজ প্রকৃতি অবলোকন করা, সতেজতা দানকারী খাবার খাওয়া ও পানীয় পান করা, দাঁত মাজা, রসিকতা, হাসি- ঠাট্টা ও ...।[৪৬৫]

'যখন আনন্দ ও খুশি কমে যায় তখন অন্তর ভেঙে যায়, হয় অক্ষম।'[৪৬৬]

৫. আনন্দ ও খুশির সীমানা : মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও জীবনের উত্তম পরিণতির চিন্তা সামনে রেখে ইসলামী দৃষ্টিতে আনন্দ ও খুশির নির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। আনন্দ ও খুশির বিষয়বস্তু, কাঠামো ও উপাদান যেন ইসলাম ধর্মের তাওহীদ এবং মানবাত্মার সহজাত ঐশী প্রকৃতির বিপরীত ও তার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। কেননা, যে কোন বিষয় যা মানুষকে তার প্রকৃত আদর্শ এবং উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, ইসলামের দৃষ্টিতে তা বর্জনীয়। অতএব, আনন্দের অনুভূতি ও প্রাণচঞ্চল থাকা ও এর প্রভাবক উপাদানগুলো একটি মৌলিক ও আবশ্যক প্রয়োজন হিসেবে বিবেচিত হলেও তার বৈধতার নির্দিষ্ট সীমানা রয়েছে। আর তা হলো এ বিষয়টি ঐ পর্যায় পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য যতক্ষণ না মানুষের মৌলিক উদ্দেশ্য অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়; বরং কাঙ্ক্ষিত হলো যেন তা এ লক্ষ্যের সহযোগী হয়। অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ মনে করেন যে, যেহেতু প্রত্যেক ঐচ্ছিক আচরণের পেছনে বিশেষ উদ্দীপনা ও উদ্দেশ্য কাজ করে তাই আনন্দ ও খুশি এক ধরনের আচরণ হিসেবে এ মূলনীতির ব্যতিক্রম নয় এবং কোন উদ্দেশ্য উদ্দীপনা ছাড়া এমনিই ঘটে না।[৪৬৭]

যদি উদ্দীপনা ও উদ্দেশ্য মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের পথে পরিচালিত হয় তাহলে তা উপকারী ও কাঙ্ক্ষিত হবে, কিন্তু যদি এর মধ্যে মিথ্যা উদ্দেশ্য লুক্কায়িত থাকে ও মানুষের জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্যের বিপরীতে পরিচালিত হয় তাহলে তা অগ্রহণযোগ্য এবং ক্ষতিকর। এ কারণে

বলা যায়, আনন্দ ও খুশির পেছনে লুক্কায়িত উদ্দীপনা ও উদ্দেশ্য এর সীমানা নির্ধারণ করে। রসিকতা, হাসি- ঠাট্টা আনন্দের অন্যতম প্রভাবক উপাদান। যদি এর মধ্যে নির্বুদ্ধিতা, লজ্জাহীনতা ও ধৃষ্টতার মিশ্রণ হয় তবে তা অশ্লীল কর্ম ও ঠাট্টা- বিদ্রুপে পর্যবসিত হয় যা ইসলামে বর্জন করতে বলা হয়েছে। আর যদি কথার মধ্যে অসম্মান, গালমন্দ ও কটুক্তির মিশ্রণ থাকে তবে তাতে কারো অপবাদ দান ও দুর্নাম করা হয়; এ ধরনের আচরণ ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে।[৪৬৮] যদি রসিকতা সীমা লঙ্ঘন করে, অর্থহীন হয় তাহলেও ইসলামের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। যেভাবে মুমিনদের নেতা হযরত আলী (আ.) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি অধিক রসিকতা করে তার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায়।'[৪৬৯] ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেন : 'অতিরিক্ত রসিকতা মানুষের সম্মান নষ্ট করে।'[৪৭০]

মৃদু বা যে কোন হাসি যা আনন্দিত থাকার অন্যতম নিয়ামক তা মন থেকে হওয়া আবশ্যক এবং তা যাতে মানুষের ব্যক্তিত্বকে কলঙ্কিত না করে। ইসলামী দৃষ্টিতে তখনই হাসি- ঠাট্টা ও রসিকতা ইতিবাচক ও উপকারী হবে যখন কারো ব্যক্তিত্ব নষ্টের কারণ না হয়; কাউকে অপমান ও ছোট করার উদ্দেশ্যে না হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মুমিন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে আঘাত করা নিষেধ। যখন মুমিন ব্যক্তির সম্মানকে কাবা ঘরের সম্মানের চেয়ে অধিক ধরা হয়েছে তখন বিষয়টি স্পষ্ট যে, তার অপমান কত বেশি অনাকাঙ্ক্ষিত![৪৭১] আনন্দ ও খুশির পরিমাণ ও ধরন মানুষের মর্যাদা অনুযায়ী হওয়া উচিত। কেননা, সুন্দর জিনিসও যদি কিছু ক্ষেত্রে সঠিক স্থানে ও উপযুক্তরূপে উপস্থাপিত না হয় তবে ইতিবাচক প্রভাব রাখার পরিবর্তে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ কারণে রেওয়ায়াতে অট্টহাসিকে শয়তানের পক্ষ[৪৭২] থেকে এবং মৃদুহাসিকে সর্বোত্তম হাসি গণ্য করা হয়েছে। [৪৭৩] খুশির সময় ও স্থানও মানুষের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী হওয়া উচিত; যদি তার ব্যক্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হয় তাহলে তা অনাকাঙ্ক্ষিত ও বর্জনীয় হবে। শোকানুষ্ঠানে এবং পবিত্র স্থানসমূহে হাসি- ঠাট্টা ও রসিকতা করা অপছন্দনীয় কাজ। [৪৭৪] হাসির স্থান, কাল ও পাত্র সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষভাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে : 'যদি কেউ কোন ব্যক্তির জানাযার অনুষ্ঠানে উপহাস করে হাসে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সবার সামনে তাকে অপমানিত করবেন; তার দোয়া

কবুল হবে না। যদি কেউ কারো কবরস্থানে হাসে তাহলে সে ওহুদ পাহাড়ের মতো কষ্টের বোঝা নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে।[৪৭৫]

এখানে যা আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট হয় যে, যে সকল রেওয়ায়াতে সার্বিকভাবে অথবা শর্তসাপেক্ষে আনন্দ ও আমোদ-প্রমোদকে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো একারণে যে, তাতে ইসলামের সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে এবং বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছেছে। ইসলাম আনন্দ ও খুশি এবং এর উপাদানকে বাস্তবে অপছন্দনীয় মনে করেনি; বরং এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ ও তাগিদ করেছে।

৬. বিশেষ দ্রষ্টব্য :

১. জীবন ভাঙা- গড়া, আনন্দ- বেদনা, খুশি- দুঃখ, আশা- নিরাশা ও ...এর সমন্বয়; জীবনের এ অমসৃণতা থেকে পলায়ন করা সম্ভব নয়। কবি রুদাকির ভাষায় :

‘আরশের অধিকারী আল্লাহ্ করেছেন পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি

যেন কিছু সময় মানুষ হয় খুশি, কিছু সময় হয় দুঃখী।’

২. বিশেষ কিছু রেওয়ায়াতে মুমিনদের সর্বদা দুঃখগুভারাক্রান্ত মানুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো তার অন্তরের দুঃখ ও মর্মপীড়া- যা সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তার জ্ঞান এবং তাদের প্রতি দায়িত্ববোধের

অনুভূতি থেকে উৎসারিত। এ দুঃখ তার মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থা ও মানসিক অস্থিরতার নির্দেশক নয়। তাই তা আনন্দ ও প্রফুল্লতার পরিপন্থী নয়। বাস্তবে এ ধরনের দুঃখের মূলে রয়েছে মানুষের দুঃখগুকষ্টের প্রতি বিশেষ মনোযোগ এবং তাদের সাথে সহানুভূতিশীলতা।[৪৭৬] যেভাবে শেখ শাদী বর্ণনা করেন :

‘আদমসন্তানরা একই দেহের অঙ্গসমূহের মতো

একই বস্তুমূল দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে তাদের দেহ

যদি কোনদিন শরীরের কোন অঙ্গে হয় ব্যথা অনুভূত

অন্যান্য অঙ্গগুলোও হয় পীড়িত।’

৩. আনন্দ ও খুশির কিছু প্রভাবক উপাদান আত্মার ওপর প্রভাব ফেলার সাথে সাথে পরোক্ষভাবে দেহের ওপরও প্রভাব ফেলে। আবার কিছু উপাদান রয়েছে যা সরাসরি মানুষের অন্তরে প্রভাব ফেলে।

এদের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত, আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে গভীর চিন্তা করা, ঈমান বৃদ্ধি ও একে শক্তিশালী করা, দান করা ও গুনাহ মুক্ত থাকা অন্যতম যা সরাসরি আত্মিক আনন্দের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং উপযুক্ত খাবার গ্রহণ, ব্যায়াম, সুগন্ধির ব্যবহার, নিজেকে সজ্জিত ও পরিপাটি রাখা, উজ্জ্বল পোশাক পরিধান, হাঁটার অভ্যাস, সবুজ প্রকৃতি অবলোকন- এ সবই শারীরিক আনন্দের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে; অবশ্য দেহের প্রফুল্লতায় মনেও প্রফুল্লতার সৃষ্টি হয়।

৪. কিছু সংখ্যক মুসলিম অন্তর্মুখী আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, আরেফ যাঁরা অন্তরের প্রভাবকে প্রকৃত প্রভাব মনে করেন, তাঁরা আনন্দ ও খুশিকে মানুষের অন্তরে অনুসন্ধান করেন। তাঁরা আত্মিক প্রেমিক আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার আনন্দকে শারীরিক ও বাহ্যিক আনন্দের চেয়ে উত্তম মনে করেন। আত্মিক পরিভ্রমণকারী দুঃখ ও মর্মপীড়াকে আত্মিক অভিজ্ঞতার এক বিশেষ মাত্রা ও পদমর্যাদা মনে করেন। এ কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজের আনন্দ ও খুশিকে এ ধরনের দুঃখ ও মর্মপীড়ার নিকট উৎসর্গ করেন এবং তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, দুঃখ ও মর্মপীড়ার মাধ্যমে আত্মিক আনন্দ লাভ করা সম্ভব।

‘এমন কাউকে বিশ্বজগতে দেখেছ কি

যে কোন দুঃখ ও মর্মপীড়া ছাড়াই আনন্দিত ও খুশি লাভ করেছে।’[৪৭৭]

তাঁদের বিশ্বাস অনুযায়ী দুনিয়ার আনন্দ ও খুশি স্বয়ং দুনিয়ার মতো যার রোগের কোন উপশম নেই; এর সাথে সবসময় দুঃখের মিশ্রণ রয়েছেই।

‘এ দুনিয়ার বাজারে দুঃখ ছাড়া আনন্দ নেই কোন

বিষাক্ত সাপ ছাড়া কোন রত্ন পাওয়া যায় না জেন

কণ্টকহীন ফুলের সন্ধান করা বৃথা এক চেষ্টা হায়

আনন্দের পথ ব্যথা- বেদনার মধ্যে দিয়ে করেছে অতিক্রম

যদি প্রাসাদে ও নিরাপদ স্থানে বসে কেউ আনন্দ পেতে চায়

তাহলে জেনে রাখ সে এক মূর্খ অধম।'[৪৭৮]

যেহেতু আরেফ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধকরা আল্লাহর প্রেমের মতাদর্শের অনুসারী সে কারণে তাঁরা বিশ্বাস করেন কেবল পবিত্র প্রেম আনন্দ- খুশি ও জীবনের সৃষ্টি করে।

'মৃত্যুবরণ করেছিলাম জীবন লাভ করেছি

প্রেমের সম্পদ হাতে পেয়ে আমি স্থায়ী হয়েছি

আমি তোমার থেকে সৃষ্টি হে চন্দ্রের শহর;

আমার মধ্যেই তোমার অস্তিত্ব খুজে পেয়েছি

তোমার হাসির প্রভাবেই হাসির বাগিচা হয়েছি।'[৪৭৯]

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আধ্যাত্মিক সাধক আরেফরা সর্বজনীন ও পূর্ণ আনন্দের অনুসন্ধান করেন নিজের অস্তিত্বগত বিশেষ ধারণক্ষমতা অনুসারে। প্রকৃত আনন্দে পৌঁছানোর জন্য দুঃখ ও মর্মপীড়াকে স্বাগত জানান, কিন্তু কখনই অন্যদের জন্য দুঃখগুবেদনা কামনা করেন না; তাঁরা সবসময় সতর্ক থাকেন যেন তাঁদের দুঃখের বিষয়টি কোন অবস্থাতেই অন্যরা জানতে না পারে।[৪৮০]

৫৪ নং প্রশ্ন : যদি তোমরা বিশ্বাস কর যে, শহীদদের নেতা ইমাম হোসাইন (আ.) শাহাদাতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতের সর্বোচ্চ স্থান ফানাফিল্লাহয় (আল্লাহর গুণাবলিতে বিলীন হওয়া) পৌঁছেছেন; তাহলে তাঁর জন্য ক্রন্দনের অর্থ কী?

উত্তর : এ ধরনের বক্তব্য দুই দিক থেকে সঠিক নয়। প্রথমত, আবু আবদিল্লাহর জন্য ক্রন্দন করা কেবল তাঁর মযলুম অবস্থায় শহীদ হওয়া ও তাঁর পরিবারের বন্দিদশার জন্য নয়। দ্বিতীয়ত, ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের পরে অন্যান্য ইমাম যাঁরা সত্যের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের অধিবারী ছিলেন এবং যাঁদের কাছে অদৃশ্য জগৎ স্পষ্ট ছিল তাঁরা ইমাম হোসাইনের জন্য ক্রন্দন করার আদেশ দেয়া ছাড়াও নিজেরা কাঁদতেন, শোকানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন এবং অন্যদের এ কাজে উৎসাহিত করতেন। তাঁরা কি কারবালার ঘটনার রহস্য ও দর্শন সর্ম্পকে জানতেন না? নিশ্চয়ই

ইমামের জন্য ক্রন্দনের অন্য কোন দর্শন আছে যার কারণে তাঁদের অনুসারীদেরকে এভাবে শিক্ষা দিতেন।

অন্যভাবে বলা যায়, আশুরার বীরত্বগাথা দুই দিকসম্পন্ন একটি ঘটনা। যদি আমরা ঘটে যাওয়া ঘটনাটিকে এক দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করি তাহলে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছব যে, ইমাম হোসাইন (আ.) ও তাঁর সন্তানরা শহীদ হয়েছেন; তাঁর পরিবার বন্দি হয়েছে; ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া বিজয় লাভ করেছে। যদি ইমামের জন্য ক্রন্দন করাকে এ দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে এ ক্রন্দন কেবল মানবীয় কষ্ট ও দুঃখের অনুভূতি ও আবেগের প্রকাশ- যা এক ব্যক্তির শারীরিক ও আত্মিক কষ্ট সহ্য করা ও অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর কারণে হয়েছে।

এ দৃষ্টিতে ক্রন্দন কেবল দুঃখী ও মযলুম ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করা। এ ধরনের ক্রন্দনের সাথে রাসায়নিক বোমায় নিহতদের জন্য ক্রন্দনের কোন পার্থক্য নেই; একমাত্র পার্থক্য হলো ব্যথার কাঠিন্যের পরিমাণ ও মৃত্যুবরণ করার পদ্ধতির ভিন্নতা।

কিন্তু আশুরার ঘটনাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখলে বুঝতে পারব যে, এ যুদ্ধে ইমাম হোসাইন বিজয় লাভ করেছেন; ইয়াযীদ ও তার সঙ্গীসাথিদের পরাজয় ঘটেছে। বাস্তবে এ দৃষ্টিকোণ থেকে আশুরার ঘটনায় সবচেয়ে সুন্দর গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো (হোসাইনী চরিত্র) সবচেয়ে নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের (ইয়াযীদী চরিত্র) ওপর বিজয় লাভ করেছে। সুতরাং এর একদিকে সুন্দর ও

অনুপমতার বৈশিষ্ট্য থাকলেও অপরদিকে নিষ্ঠুরতা ও কুৎসিত শয়তানি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রন্দন শুধু সহানুভূতি ও সমবেদনার ক্রন্দনের অন্তর্ভুক্ত নয়; অর্থাৎ তা কেবল দুঃখী ও জুলুমের শিকার এক ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ নয়। বরং সত্যের প্রতীক ও বাহকের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা যাঁর অবমাননার মাধ্যমে সত্যের বিজয় ঘটেছে। তাই এ কথা বলা যায় না যে, যেহেতু ইমাম হোসাইন (আ.) ফানাফিল্লাহর মর্যাদা অর্জন করেছেন তাই তাঁর জন্য ক্রন্দন করার অর্থ কী?

৫৫ নং প্রশ্ন : 'ইমাম হোসাইন (আ.) মযলুম ছিলেন'- এ বাক্যটির অর্থ কী?

উত্তর : ন্যায় বিচারের বিপরীতে যুলুমের অর্থ হলো উপযুক্ত কোন ব্যক্তির অধিকার দান না করা। ইমাম হোসাইন (আ.) এ দৃষ্টিকোণ থেকে মযলুম যে, তাঁর ঐশী বেলায়াত বা মুসলমানদের ওপর আল্লাহ্প্রদত্ত কর্তৃত্বের অধিকার তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া মুসলমানদের ওপর তাঁর সর্বজনীন যে অধিকারগুলো ছিল যার অন্যতম হলো রাসূলের উম্মতের পক্ষ থেকে তাঁর ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার[৪৮১], সেগুলো থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে। দুঃখজনকভাবে অপপ্রচারের কারণে বেহেশতের যুবকদের নেতা হিসেবে তাঁর আধ্যাত্মিক ও পার্থিব মর্যাদা তাঁকে দেওয়া হয় নি। মূর্খতা, হিংসা ও বিশ্বাসঘাতকতার অন্ধকারের পর্দা দিয়ে তাঁর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতার মতো চেহারাকে ঢেকে ফেলা হয়েছে এবং তাঁকে পরিপূর্ণভাবে তাঁর ঐশীরূপে প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয় নি।

মুসলমানদের নেতা হিসেবে শহীদদের নেতা ইমাম হোসাইনকে স্বীকৃতি দান না করা এবং তাঁর প্রকৃত মর্যাদাকে গোপন করা- এ দু'টি অপরাধের বিপরীতে তাঁর শাহাদাত সামান্য বলেই গণ্য; যদিও তাঁকে হত্যার অপরাধ হত্যাকারীদের অনন্তকালীন শাস্তির জন্য যথেষ্ট।[৪৮২] কিন্তু মযলুম অবস্থায় তাঁকে হত্যা করার চেয়ে বড় অপরাধ হলো তাঁকে তাঁর মর্যাদা সহকারে না চেনা, তাঁকে তাঁর অধিকার না দেওয়া এবং অন্যদের সামনে তাঁর মহান পরিচয় তুলে না ধরা; এ দু'টিই হল মানবজাতির ইতিহাসে তাঁর প্রতি সবচেয়ে বড় অপরাধ এবং এখন পর্যন্ত এ অপরাধ অব্যাহত রয়েছে। (তার বিপরীতে ইয়াযীদের মতো নরপিশাচকে মুসলমানদের প্রকৃত খলিফা বলে তার ক্ষমতাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।[৪৮৩])

লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, আরবি ভাষায় 'মাযলুম' শব্দটি 'মুনযালাম' শব্দ থেকে ভিন্ন। মুনজালাম শব্দটির অর্থ হলো যে ব্যক্তি অন্যায়কে বরণ করে নেয় এবং কোন প্রতিবাদই করে না; কিন্তু মাযলুম ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার প্রতি অন্যায় করা হয় এবং এর বিপরীতে সে প্রতিবাদ করে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিহত করে। ইসলামী সংস্কৃতিতে অন্যায়কে বরণ করা অনাকাঙ্ক্ষিত ও বর্জিত কর্ম হিসেবে ধরা হয়েছে কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ করাকে কাঙ্ক্ষিত ও পছন্দনীয় ধরা হয়েছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও শোকানুষ্ঠান

৫৬ নং প্রশ্ন : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কোন কোন ভাই কেন ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য শোকানুষ্ঠান ও মার্সিয়া পাঠের বিষয়টির সমালোচনা করেন? এগুলোকে কেন অযৌক্তিক এবং সুন্নাতের পরিপন্থী মনে করেন?

উত্তর : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এই ভাইদের দলিল হচ্ছে ঐ সকল রেওয়ায়াত যেখানে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন ও শোক পালনে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু আহলে সুন্নাতের জ্ঞানী ও হাদীসশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মত অনুসারে এ রেওয়ায়াতগুলো সনদ ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে ত্রুটিমুক্ত নয়। সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকারী মনীষী নাবাবী বলেন : "উল্লিখিত রেওয়ায়াতগুলো হযরত আয়েশার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে নি। তাঁর মতে বর্ণনাকারীরা ভুলে যাওয়া এবং ভুল করার কারণে এভাবে বর্ণনা করেছেন। কেননা, দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ও তাঁর সন্তান আবদুল্লাহ্ এ রেওয়ায়াতগুলোকে সঠিকভাবে রাসূল (সা.) থেকে গ্রহণ করেন নি। ইবনে আব্বাস বলেন : 'এ রেওয়ায়াতগুলো খলিফার নিজস্ব বক্তব্য, রাসূল (সা.)- এর হাদীস নয়।"[৪৮৪]

অন্যদিকে ইতিহাসে আহলে সুন্নাতের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্য সর্বসাধারণের শোক পালনের অনেক উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। যেমন জুয়াইনীর (মৃত্যু ৪৭৮ হিজরি) জন্য লোকেরা শোকানুষ্ঠান করেছিল। যাহাবী মুহাদ্দিস জুয়াইনীর মৃত্যু ও শোকানুষ্ঠানকে এভাবে স্মরণ করেছেন : 'প্রথমে তাঁকে তাঁর বাড়িতে দাফন করা হয়েছিল; এরপর তাঁর মৃতদেহকে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কবরের কাছে স্থানান্তর করা হয়েছিল। শোকের কারণে তিনি যে মিম্বারে বসে বক্তব্য দিতেন তা ভেঙে ফেলা হয়েছিল; বাজারের কেনা- বেচা বন্ধ করা হয়েছিল; তাঁর মুসিবতে অনেক মর্সিয়া পাঠ করা হয়েছিল; তাঁর চারশ' ধর্মীয় ছাত্র তাঁদের শিক্ষকের মৃত্যুশোকে কলম ও কলমদানিগুলো ভেঙে ফেলেছিল; তারা এক বছর তাঁর জন্য শোকানুষ্ঠান পালন করেছিল; তাদের মাথা থেকে পাগড়ি এমনভাবে এক বছর পর্যন্ত খুলে রেখেছিল যে, অন্য কোন ব্যক্তি তা মাথায় দেওয়ার

সাহস পায় নি; তাঁর ছাত্ররা এ সময় পর্যন্ত মর্সিয়া পাঠে রত ছিল এবং তারা চিৎকার ও ক্রন্দনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছিল।’[৪৮৫]

যাহাবী একইভাবে ইবনে জাওযীর (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরি) মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে লিখেছেন : ‘তাঁর মৃত্যুর পর বাজারের কেনা- বেচা বন্ধ করা হয়েছিল; অনেক লোক তাঁর দাফন- কাফনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল...; রমযান মাসের শেষ পর্যন্ত রাত থেকে সকাল পর্যন্ত লোকেরা তাঁর কবরের সামনে উপস্থিত থাকত...; শনিবারে আমরা শোকানুষ্ঠান পালন করেছিলাম।’[৪৮৬]

আশ্চর্যজনক হলো আহলে সুন্নাতের এ সকল ঐতিহাসিক ও আলেম তাঁদের গণ্যমান্য আলেমদের জন্য দ্বীনি ছাত্র ও সাধারণ মানুষের শোকানুষ্ঠান পালনের এ ঘটনাগুলো কোন রকম প্রতিবাদ ছাড়াই সহজভাবে গ্রহণ করেছেন এবং এগুলোর পক্ষে কোন ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন নি; বরং এ ঘটনাগুলোকে তাঁদের জন্য মর্যাদাকর বিষয় হিসেবে স্মরণ করেছেন; কিন্তু আহলে বাইত (.আ), বিশেষ করে ইমাম হোসাইন এর জন্য করা শোকানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে - (.আ) এর বিপরীতে অযৌক্তিক পক্ষাবলম্বন করেছেন? এরূপ দু’ধরনের নীতি অবলম্বনের রহস্য কী?!

৫৭ নং প্রশ্ন : কেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ভাইয়েরা ‘যারা গাল চাপড়ায়, কাপড় ছিন্ন করে ও জাহেলী যুগের মতো দোয়া করে তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়’- এ হাদীসের অনুসরণে শোকানুষ্ঠান পালন করে না?

উত্তর : প্রথমত, এ হাদীসটি ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে কোন ব্যক্তি তার প্রিয় মানুষের মৃত্যুতে নিজেকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে ও কাপড় ছিন্ন করে; এমনভাবে শোক করে এবং এমন ধরনের কথা বলে যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়। তার এ আচরণ থেকে প্রতিপন্ন হয় সে আল্লাহর নির্ধারিত হুকুম মৃত্যুর প্রতি অসন্তুষ্ট। কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য ক্রন্দন আল্লাহর নৈকট্যের উত্তম কারণ; আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন; ইমামদের এবং এ মতাদর্শের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা ও তাঁদের আনুগত্যের পথে নিবেদিত থাকার ঘোষণা। এ ছাড়াও অনান্য দর্শন রয়েছে যেগুলো পূর্বের প্রশ্নের উত্তরে উত্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, (শালীনতা বজায় রেখে) কাপড় ছিন্ন করা বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে। পিতা- মাতা ও ভাইয়ের মৃত্যুতে কাপড় ছিন্ন করাতে কোন সমস্যা নেই। যেভাবে হযরত মূসা (আ.) তাঁর ভাই হারুন (আ.)- এর বিচ্ছেদে এবং ইমাম হাসান আসকারী (আ.) তাঁর পিতা ইমাম হাদী (আ.)- এর শাহাদাতে কাপড় ছিন্ন করেছিলেন।[৪৮৭]

এ কারণে ইমামদের, বিশেষ করে ইসলামী উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোকে ক্রন্দন, মর্সিয়া পাঠ করা, শোকানুষ্ঠান পালন এবং কাপড় ছিন্ন করায় কোন অসুবিধা নেই; বরং তা মানুষের সৌভাগ্য লাভ এবং আল্লাহর নৈকট্যের কারণ হয়ে থাকে।

ঐ ধরনের ক্রন্দন ও শোকগাথাকেই রেওয়ায়াতে তিরষ্কার করা হয়েছে যেগুলো আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্টি সহকারে ঘটে এবং যে সকল পদ্ধতি আরবের জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল। রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াত- 'যারা গাল চাপড়ায়, কাপড় ছিন্ন করে ও জাহেলী যুগের মতো দোয়া করে তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'- এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত শোকানুষ্ঠানের প্রতিই নির্দেশ করে।

কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য শোকানুষ্ঠান অন্য বিষয়। আমাদের সূত্র থেকে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত এ বিষয়ের প্রতি উৎসাহিত করেছে; কারণ, এ শোকানুষ্ঠানের জীবন্ত স্মরণের মধ্যে ইসলামের জীবন ও ফাসিক- যালেম শাসনব্যবস্থার ধ্বংস লুক্কায়িত রয়েছে এবং এর অনেক আত্মিক ও সামাজিক সুফল রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা

ثار الله এর অর্থ

প্রশ্ন নং ৫৮ : ثار الله শব্দের অর্থ কী? ইমাম হোসাইন (আ.)- কে এ নামে অভিহিত করার সপক্ষে কোরআন ও হাদীসের কোন দলিল আছে কি?

উত্তর : ثار শব্দটি ثأر অথবা ثؤرة শব্দ মূল থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে প্রতিশোধ, রক্তের বদলা, রক্তপণ; রক্ত অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়।[৪৮৮]

১. ثارالله শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে যার প্রতিটিরই আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা রয়েছে, যেগুলোর সামগ্রিক অর্থ হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর রক্তের অভিভাবক এবং তিনি নিজেই শত্রুদের থেকে এই মহান ব্যক্তির রক্তের বদলা নিতে চান। কেননা, কারবালায় সাইয়্যেদুশ শুহাদার রক্ত ঝরানো মহান আল্লাহর নিষিদ্ধের সীমা লঙ্ঘন, তাঁর সম্মান বিনষ্ট করা এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার শামিল। সর্বোপরি আহলে বাইত (আ.) হচ্ছেন 'আলুল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহর মনোনীত ও বিশেষজন; এই ইমামদের রক্ত ঝরানোর অর্থ আল্লাহ তা'আলার কাছে সম্মানিত ও তাঁর প্রিয়তম ব্যক্তিদের রক্ত ঝরানো।[৪৮৯]

যদিও এ শব্দটি পবিত্র কোরআনে ব্যবহৃত হয়নি, কিন্তু কোরআনের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ বলেছেন –

(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا)

অর্থাৎ যে অন্যায়ভাবে নিহত হয় নিশ্চয় আমরা তার উত্তরাধিকারীকে (প্রতিশোধ গ্রহণের) অধিকার দান করেছি। (সূরা বনি ইসরাঈল : ৩৩)

যদি কেউ (যে কোন ধর্মের অনুসারী হোক) অন্যায় ও মযলুমভাবে নিহত হয় তাহলে তার অভিভাবকরা তার রক্তপণ আদায়ের অধিকার রাখে। যেহেতু আহলে বাইতের ইমামগণ বিশেষ করে ইমাম হোসাইন (আ.) সত্য, ন্যায় এবং আল্লাহর পথে অসহায় ও মযলুমভাবে শহীদ

হয়েছেন, সেহেতু আল্লাহ নিজেই তাঁর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারী। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ্ই ইমাম হোসাইনের রক্তের উত্তরাধিকারী।

এই কারণে ثأرالله এই অর্থে ব্যবহৃত হয় যে, ইমাম হোসাইনের রক্ত আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত এবং তিনি নিজেই ইমাম হোসাইনের রক্তের বদলা নেবেন। এই শব্দটা আল্লাহর সাথে সাইয়্যেদুশ শুহাদার সুদৃঢ় বন্ধনের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, তাঁকে হত্যার মাধ্যমে যেন আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত ও তাঁর সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত এক ব্যক্তির রক্ত ঝরানো হয়েছে। ফলে তাঁর রক্তের প্রতিশোধ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গ্রহণ করলে হবে না।[৪৯০]

২. যদি ثار শব্দটির অর্থ রক্ত হয়, তাহলে অবশ্যই ثار الله শব্দটি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং তা উপমা হিসেবে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, এ বিষয়টি সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ কোন বস্তুগত অস্তিত্ব নন যে, তাঁর শরীর অথবা রক্ত থাকবে। অতএব, এ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উপমা দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়কে বুঝানো হয়েছে, যেমনভাবে মানুষের শরীরে রক্তের ভূমিকা অর্থাৎ জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা। আল্লাহর দ্বীনের সাথে ইমাম হোসাইনের সম্পর্কও ঠিক সেরকম। আশুরা বিপ্লবই ইসলামকে পুনরায় জীবনদান করেছে।

৩. সম্ভবত এই ব্যাপারটিকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা বিভিন্ন রেওয়ায়াতের দলিলের ভিত্তিতে একটি ভালো ফলাফলে পৌঁছতে পারি। আলী (আ.)- কেও 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ) বা 'ইয়াদুল্লাহ' (আল্লাহর হাত) বলা হয়েছে। 'হাদীসে কুরবে নাওয়াফেল' (নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ সংক্রান্ত হাদীস)- এ মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : 'আমার বান্দা ওয়াজিবসমূহের থেকে অধিক পছন্দনীয় কিছু দ্বারা আমার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে না, তদ্রূপ নফল দ্বারাও আমার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে। তখন আমিও তাকে ভালোবাসি আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শ্রবণ করে এবং আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে, আমি তার জিহ্বা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে কথা বলে, আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে

ধরে, আমি তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে পথ চলে; যদি সে আমার দরবারে দোয়া করে আমি তা পছন্দ করি এবং যদি আমার কাছে কিছু চায় তবে তাকে তা দান করি।'[৪৯১]

এই রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, আল্লাহর ওলীরা হচ্ছেন পৃথিবীর বুকে তাঁর প্রতিনিধি এবং আল্লাহর স্পষ্ট দলিল হিসেবে তাঁর কর্মের প্রকাশকারী। যেহেতু আল্লাহ নিরাকার সেহেতু তাঁর দেহ নেই, কিন্তু তিনি যা ইচ্ছা তা- ই করতে পারেন। তাঁর ওলীদের মাধ্যমেই নিজের গুণাবলির প্রকাশ ঘটান এবং যখন তাঁর কোন বান্দাকে সাহায্য করতে চান তখন তাঁদের মাধ্যমেই তা করেন এবং ধর্মকে বাঁচানোর জন্য যে রক্ত তিনি ঝরাতে চান তা তাঁর ওলীদের শাহাদাতের মাধ্যমেই ঝরান। ঠিক যেভাবে আল্লাহর রাসূল (সা.) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তাঁর হাতকে সবার হাতের ওপর আল্লাহর কুদরাতী হাতের (ইয়াদুল্লাহ) নমুনাস্বরূপ রেখেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তখন এ আয়াত يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ অবতীর্ণ করেন, তেমনি ইমাম হোসাইনের রক্তও 'আল্লাহর রক্ত' (ثارالله) হিসেবে গণ্য হয়েছে। যিয়ারতে আশুরায় আমরা পড়ি :

السلام عليك يا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور

অর্থাৎ 'হে আল্লাহর রক্ত, তাঁর রক্তের সন্তান, তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে নিঃসঙ্গ একাকী!' তেমনিভাবে মরহুম ইবনে কুলাভেই ইমাম হোসাইন (আ.)- এর ১৭ এবং ২৩ নং যিয়ারতে এভাবে বর্ণনা করেছেন :

انک ثارالله فی الارض والدم الذی لا یدرک ترته احد من اهل الارض ولا یدرکه الا الله وحده

যেমনভাবে মানুষের শরীরে রক্তের জীবনসঞ্চারী ভূমিকা রয়েছে এবং রক্ত থাকা বা না থাকার ওপর তার জীবন ও মৃত্যু নির্ভর করে, ইমাম আলী ও ইমাম হোসাইনের উপস্থিতি আল্লাহর নিকট তাঁর ধর্মের জন্য তেমন ভূমিকা রাখে। যদি হযরত আলী (আ.) না থাকতেন তাহলে বদর, উহুদ, খায়বার ও খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হতো এবং ইসলাম টিকে থাকত না; আর যদি ইমাম হোসাইন (আ.) না থাকতেন তাহলে ইসলামের কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। কেননা, আল্লাহ তাঁর মনোনীত বান্দাদের- যখন তাঁরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য

আত্মোৎসর্গী ভূমিকা রাখেন- প্রতি তাঁর ঐশী সাহায্য প্রেরণ করার মাধ্যমেই সকল যুগে তাঁর ধর্মকে টিকিয়ে রেখেছেন।

হ্যাঁ, যতদিন ইমাম হোসাইনের স্মৃতি জগরুক থাকবে, তাঁর নাম মানুষের মুখে মুখে ধ্বনিত হবে, হোসাইনপ্রীতি মানুষের অন্তরে অন্তরে স্পন্দিত হবে, তাঁর বেলায়াত ও প্রেমের শিখা মানুষের হৃদয়ে প্রজ্বলিত থাকবে, 'ইয়া হোসাইন' আহাজারি আকাশে- বাতাসে ধ্বনিত- প্রতিধ্বনিত হবে ততদিন আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর নাম টিকে থাকবে। কেননা, তিনি তাঁর সর্বস্ব আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছেন, উৎসর্গ করেছেন। সত্যকে বিচ্যুতকারী মুনাফিকদের কুৎসিত চেহারা থেকে মুখোশ খুলে দিয়েছেন এবং মহানবীর খাঁটি ও প্রকৃত ইসলামকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। আর তাই তাঁর রক্ত আল্লাহর রক্তের মর্যাদা পেয়েছে।

আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমায় ক্রন্দনের ভূমিকা

প্রশ্ন নং ৫৯ : এরফান ও অধ্যাত্মবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম হোসাইনের জন্য শোক প্রকাশ ও ক্রন্দন- আহাজারিকে কিভাবে আল্লাহর ভালোবাসা ও আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণের (আল্লাহর দিকে যাত্রা) সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে?

উত্তর : মনের দহন এবং ক্রন্দন : একজন আধ্যাত্মিক সাধকের কাছে ঐকান্তিকতার সাথে ক্রন্দন ও অন্তর্জ্বালা প্রকাশ অত্যন্ত প্রিয় একটি কাজ এবং তাঁরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য এরূপ অনুভূতি সৃষ্টিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করেন এবং সবসময় তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করেন। যদি তিনি প্রকৃতই সেটা অর্জনে ব্যর্থ হন অর্থাৎ শোকে মুহ্যমান হয়ে অশ্রু না ঝরাতে পারেন, তবে অন্ততপক্ষে ঐকান্তিকতার সাথে কান্নার ভাব অর্জনের জন্য একাগ্রচিত্ত হন।

সর্বোপরি ইবাদতের পথপরিক্রমায় ইস্তিগ্ফারের (ক্ষমা প্রার্থনা) সময়ই হোক অথবা যে কোন অবস্থায়, ক্রন্দন ও দগ্ধ হৃদয়ে অনুভূতি ব্যক্ত করার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কখনই এ অনুভূতি ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয় এবং এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। হৃদয়ের দহন এবং ক্রন্দন

ভালোবাসার কারণে হোক অথবা ভয়ে, ইস্তিগফারের অবস্থায় হোক অথবা কোরআন পড়া অথবা শোনার সময়, সিজদায় অথবা অন্য যে কোন অবস্থায় হোক, অবশ্যই তা গভীর অনুধাবন ও অন্তর্দৃষ্টি থেকে উৎপত্তি লাভ করে। যে উপলব্ধি করতে পারে সেই দগ্ধ হয় ও অশ্রু ঝরায় আর যে উপলব্ধি করতে পারে না সে দগ্ধও হয় না এবং অশ্রুও ঝরায় না।

সূরা বনি ইসরাঈলের ১০৭- ১০৯ নং আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব, এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যারা অনুধাবন করতে পারে তারা পবিত্র কোরআনের আয়াতের সামনে বিনয়ী ও নম্র হয় এবং ক্রন্দন করে :

(قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٨) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا)

"(হে নবী) তুমি বল, তোমরা একে (কোরআনকে) বিশ্বাস কর আর না- ই কর, নিশ্চয় যাদেরকে এর আগে (আসমানি কিতাবের) জ্ঞান দেয়া হয়েছে যখনই তাদের সামনে এটি পড়া হয় তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তখন তারা বলে : 'আমাদের প্রভু পূত- পবিত্র মহান, অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা পূর্ণ হবে।' আর তারা ক্রন্দন করতে করতে নত মস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে; (মূলত এ কোরআন) তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি করে। "

একজন নিষ্ঠাবান আধ্যাত্মিক সাধককে এই আয়াতগুলোর তাৎপর্য গভীরভাবে বোঝার উপদেশ দিচ্ছি; কারণ, এটা আল্লাহর মহা সত্যবাণী।

যে কোন সুগভীর জ্ঞান ও বিবেক- বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত এবং শোনার সাথে সাথে এর সত্যতা ও যথার্থতা বুঝতে পারবে ও অন্তরে তা বিশ্বাস করবে। প্রভুর অঙ্গীকারসমূহকে সুনিশ্চিতভাবে দেখতে এবং উপলব্ধি করতে পারবে। ফলশ্রুতিতে তার বিনয়, নম্রতা ও ঈমান অনেক গুণে বৃদ্ধি পাবে। ঐশী উৎসাহ, উদ্দীপনা, আকুলতা এবং আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা তার সমগ্র অস্তিত্বকে ছেয়ে ফেলবে। তখন তার চেষ্টা ও সাধনা আরো গতিশীল ও পূর্ণতা লাভ করবে। দারিদ্র ও দুনিয়াবিমুখতার পথ বেছে নেবে, আল্লাহর সম্মুখে

সিজদায় লুটিয়ে পড়বে ও দগ্ধ হৃদয়ে অশ্রু ঝরাবে। তার অন্তরের দহন ও নয়নের অশ্রু যেন আল্লাহর দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাঁর অনুগ্রহ লাভের আশায় রয়েছে।

যে মহাসত্য ও বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে পারেনি সে যে নিজের জাহান্নাম নিজেই তৈরি করেছে- এবং তার মধ্যে হাত- পা ছুঁড়ছে- তা অনুভব করতে পারেনি। সে তার অন্তরের ওপর যে পর্দা পড়েছে এবং যা পড়ার কারণে সে বিভিন্ন রূপ বিপদে পতিত হচ্ছে তা বুঝতেই পারেনি।

বলে রাখা দরকার যে, উল্লিখিত আয়াতে যে জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম দর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে- এবং ঐ বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের ক্রন্দনকারী হিসেবে পরিচিত করানো হয়েছে- তা শাস্ত্রীয় বা তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়; বরং অন্য এক জ্ঞান ও দর্শন। তা না হলে কত বিদ্বান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানী আছেন যাঁরা শাস্ত্রীয় এবং তাত্ত্বিক জ্ঞানের অধিকারী, কিন্তু তাঁদের মধ্যে এই বিশেষত্ব নেই।

সর্বাবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে হৃদয়ের জ্বালা প্রকাশ এবং ক্রন্দন করা আল্লাহর পরিচয় লাভকারী এবং আল্লাহর জ্ঞানে ধন্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানীদের বিশেষত্ব। পবিত্র কোরআন এটাকে নবিগণের- যাঁরা সকল আধ্যাত্মিক সাধক এবং ঐশী জ্ঞানের অধিকারীর শিক্ষক- বিভিন্ন গুণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। সূরা মারইয়ামে আল্লাহর মনোনীত কিছুসংখ্যক বান্দা ও নবীকে তাঁদের বৈশিষ্ট্যসহকারে স্মরণ করা হয়েছে। তাঁদের ব্যাপারে বলা হয়েছে :

(أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا)

‘এরা হচ্ছে আদমের বংশধর সেসব নবী যাদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলা অনুগ্রহ করেছেন এবং যাদের তিনি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছেন এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশধর, যাদেরকে আমি পথপ্রদর্শন করেছি এবং মনোনীত করেছি, যখনই তাদের সামনে পরম করুণাময় আল্লাহ তা‘আলার আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো তখন এরা ক্রন্দনরত অবস্থায় সিজদায় লুটিয়ে পড়ত।’ (সূরা মারইয়াম : ৫৮)

(إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا و بُكِيًّا)

অর্থাৎ যখন তাদের সামনে পরম করুণাময় আল্লাহর তা‘আলার আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো তারা ক্রন্দনরত অবস্থায় আল্লাহকে সিজদা করার জন্য মাটিতে লুটিয়ে পড়ত।

এই অংশটি (আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াতের সময়) তাঁদের বিনয় ও নম্রতার সাথে সিজদা করা এবং ক্রন্দনের সংবাদ দেয়। তাঁদের এই কান্না আল্লাহর ভালোবাসায় হোক আর তাঁর ভয়েই হোক।

এই আয়াতে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে রহস্যময় সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহর নির্বাচিত একদল নবীর প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের ব্যাপারে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, এরাই হলো তাঁরা যাঁদের সম্পর্কে পূর্বে (এ সূরায় উক্ত আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে) বলা হয়েছে। এরাই তাঁরা আল্লাহ যাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন-

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ অতঃপর আয়াতের শেষে

(إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا و بُكِيًّا)

এই বাক্যটি দ্বারা তাঁদের বিনয়ের সাথে মাথা নত করে অশ্রু ঝরানোকে আল্লাহর অনুগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি এ সূক্ষ্ম ও গূঢ় রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, মহান আল্লাহ যাঁকেই বিনয় ও নম্রতার সাথে তাঁর সামনে মাথা নত করা এবং মনের সুখ-দুঃখ প্রকাশ করার ক্ষমতা দান করেন তা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ, রহমত ও ফযিলত।

হে ভাই! মনের হাসি, দুঃখ ও কান্নার

প্রতিটিরই রয়েছে আলাদা উৎসমূল,

জেনে রাখ তায়

এও জেনে রাখ, রয়েছে প্রতিটির স্বতন্ত্র ভাণ্ডার ও চাবি

রয়েছে যা এক মহা উন্মোচকের হাতের মুঠোয়[৪৯২]

হাফেজ বলেন :

ভোর রাতের এত বেদনা ও ক্রন্দন

সবই জানি তোমার থেকে হে পরমজন!

কোরআনের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে-

(وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ)

যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে আল্লাহ তার অন্তরকে পথ দেখিয়ে দেন।

রাসূল (সা.)ও বলেছেন[৪৯৩]:

قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن

মুমিনের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝে অবস্থান করছে।

ইমাম বাকের (আ.) বলেছেন[৪৯৪] :

ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله,يقلبها كيف يشاء,ساعة كذا,وساعة كذا

নিশ্চয় অন্তরসমূহ আল্লাহর আঙ্গুলগুলোর দু'টির মাঝে রয়েছে; তিনি যেমনভাবে চান তা পরিবর্তন করেন, একেক সময় একেক রকম।

এই দুই রেওয়ায়াত থেকে প্রত্যেকে তার ধারণক্ষমতা অনুযায়ী এ বিষয়টি বুঝতে পারে।

প্রথম রেওয়ায়াত থেকে বোঝা যায় যে, ঐ ব্যক্তির অন্তর প্রকৃতই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তা তাঁর রহমান নামের পূর্ণ অধীনে রয়েছে এবং এই নামের কিরণ ও তাজাল্লীর ছায়ায় প্রতিপালিত ও প্রশিক্ষিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ঈমান আনয়নকারীদের অন্তরসমূহ তাদের যোগ্যতা এবং ধারণক্ষমতা অনুযায়ী আল্লাহর 'রহমান' নামের বিভিন্ন স্তরের প্রকাশের নিয়ন্ত্রণাধীন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়াত থেকে বোঝা যায় যে, অন্তরসমূহ- বিশ্বাসীদের অন্তর হোক বা যে কোন অন্তর- 'আল্লাহ' নামের নিয়ন্ত্রণাধীন। আর এই পবিত্র ও বরকতময় নামের বিভিন্নরূপ প্রকাশ রয়েছে। তিনি তাঁর ইচ্ছামত প্রত্যেক হৃদয়কে এ নামের বিশেষ তাজাল্লি দ্বারা পরিচালিত করেন এবং ব্যক্তির প্রবণতা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী তার অবস্থার পরিবর্তন করেন, একেক সময় একেক রকম।

সালেক (আধ্যাত্মিক যাত্রী)- কে অবশ্যই আন্তরিকতার সাথে ক্রন্দন করাটাকে তার বন্দেগির পথে সর্বাবস্থায় ও সর্বস্থানে নিজের জন্য সুবর্ণ সুযোগ মনে করতে হবে। বিশেষ করে এই মাকামে (মাকামে ইস্তিগফারে) যা কিছু মনের দহন দ্বারা অর্জিত হয় তার কদর তারা ভালোভাবেই জানে। যখনই এমন তাওফিক লাভ হয় তখন ইস্তিগফারের সাথে আকুতি মিনতি এবং অনুনয় প্রার্থনাকে

অন্য কোন কিছুর বিনিময়ে হাতছাড়া করে না। সে সতর্ক থাকে যে, শত্রু যেন তাকে ধোঁকা দিতে না পারে এবং তার সম্মুখে যে রাস্তা উন্মুক্ত হয়েছে শয়তান সূক্ষ্ম চক্রান্ত দ্বারা সে পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে না পারে। সুতরাং অনুনয়- বিনয়, প্রার্থনা ও ইস্তিগফার কখনই বন্ধ করে না, নিজের এ অবস্থাকে বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে এবং অন্য সময়ে তা হবে এমন মনে করে অমনোযোগী হয় না। কারণ, সে জানে যে, এই সৌভাগ্য এত সহজে অর্জন করা যায় না এবং এই সুযোগ সবসময় আসে না। ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন :

اذا اقشعر جلدک و دمعت عیناک، فدونک دونک، فقد قصد قصدک.

'যখন তোমার দেহ আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হয় এবং তোমার চোখ থেকে অশ্রু বর্ষিত হয়, তখন জেনো, তিনি তোমার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন বলেই তুমি এমন অনুভূতির অধিকারী হয়েছ।'[৪৯৫]

শোক ও কান্নার অন্য দিক : আরেফদের হৃদয়ের শোক এবং প্রেমাসক্ত ও ভীতদের কান্নার পর্দার একদিকে যেমন রয়েছে হৃদয়ের দগ্ধতা অন্যদিকে তেমনি রয়েছে স্বস্তি, আনন্দ, উপভোগ এবং মর্যাদার অনুভূতি।

এখন রাসূল (সা.) এবং ইমামদের বাণী থেকে এর অর্থ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

দগ্ধ হৃদয়, কান্না এবং মানসিক প্রশান্তি

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : 'কিয়ামতের দিন প্রতিটি চক্ষু থেকেই অশ্রু ঝরবে, কিন্তু ঐসব চক্ষু ছাড়া যেসব চক্ষু আল্লাহর নিষেধসমূহকে পরিহার করে চলেছে এবং ঐ চক্ষু যে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য জাগ্রত থেকেছে এবং ঐ চক্ষু যে গভীর রাতে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে।'[৪৯৬]

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, পর্দার এ পাশে গভীর রাতে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী মুখটিই পর্দার ওপাশে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রশান্ত এবং নিশ্চিন্ত রূপে প্রকাশিত হবে। কেননা, কিয়ামতের দিন পর্দার অন্তরালের গোপন বিষয়গুলো প্রকাশ হওয়ার দিন।[৪৯৭] ঐ দিন পর্দার আড়ালে থাকা সত্যই সামনে হাজির হবে।

দুঃখ, কান্না ও আনন্দ উপভোগ

রাসূল (সা.) বলেছেন : আল্লাহ্ তা‘আলা শোকাহত ও ব্যথিত হৃদয়কে ভালোবাসেন। [৪৯৮]

আল্লাহর ভালোবাসার অর্থ বান্দাদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা। যার ফলে হাদীসের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বান্দার হৃদয় যখন পর্দার এ পাশে শোক ও কান্নায় বিহ্বল তখন পর্দার অপর দিকে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

আর এই আকৃষ্ট হওয়ার মধ্যে অন্য রকম আনন্দ উপভোগ করা যায়। ইমাম বাকের (আ.) বলেছেন : ‘আল্লাহর নিকট রাতের অন্ধকারে আল্লাহর ভয়ে এবং কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি কামনায় যে অশ্রুবিন্দু ঝরে তার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন কিছু নেই।’[৪৯৯]

এটা এই অর্থে যে, বান্দা রাতের অন্ধকারে আল্লাহর ভয়ে যে অশ্রু ঝরায় ও আকুতি প্রকাশ করে তা তাঁর নিকট খুবই প্রিয় অর্থাৎ এ দুঃখ ও কান্নার আড়ালে তার হৃদয় তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং সে মহান প্রভুর সান্নিধ্য লাভের আনন্দ উপভোগ করছে। পর্দার আড়ালের ঐশী আকর্ষণই আধ্যাত্মিকতার পথিককে সর্বক্ষণ আকৃষ্ট করে রেখেছে এবং এই আকর্ষণই এই জগতে শোক-দুঃখ ও অশ্রুর আকৃতিতে প্রকাশিত হয়। একদিকে মনের দুঃখ, পেরেশানি ও অশ্রু বিসর্জন অন্যদিকে মনের আনন্দ, পবিত্র পানীয়ের স্বাদ আস্বাদন এবং তাঁর দর্শনের আনন্দ উপভোগ। যদি কারো এপার ওপার দু’পারে কী ঘটছে দেখার সুযোগ থাকে অর্থাৎ তিনি আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছান, তখন এপারে ও ওপারে উভয় জগতের আশ্চর্যজনক জিনিস দেখতে পারবেন। তিনি এক ব্যক্তিকে একই সময়ে পরস্পর বিপরীত দুই অবস্থায় দেখতে পাবেন।

এই দিকে (দুনিয়ায়) তাকে শোকাহত, অশ্রু বিসর্জনকারী ও আবেদন- নিবেদনকারী রূপে দেখতে পাবে। অন্যদিকে (আখেরাতে) পবিত্র পানীয় পানের আনন্দ, ঐশী দর্শনের স্বাদ আস্বাদনরত অবস্থায় দেখবে। এরূপ মর্যাদা আসলেই বিস্ময়কর যে, দুঃখের মাঝে আনন্দ, আনন্দের মাঝে দুঃখ, কান্নার মাঝে হাসি এবং হাসির মাঝে কান্না।

এর চেয়ে বেশি আশ্চর্যজনক যে, আমরা ধারণা করি এ বিশ্বজগতের প্রকৃত স্বরূপ, গভীর রহস্য এবং গোপনীয়তা সম্পর্কে আমরা কিছুটা হলেও বুঝেছি। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি কখনই এরূপ নয়। কারণ, সত্যের রূপকে যে দেখবে তার অবস্থা ইমাম হোসাইনের সঙ্গীদের মতো হবে, যাঁরা আশুরার রাতে ক্রন্দনের মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়ার আনন্দ উপভোগ করেছেন। আর এজন্যই নিজেদের সমগ্র সত্তাকে তাঁর পথে এভাবে বিসর্জন দিতে পেরেছেন।

শোককান্না এবং মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ

ইমাম সাদিক (আ.) এক রেওয়ায়াতে আবি বাছিরকে দোয়া এবং কান্না সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন যেখানে তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা ইমাম বাকের (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন : 'মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর বান্দার মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অবস্থা হচ্ছে সিজদায় ক্রন্দনরত অবস্থা।'[৫০০]

এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এ কর্মের বাহ্যিক দিক হলো ক্রন্দনরত অবস্থায় সিজদায় লুটিয়ে পড়া, কিন্তু এর অভ্যন্তরীণ দিক হলো মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের আনন্দে আপ্লুত হওয়া।

কারবালার আন্দোলন আবেগতাড়িত নাকি বিজ্ঞতাপূর্ণ পদক্ষেপ

প্রশ্ন নং ৬০ : অনেকে বলেন : 'আশুরার দিনে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কাজগুলো নিতান্তই প্রেমপ্রসূত ছিল- বিজ্ঞতাপ্রসূত ছিল না।' একথার অর্থ কি এটাই দাঁড়ায় না যে, ইমামের কাজগুলো ছিল বুদ্ধিবৃত্তিবিরোধী?

উত্তর : মানুষের মধ্যে সবসময়ই ভালো এবং মন্দের দ্বন্দ্ব লেগে আছে, সাধারণত তাকে 'জিহাদে আকবার' (বড় জিহাদ) বলা হয়ে থাকে। অথচ এটা জিহাদে আওসাত (মধ্যম জিহাদ)।

মানুষ যখন তার জ্ঞান, বিবেক দিয়ে মনের কু- প্রবৃত্তি ও গুনাহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে তা হচ্ছে জিহাদে আওসাত (মধ্যম জিহাদ)। কেননা, সে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হতে চায়। এর পরের পর্যায় হচ্ছে জিহাদে আকবার- যা হচ্ছে ভালোবাসা ও বিবেক, প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিকতা এবং বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ দর্শনের যুদ্ধ।

এই পর্যায়ে যদিও সে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের ভিত্তিতে কোন সত্যের তাৎপর্যকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং প্রমাণসমূহের দ্বারা তাকে প্রতিষ্ঠিত করে একটি সমাধানে পৌঁছে, কিন্তু তার অন্তর- যা প্রেম- ভালোবাসার কেন্দ্র তা কখনোই বুদ্ধিবৃত্তিক তাৎপর্যকে (অর্জিত জ্ঞানকে) যথেষ্ট মনে করে না; বরং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বাস্তবতাকে অনুভব করতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কামনা করে। অর্থাৎ যা কিছু বুঝতে পেরেছে তা আত্মা দিয়ে অবলোকন করতে চায়।

এই কারণে এর পর থেকেই প্রেম এবং বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং জিহাদে আকবার শুরু হয়। অবশ্য এতে কোন দোষ নেই। কেননা, দু'টিই সত্যের সন্ধান পেয়েছে, কিন্তু একটি সত্যকে বুঝেছে অপরটি সত্যে পৌঁছেছে। প্রকৃত অর্থে একটি সত্য, আরেকটি চূড়ান্ত সত্য। একটি ভালো আর অপরটি খুব ভালো। একটি পূর্ণতার নিম্নতর স্তর আরেকটি পূর্ণতার উচ্চতর পর্যায়। এই কারণে আল্লাহর ওলী ও প্রেমিকদের কাজগুলো প্রেম- ভালোবাসার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : 'সর্বোত্তম মানুষ তিনিই যিনি প্রেমের মাধ্যমে ইবাদত করেন।'[৫০১]

সেই ব্যক্তিই ইবাদতের স্বাদ পায় এবং জান্নাত ও জাহান্নামের প্রকৃত রূপ দেখতে পায়।

বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান মূলত দলিল- প্রমাণ দিয়ে দোযখ এবং জাহান্নামের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কিন্তু প্রেম ও মন বলে যে, আমি (এ পৃথিবীতেই) দোযখ ও বেহেশত্ দেখতে চাই। যে ব্যক্তি দলিল- প্রমাণের মাধ্যমে কিয়ামত, বেহেশত, জান্নাত ইত্যাদিকে সত্য হিসেবে গণ্য করে সে হচ্ছে জ্ঞানী। কিন্তু যে ব্যক্তি বেহেশত ও দোজখ দেখতে চায় সে হচ্ছে প্রেমিক পুরুষ।

সাইয়্যেদুশ শুহাদার (ইমাম হোসাইন) কাজগুলো প্রেমপূর্ণ ছিল, আর সে প্রেম জ্ঞানের ঊর্ধ্বে- জ্ঞানহীনতা নয়। এক সময় বলা হয়ে থাকে, অমুক কাজ বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অর্থাৎ যে কাজ কেবল ধারণা এবং কল্পনার ভিত্তিতে হয়েছে। কিন্তু কখনো কখনো কাজ এমন হয়ে থাকে যে, শুধু

বিজ্ঞতাপূর্ণই নয়; বরং তার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের প্রেমপূর্ণ। অর্থাৎ যা কিছু বুঝেছে নিজের মধ্যে তা পেয়েছে ও অর্জন করেছে।

যখন মানুষ বাস্তবতার মর্মে পৌঁছে তখন সে প্রেমসুলভ আচরণ করে। তখন তার ক্ষেত্রে জ্ঞানের কোন ভূমিকাই নেই। এই ভূমিকা না থাকার অর্থ এই যে, জ্ঞানের আলো তার চেয়ে অনেক বেশি তীব্র এক আলোক রশ্মির নিচে ঢাকা পড়েছে। এই কারণে নয় যে, জ্ঞানের আলো নিভে গেছে এবং আলো নেই। দু'টি অবস্থায় জ্ঞান অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং মানুষের কাজ- কর্ম জ্ঞান অনুযায়ী হয় না :

১. যখন মানুষ ক্রোধ এবং কুপ্রবৃত্তির বশে পাপ কাজে লিপ্ত হয় তখন তা বুদ্ধিমানের কাজ নয়; বরং বোকামিপূর্ণ। এর উদাহরণ হচ্ছে চন্দ্রগ্রহণের সম্মুখীন চাঁদের মতো যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই রূপ অবস্থায় জ্ঞানের আলো নেই। পাপীর জ্ঞান চন্দ্রগ্রহণ হওয়া চন্দ্রের মতো। হযরত আলী (আ.) এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন : 'এমন অনেক বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেক রয়েছে যা প্রবৃত্তির কর্তৃত্বের হাতে বন্দি (অর্থাৎ তার বুদ্ধিবৃত্তি তার কুপ্রবৃত্তির নির্দেশের দাস হয়ে পড়েছে)।'

২. এক্ষেত্রে জ্ঞানের আলো আছে, কিন্তু এর কার্যকারিতা নেই। এটা ঐ সময়ে যখন জ্ঞানের আলো তার চেয়ে শক্তিশালী আলোক রশ্মির নিচে থাকে। যেমন দিনের বেলায় তারার কোন কার্যকারিতা (কোন আলো) নেই। এই কার্যকারিতা না থাকা এই কারণে যে, সূর্যের আলো আকাশকে আলোকিত করে রেখেছে, তার আলোক রশ্মির নিচে তারার আলো রঙ হারিয়ে ফেলেছে। তারার আলো না থাকা বা তা নিষ্প্রভ হওয়ার কারণে এমন হয়নি; বরং সে সূর্যের বিপরীতে ম্রীয়মাণ হয়ে পড়েছে। যে প্রেমাসক্ত হয়েছে তার জ্ঞান আছে এবং আলোও আছে, কিন্তু জ্ঞানের আলো প্রেমের আলোক রশ্মির নিচে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে।

কারবালায় ইমাম হোসাইন (আ.)- এর ক্ষেত্রে বিষয়টি এই রকমই ছিল অর্থাৎ তাঁর কাজ শুধু বুদ্ধিমানের মতোই ছিল না; বরং তার চেয়েও উচ্চতর ছিল। কেননা, তা প্রেমপূর্ণও ছিল।

আশুরার সৌন্দর্য

প্রশ্ন নং ৬১ : কীভাবে আশুরার সৌন্দর্য এবং যায়নাব (আ.)- এর এই উক্তি “ما رایت الا جمیلا ” - ‘আমি সুন্দর ছাড়া কিছুই দেখিনি’- কে উপলব্ধি করা সম্ভব?

উত্তর : কখনও কখনও মহত্ত্ব কোন বিষয়কে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে থাকে, ঐ জিনিসে নয়- যাকে দেখা হয়। যেমন কেউ কেউ বলেছেন, কখনও কখনও সৌন্দর্য থাকে মানুষের চোখে এবং দৃষ্টিতে, ঐ বস্তুতে নয়- যাকে দেখা হয়। ‘আল্লাহর সৃষ্ট এ জগৎ হলো সর্বোত্তম সৃষ্টিব্যবস্থা’- যদি কেউ এই দৃষ্টিকোণ থেকে সকল অস্তিত্বের দিকে তাকায় তবে অনেক অদৃশ্য বিষয়কে সে দেখতে পাবে এবং তাকে সুন্দরও দেখবে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমরা কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে অস্তিত্ব বা ঘটনাটিকে দেখছি।

সুন্দর দৃষ্টিতে অস্তিত্ব জগৎ ও জীবনকে দেখলে একদিকে আত্মা ও বিবেক প্রশান্তি লাভ করে অন্যদিকে তা মনে এমন অবিচলতা, দৃঢ়তা এবং পৌরুষের সৃষ্টি করে যা অপ্রিয় জিনিসসমূহকে সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই দৃষ্টিতেই আশুরা হযরত যায়নাব কুবরা (সা.আ.)- এর কাছে সুন্দর ব্যতীত কিছুই ছিল না। যখন শত্রুরা এ ঘটনাকে আহলে বাইতের জন্য অবমাননাকর গণ্য করে কটাক্ষ ও বিদ্রূপ করছিল তখন বীরঙ্গনা নারী যায়নাব ما رایت الا جمیلا (আমি সুন্দর ছাড়া কিছুই দেখিনি) বলে তাদেরকে জবাব দিয়েছেন।[৫০২]

ইমাম হোসাইন (আ.) এই সফরের শুরুতেই আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, যা কিছু ঘটবে আল্লাহর ইচ্ছায় তা যেন তাঁর এবং তাঁর সাথিদের জন্য মঙ্গলকর হয়। আর তা বিজয়ের দ্বারাই হোক আর শাহাদাতের মাধ্যমেই হোক।

ارجو ان یکون خیرا ما اراد الله بنا قتلنا ام ظفرنا অর্থাৎ আমি আশা করছি আল্লাহর ইচ্ছায় যা- ই সংঘটিত হোক তা আমাদের জন্য মঙ্গলই হবে, শহীদ হই অথবা বিজয়ী হই।[৫০৩]

বোনের দৃষ্টিতে ঘটনাটি সৌন্দর্যময় হওয়া এবং ভাইয়ের দৃষ্টিতে তা মঙ্গলজনক হওয়া এ দু'টি একে অপরের পরিপূরক। কারবালার দর্পণের অনেক সৌন্দর্যের দ্যুতি ছড়িয়ে আছে। তার থেকে আমরা এখানে কিছু দিকের উল্লেখ করব।

১. মানুষের পূর্ণতার দ্যুতি : মানুষ যে কত ঊর্ধ্বে আরোহণ এবং কতটা খোদায়ী রঙ ধারণ করতে পারে যে, তাঁর (তাজাল্লির) মধ্যে বিলীন হতে পারে তা কর্মের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। কারবালা দেখিয়ে দিয়েছে মানুষের আত্মার মর্যাদা কত বেশি এবং এর ঊর্ধ্বগামিতা ও পূর্ণতার সীমা কতদূর পর্যন্ত হতে পারে! এই মহান ঘটনা প্রমাণ করেছে যে, মানুষের মর্যাদা সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে। মূল্যবোধের অনুসন্ধানকারীদের কাছে এ দিকটি অনেক মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত।

২. আল্লাহর সন্তুষ্টির উজ্জ্বলতম প্রকাশ : আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন পর্যায়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হওয়ার মর্যাদায় পৌঁছানো অনেক কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। যদি হযরত যায়নাব (আ.) কারবালার ঘটনাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত মনে করেন তা আল্লাহর ওলী সাইয়্যেদুশ শুহাদা, তাঁর সঙ্গী সাথি এবং পরিবার- পরিজনের কর্মে যে মহান বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশিত হয়েছে তার কারণে।

সত্যিই হোসাইন ইবনে আলী (আ.) ব্যথা অথবা নিরাময় এবং মিলন অথবা বিরহের মধ্যে কোন্টাকে বেছে নেবেন তা নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। অতঃপর যা কিছু মহান প্রেমময় সত্তা আল্লাহ পছন্দ করেন তা- ই পছন্দ করেছিলেন।

কারবালা আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি মানুষের সন্তুষ্টির উজ্জ্বলতম প্রকাশস্থল। ইমাম হোসাইন (আ.) জীবনের শেষ মুহূর্তে শহীদ হওয়ার স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত এ কথাটির পুনরাবৃত্তি করছিলেন-

الهی رضی بقضائک

('হে আল্লাহ! আমরা তোমার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট') । নিজের বোনকেও তিনি এই উপদেশ দিচ্ছিলেন- ارضی بقضاء الله ('আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাক') । এটা আধ্যাত্মিকতার উচ্চ পর্যায়। অর্থাৎ নিজেকে মোটেই না দেখা এবং কেবল আল্লাহকেই দেখা। আল্লাহর পছন্দের মোকাবিলায় নিজের কোন পছন্দ না থাকা। তিনি মক্কা থেকে কুফার দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেও তাঁর বক্তৃতায় বলেন : رضا الله رضانا اهل البیت ('আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমাদের অর্থাৎ আহলে বাইতের সন্তুষ্টি') ।[৫০৪]

এটাই হচ্ছে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর ভালোবাসা এবং আত্মোৎসর্গের ভিত্তি। আর যায়নাব (আ.) এটাকেই সুন্দর বলেছেন এবং এই চিন্তাধারা ও জীবনধারাকেই প্রশংসা করেছেন।

সত্যমিথ্যার সীমারেখা : আশুরার অন্যান্য সৌন্দর্যের মধ্যে একটি হলো সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য এবং হিংস্র স্বভাবের মানুষ ও ফেরেশতার মতো মানুষের অবস্থান ও কর্মের সীমা পরিষ্কার করে দেওয়া। যখন ভালো- মন্দ, সত্যমিথ্যা মিশ্রিত হয়ে পড়ে, মিথ্যার অন্ধকাররাশি সত্যকে অস্পষ্ট ও আচ্ছাদিত করে দেয়, সেই অন্ধকারময় অবস্থায় মানুষের চিন্তাধারায় বিকৃতি ঘটা ও মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। আর তখন অস্পষ্ট মুখোশধারী কুফর ইসলামের বেশ ধরে সহজ- সরল মুসলমান এবং অগভীর দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষদের সত্য সম্পর্কে সন্দেহে ফেলে দেয়। ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কর্মের সৌন্দর্য হচ্ছে যে, তিনি এমন এক মশাল জ্বালিয়েছেন যেন সত্যপথ পরিষ্কার হয় এবং অন্ধকার দূরীভূত হয়। মেষের পোশাকে আসা নেকড়েস্বরূপ ‘ফিতনা ও মিথ্যার চেহারা’ প্রকাশিত ও চিহ্নিত হয় এবং তাদের প্রতারণা বা ধোঁকা যেন আর কার্যকর না হয়। এটা কি সুন্দর নয়?

আশুরা ছিল সত্যমিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়কারী একটি সীমানা যা নামধারী মুসলমানদের থেকে প্রকৃত মুসলমানদের চিহ্নিত করেছে। কারবালায় পরম করুণাময়ের অনুসারীরা এবং শয়তানের বাহিনী পৃথক প্লাটফর্মে আবির্ভূত হয়েছে। যেহেতু মিথ্যা কারবালায় মুখোশবিহীন অবস্থায় ময়দানে এসেছিল সেহেতু সত্য নিশ্চিন্তে ও অকুণ্ঠ চিত্তে মিথ্যার মোকাবেলায় নেমেছিল। যদিও তারা প্রতারণামূলকভাবে ইমাম হোসাইনকে হত্যার উদ্দেশে আগতদের يا خيل الله اركبی (‘হে আল্লাহর সৈন্যরা! যুদ্ধের জন্য আরোহণ কর’) স্লোগান দিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিল।

যদি তাদের পরিচয় স্পষ্ট হওয়ার পথে সামান্য কিছু অস্পষ্টতা থেকেও থাকে তবে সিরিয়া এবং কুফায় যায়নাব (আ.)- এর বক্তৃতার মাধ্যমে তা দূরীভূত হয়েছিল। এটা রক্তাক্ত আশুরার একটি অতি মূল্যবান সৌন্দর্য।

৪. প্রকৃত বিজয়ের দীপ্তি : আশুরার অপর একটি সৌন্দর্য হচ্ছে বিজয়ের নতুন এক অর্থ ও তাৎপর্য দান। কিছুসংখ্যক ব্যক্তি ভুলবশত কেবল সামরিক বিজয়কেই বিজয় এবং অত্যাচারিত হওয়া ও

শাহাদাত বরণ করাকে পরাজয় বলে মনে করে। আশুরা দেখিয়ে দিয়েছে যে, চরম অত্যাচারিত হওয়ার মধ্যেও বিজয় থাকতে পারে। নিহত হওয়ার মাধ্যমেও বিজয়ের গ্রন্থ রচনা করা এবং রক্ত দিয়েও বিজয়ের চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব। সুতরাং কারবালা সংগ্রামের প্রকৃত বিজয়ী ছিলেন ইমাম হোসাইন (আ.) এবং কী চমৎকার এ বিজয়!

এটাই সেই 'তরবারির ওপর রক্তের বিজয়'- যা ইমাম খোমেইনী (রহ.)- এর বক্তৃতায় বিভিন্ন সময় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেছেন : 'যে জাতি শাহাদাতকে সৌভাগ্য বলে মনে করে তারাই বিজয়ী। আমরা শহীদ হওয়া এবং হত্যা করা উভয় অবস্থায়ই বিজয়ী।[৫০৫] এটাই কোরআনের সেই শিক্ষা إحدى الحسنين (অর্থ: দুই কল্যাণের একটি অর্জন) যা আল্লাহর পথে সংগ্রামীদের সংস্কৃতি।

যে আল্লাহর নির্ধারিত ছক ও নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে সে সর্বাবস্থায় বিজয়ী এবং সেটা প্রকৃত বিজয়ও বটে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি ইমাম হোসাইন, ইমাম সাজ্জাদ এবং হযরত যায়নাবেরও ছিল।

যেহেতু ঐসব তিক্ত ঘটনা সত্য এবং ইসলামের জন্য নিঃসন্দেহে কল্যাণকর ছিল সেহেতু তা সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। যখন ইবরাহীম বিন তালহা ইয়াযীদের দরবারে ইমাম যায়নুল আবেদীনকে তিরস্কার করে বলল : '(আজ) কে বিজয়ী হয়েছে?' তিনি বললেন : 'যখন নামাযের সময় হবে এবং আযান ও ইকামত দেয়া হবে তখন বুঝবে যে, কে বিজয়ী হয়েছে!'[৫০৬]

নিহত এবং শহীদ হয়েও বিজয় লাভ করা কি সুন্দর নয়?

৫. আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত পথে যাত্রা করা : মানুষ যখন কোন কাজ 'আল্লাহর ইচ্ছা' ও 'আল্লাহর চাওয়া অনুযায়ী'ই ঘটেছে বলে মনে করে তখন তার সৌন্দর্য উত্তমরূপে প্রতিভাত হয়। যদি শহীদদের নেতা বা তাঁর সঙ্গী- সাথিরা শহীদ হয়ে থাকেন এবং হযরত যায়নাব ও নবীর পরিবার বন্দি হয়ে থাকেন তবে আল্লাহর ইচ্ছায়ই হয়েছে। কেননা, লওহে মাহফুযে তা লিপিবদ্ধ ছিল। কী চমৎকার যে, দলবদ্ধ একটি কাজ আল্লাহর চাওয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ!

তাহলে কি হোসাইন বিন আলী (আ.)- কে অদৃশ্য থেকে সম্বোধন করে বলা হয়নি-

ان الله شاء ان يراک قتيلا ان الله شاء ان يراهن سبايا

'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে নিহত অবস্থায় দেখতে চান এবং তাদেরকেও (নারী- শিশুদের) বন্দি দেখতে চান।' সুতরাং এটাই কি আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না যে, নবীর আহলে বাইত (নারী- শিশুসহ সকল সদস্য) তাঁর ধর্ম এবং মানুষের মুক্তির জন্য বন্দি হবেন?

অতএব, এই শাহাদাত বা বন্দি হওয়াতে দুঃখ বা আফসোস কিসের?

এ দু'টি ছিল আল্লাহর দ্বীন রক্ষা এবং খোদাদ্রোহীদের মুখোশ উন্মোচন করার মূল্য যা অবশ্যই দিতে হবে যা প্রেমপূর্ণভাবে, ধৈর্যসহকারে এবং সাহসিকতার সাথে সম্পাদিত হয়েছে।

মহীয়সী নারী যায়নাব ওহীর ক্রোড়ে এবং হযরত আলীর শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হয়েছেন। তাই তাঁর নিকট আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁরই পথে এই যাত্রা হচ্ছে অতি মূল্যবান এবং সৌন্দর্যের সর্বোত্তম রূপ। তিনি এই কর্মসূচির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুকেই সৌন্দর্যমণ্ডিত অবলোকন করেছেন। কারণ, তিনি একে একে প্রতিটি প্রাঙ্গন ও ক্ষেত্রকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করেন। এই ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিকোণ থেকে আশুরার ঘটনাটি কি সৌন্দর্যময় নয়?

৬. আশুরা ভাগ্যনির্ধারণের রাত্রি : এই ক্ষেত্রটিতে আশুরার সৌন্দর্যের উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে। কারণ, হোসাইন (আ.)- এর সঙ্গীরা প্রস্থান এবং অবস্থান এই দুয়ের মধ্যে অবস্থান করাকে বেছে নিয়েছিলেন, যা তাঁদের আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্ততার নিদর্শন। তাঁরা হোসাইনবিহীন জীবনকে অপমান ও প্রকৃত মৃত্যু মনে করেছেন।

আশুরার রাতে ইমামের ঐ ঐতিহাসিক বক্তৃতা, তাঁর প্রতি সঙ্গী- সাথিদের বিশ্বস্ত থাকার ঘোষণা, ইমাম হাসানের কিশোর সন্তান কাসেমের সাথে ইমামের কথোপকথন এবং প্রশ্নোত্তরের বিষয়বস্তু ও ধরন, [৫০৭] সকাল পর্যন্ত সাহাবীদের ইবাদত, মৃদুস্বরে কোরআন পাঠ, তাঁবুগুলো থেকে দোয়া পাঠের ধ্বনি উচ্চারিত হওয়া, ইমাম হোসাইন (আ.) এবং যায়নাবের সামনে তাঁদের সাথিদের বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার করা- এগুলোর প্রতিটি এই সুন্দর বইয়ের সোনালি অধ্যায়। তাই যায়নাব কেন আশুরাকে সৌন্দর্যময় দেখবেন না?

কারবালার শিক্ষার ভিত্তিতেই ইতিহাসে পৃথিবীর প্রতিটি জায়গায় যুলুম- অত্যাচারের সাথে সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। এটা কি অপরূপ নয়?

আশুরার প্রতিটি মুহূর্ত ও ক্ষণ শিক্ষালয়ে পরিণত হয়েছে যা মানুষকে স্বাধীনতা, বিশ্বস্ততা, মহানুভবতা, ঈমান, সাহসিকতা, শাহাদাতকামিতা এবং অন্তর্দৃষ্টি লাভের শিক্ষা দেয়। এটা কি সুন্দর নয়?

মরু- প্রান্তরের মাটিতে ঝরে পড়া পবিত্র রক্তের স্রোত যুলুম- অত্যাচারের মূল ভিত্তিকে ধ্বংস করেছে। এটা কি সুন্দর নয়?

কুফা এবং সিরিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরা ভেবেছিল যে, সত্যপন্থীদের হত্যার মাধ্যমে নিজেদেরকে চিরস্থায়ী করেছে! কিন্তু যায়নাব (আ.)- এর দৃষ্টিতে তারা নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়েছে এবং আহলে বাইতের নূরানি চেহারাকে আরো উজ্জ্বল এবং তাঁদের নাম চিরস্থায়ী করেছে। আর এভাবে আল্লাহর ধর্মকে পুনর্জীবিত করেছে। ফলে কারবালা হয়েছে এক বিশ্ববিদ্যালয়।

পরম সাহসী ও মহীয়সী নারী হযরত যায়নাব এ সত্যগুলো জানতেন এবং সময়ের ঊর্ধ্বে এ ঘটনার সুপ্রসারিত প্রভাবকে দেখেছিলেন। এই সম্মানিত বন্দি নারীকে ইবনে যিয়াদ তিরস্কারপূর্ণ ভাবে সম্বোধন করে বলেছিল : 'তোমার ভাই এবং তার পরিবারের সাথে আল্লাহর আচরণকে কেমন দেখলে? তিনি বললেন : 'আমি সুন্দর ছাড়া কিছু দেখিনি।' এটাই ছিল কুফার শাসকের বিদ্রূপাত্মক কথার জবাব।

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মনঃকষ্ট

আশুরা আন্দোলনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক

প্রশ্ন নং ৬২ : ইমাম হোসাইন (আ.)- এর বিপ্লবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক সম্পর্কে কিছু বলুন

উত্তর : কারবালার আকাশের তারার ন্যায় উজ্জ্বল ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে অন্য কোন আকাশের তারা উজ্জ্বল ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হয়নি। আশুরার দিনে সূর্য যেরূপ দুঃখভারাক্রান্ত, বিবর্ণ ও দ্বিধা নিয়ে উদিত হয়েছিল অন্য কোন দিন সেরূপ রঙহীন ও মনোবেদনা নিয়ে উদিত হয়নি। পৃথিবীর কোন স্থানই নেইনাওয়া (কারবালা)- র ন্যায় সুন্দর ও অসুন্দরকে পাশাপাশি এত উত্তমরূপে প্রদর্শন করেনি। ঐতিহাসিক কোন ঘটনাই ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলনের মতো মানবতার মহান বাণী ধারণ করেনি। 'তাফ'- এর মরুভূমিতে সেদিন 'তাওহীদ' দ্বিতীয়বারের মতো জন্মগ্রহণ করেছিল। আশুরার দিন 'খোদাপ্রেম' নতুনভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছিল এবং কোরআন (এর শিক্ষা) নবজীবন লাভ করেছিল। কেন ফেরেশতারা হযরত আদম (আ.)- কে সিজদা করেছিল, দশই মুহররমেই তার রহস্য উন্মোচিত হয়েছিল। বস্তুত আশুরার দিন কারবালায় মহান আল্লাহর সকল সৌন্দর্যময় বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছিল। চরম তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ফোরাতের কূলে আলীর সন্তান আব্বাস যখন ঘোড়াসহ পানিতে নেমে পানি পান না করেই মশক ভর্তি করে পানি থেকে উঠে এলেন, তাঁর এ কর্মের মাধ্যমে ভালোবাসা, আত্মসম্মানবোধ, মনুষ্যত্ব ও আত্মত্যাগের যে মহান শিক্ষার নমুনা পৃথিবীর বুকে রেখে গেলেন তা সত্যপিপাসুদের জন্য চিরন্তন এক সুপেয় পানির ঝরনা প্রবাহিত করেছে। রক্তাক্ত কারবালার এ মহান বীর মিথ্যার ওপর সত্যের বিজয়ের নিশান উড়িয়েছিলেন। তিনি সুন্দরের চিরন্তনতা ও অসুন্দরের স্থায়িত্বহীনতার মহান সাক্ষী। কারবালায় ইমাম হোসাইন ও তাঁর ভাই আব্বাস এবং তাঁদের সঙ্গী- সাথিরা কারবালাকে খোদাপরিচিতি, মানবতা ও মানুষ গড়ার মহান এক শিক্ষালয়ে পরিণত করেছিলেন।

কোন শিক্ষালয়ই কারবালার শিক্ষালয়ের মতো উত্তম ও সফল শিক্ষার্থী তৈরি ও প্রশিক্ষিত করতে পারেনি। কারবালার ন্যায় কোন শিক্ষাকেন্দ্রেই এত বৈচিত্র্যময় শিক্ষাবিভাগ নেই। খোদাপরিচিত, খোদাপ্রেম, মর্যাদাকর বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্যের পথে চূড়ান্ত দৃঢ়তা প্রদর্শন, ধৈর্য, সাহসিকতা, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দাসত্বসহ অসংখ্য বিভাগে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সফলতার শীর্ষে আরোহণ করেছেন। এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুগ্ধপোষ্য শিশু, কিশোর, তরুণ, যুবক, মধ্যবয়সী, প্রবীণ, বৃদ্ধ, পুরুষ- নারী, স্বাধীন মানুষ ও দাস সকলেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। তাঁদের সকলেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান শিক্ষক ইমাম হোসাইন ইবনে আলী থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁর ছাত্ররা কঠিনতম পরীক্ষায় সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন যা তাঁদের অতুলনীয় যোগ্যতার প্রমাণ বহন করে। শাহাদাতের ময়দানের এ অকুতোভয় সৈনিকরা খোদাপ্রেমে এতটা নিমজ্জিত ছিলেন যে, তাঁদের নেতার পাশে তাঁদের নাম চিরন্তনতা লাভ করেছে। কেননা, যে কেউ মহান আল্লাহর জন্য তার সত্তাকে একনিষ্ঠ করবে অবশ্যই সে স্থায়িত্ব ও অমরতা লাভ করবে। আশুরার ঘটনার প্রতিটি মুহূর্ত জ্ঞান, উন্নত নৈতিক চরিত্র ও মর্যাদাকর বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। কারবালার ভূমির প্রতিটি অংশ মহান আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ ও মহান প্রভুর দাসত্বের স্বীকৃতির প্রমাণবাহী।

কারবালার চিরন্তন বিপ্লবী ইতিহাসের প্রতিটি পাতা আত্মমর্যাদা, বন্দেগি, মহত্ত্ব ও আত্মত্যাগের স্বর্ণলিপি খচিত। এ মহান ঘটনার সকল দিক একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। আমরা সংক্ষেপে এ কালজয়ী বিপ্লবের কিছু দিকের উল্লেখ করছি :

১. ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জ্ঞান, চরিত্র ও মর্যাদার দিক

কথা এবং কাজের মাধ্যমে তাওহীদের দিকে আহ্বান সকল ঐশী ধর্মের মূল এবং নবীদের শিক্ষার ভিত্তি। ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মহান আন্দোলনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাওহীদের সর্বোজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষণীয়। ইমাম হোসাইন এক মুহূর্তের জন্য মহান আল্লাহর স্মরণ, প্রশংসা, মর্যাদা বর্ণনা এবং কৃতজ্ঞতা থেকে উদাসীন হননি। তিনি যখন মক্কা থেকে ইরাকের দিকে রওয়ানা হন তখন প্রথমেই মহান আল্লাহকে এভাবে স্মরণ করেন :

الحمد لله و ما شاء الله و لا حول ولا قوة الا بالله

'মহান আল্লাহর প্রশংসা, তিনি যা চান তা- ই হবে, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই।'

তিনি তাঁর জীবনের শেষলগ্নে শাহাদাতের মুহূর্তে যখন তিনি তৃষ্ণার্ত ও রক্তাক্ত অবস্থায় শত্রুবেষ্টিত হয়ে পড়েছিলেন এবং শিমার তাঁর শির বিচ্ছিন্ন করার জন্য তাঁর বুকের ওপর বসেছিল তখন বলেন : 'হে প্রভু! আমি আপনার সিদ্ধান্তে (সন্তুষ্ট চিত্তে) ধৈর্যধারণ করছি। আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। হে আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় (দাতা)!'

২. ঐশী (খোদা অর্পিত) দায়িত্ব পালন ও মানবিক মূল্যবোধকে দৃঢ়ীকরণ

স্বাভাবিক ভাবেই যে কোন সেনাপতি যখন শত্রুর সামনে দাঁড়ায় এবং সৈন্য সমবেত করে তখন তার উদ্দেশ্য থাকে শত্রুকে পরাভূত করে জয়ী হওয়া। ইমাম হোসাইনও এ সাধারণ নীতি থেকে ব্যতিক্রম নন। কিন্তু জয় ও পরাজয় তাঁর দৃষ্টিতে ছিল ভিন্ন যা অনেকের জন্যই বোঝা বেশ কঠিন। ইমাম হোসাইনের দৃষ্টিতে বিজয় হলো আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সর্বোত্তমরূপে সম্পাদন করা এবং মানবিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করা। যদিও এ কর্ম সম্পাদন করতে তাঁকে শহীদ হতে হয় ও বাহ্যিকভাবে পরাজিত হতে হয়। বাহ্যিক জয়- পরাজয় তাঁর লক্ষ্য ছিল না।

এ কারণেই আমরা দেখি, মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইত এবং ইমাম আলী (আ.)- এর বিশেষ ভক্ত ও অনুসারী তেরেম্মাহ ইবনে আদী যখন ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সাথে কারবালার পথে সাক্ষাৎ করেন তখন ইমাম তাঁকে কুফার পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তেরেম্মাহ বলেন : 'কুফার বিভিন্ন গোত্রপ্রধান এবং গোত্রপতিরা (গোত্রের বিশেষ ব্যক্তিরা) ইবনে যিয়াদের নিকট থেকে মোটা অংকের ঘুষ গ্রহণ করে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আর সাধারণ মানুষের অন্তর আপনার সঙ্গে, কিন্তু তাদের তরবারিগুলো আপনার দিকে (বিরুদ্ধে)।' তেরেম্মাহ ইমাম হোসাইনকে প্রস্তাব করেন : 'আপনাকে আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি যে, এ সফর থেকে বিরত হয়ে আমার গোত্র যে অঞ্চলে বাস করে আমার সঙ্গে সেখানে আসুন। কারণ, তা শত্রুর

নাগালের বাইরে। এতে আপনি শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবেন।' আবু আবদিল্লাহ (আ.) দু'টি বিষয়ের দিকে তেরেম্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন- যে ঐশী দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছে এবং মানবিক মূল্যবোধকে পুনরুজ্জীবিত করা। এ দায়িত্বের অংশ হিসেবে তিনি চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির কথা বলেছেন যা তাঁর ও কুফার অধিবাসীদের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। তিনি বলেন : 'কুফাবাসীর সাথে আমার যে চুক্তি হয়েছে তা থেকে ফিরে আসা সম্ভব নয়। এতে শেষ পরিণতি যা-ই হোক না কেন?' অর্থাৎ আমি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, কুফায় গিয়ে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করব এবং তাদেরকে সত্যের দিকে পথনির্দেশ করব। আর তারা আমার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে যে, আমাকে সাহায্য করবে ও পৃষ্ঠপোষকতা দেবে। আমার দায়িত্ব হলো আমি আমার প্রতিশ্রুতি পালন করব, যদিও এ পথে আমাকে বিভিন্ন রূপ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। এখন কুফাবাসী তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুক বা না করুক (অঙ্গীকার ভঙ্গ করুক) আমি আমার দায়িত্ব পালন করব।

প্রশ্ন নং ৬৩ : শত্রুরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করবে না জানা সত্ত্বেও কেন ইমাম হোসাইন (আ.) শেষ পর্যন্ত তাদেরকে নসিহত করেছেন এবং তাদের প্রতি করুণা দেখিয়েছেন?

উত্তর : আল্লাহর নবী এবং তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর সৃষ্টির প্রতি স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসা প্রকাশ এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। কোরআনের আয়াত এবং ইতিহাস থেকে এটা খুব ভালোভাবে বোঝা যায় যে, ঐশী পথনির্দেশকরা জনগণের বিপথগামিতায় আমাদের ধারণার চেয়েও অনেক বেশি ব্যথিত হন এবং কষ্ট পেয়ে থাকেন। তাঁরা যখন দেখতে পান যে, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি নির্মল স্বচ্ছ ঝরনাধারার পাশে বসে তৃষ্ণায় আর্তনাদ করছে তখন তাঁরা কষ্ট পান, অশ্রু ঝরান এবং তাদের হেদায়াতের জন্য দোয়া করেন।

সত্য ও সরল-সঠিক পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত এবং কুফর ও বাতিলের দিকে তাদের পা বাড়ানো দেখে তাঁরা চরম কষ্ট পান এবং দুশ্চিন্তায় পড়েন। নবী (সা.)-এর কোমল ও স্পর্শকাতর হৃদয় এসব মূর্খতা ও বিপথগামিতা দেখে কখনো কখনো এমন ব্যথিত হতো এবং তিনি এমন

মানসিক চাপ অনুভব করতেন যে, কষ্ট এবং দুঃখের তীব্রতায় তাঁর পবিত্র জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ত। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমনই প্রেম- ভালবাসা দিয়েছেন।

" لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين " 'হয়ত তারা ঈমান না আনার কারণে তুমি তোমার জীবন ধ্বংস করে দেবে।'[৫০৮]

যদি আসমানি পথনির্দেশকের মধ্যে এমন বিশেষত্ব না থাকে তবে তাঁর নেতৃত্ব প্রকৃত তাৎপর্য লাভ করতে পারে না। ইমাম হোসাইন (আ.) রেসালাতের বৃক্ষের ফল। তিনি মহানবী (সা.)- এর সন্তান এবং তাঁর অস্তিত্বের অংশ। তিনি নবী থেকে এবং নবী তাঁর থেকে। যেমনি ভাবে রাসূল (সা.) বলেছেন : حسين منِ و انا من الحسين 'হোসাইন আমা থেকে এবং আমি হোসাইন থেকে।'[৫০৯]

তিনি নবী (সা.)- এর সমস্ত পূর্ণতার উওরাধিকারী এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতিচ্ছবি। নবী (সা.)- এর স্নেহ ও মায়া- মমতার ঝরনাধারা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মহত্ত্বের পর্বত থেকে প্রবাহিত হয়েছে। এই কারণেই আবু আবদিল্লাহ (আ.) তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মানুষকে দিকনির্দেশনা দান এবং নসিহত করেছেন। এমনকি ঐশী নেতা তাঁর রক্তপিপাসু দুশমন ও হীন শত্রুদেরকেও তাঁর বক্তব্য এবং উপদেশ- নসিহত দ্বারা হেদায়াতের চেষ্টা করেছেন যা তাঁর মানবপ্রেম, উন্নত চরিত্র এবং শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। বিশ্ববাসীর সামনে তাঁর এ কর্ম অলৌকিক এক নিদর্শনস্বরূপ টিকে আছে।

ইমাম হোসাইন (আ.) যখন আশুরার দিন শত্রুর বিরাট বাহিনীর মুখোমুখি হন কখনই তাদেরকে নসিহত করা এবং তাদের বিবেককে জাগ্রত করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকেননি। অথচ তিনি জানতেন যে, নিশ্চিত শত্রুরা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য সর্ব প্রকারের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, এমনকি কারবালায় তাঁর অবস্থানস্থলে থাকা শিশুদের কাছে পর্যন্ত পানি পৌঁছানোর রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে এবং তাদেরকে দেখছেন তাঁর ওপর হামলার জন্য কেবল নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে ও তাঁর কথা যেন কেউ না শোনে এজন্য শোরগোল ও চিৎকার করছে। তিনি তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায়- যার

প্রতিটি বাক্য গভীর অর্থপূর্ণ এবং বিশ্লেষণের দাবি রাখে, তাতে শত্রুদের নাফরমানি, অবাধ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মূল কারণ বর্ণিত হয়েছে। শত্রুদের উদ্দেশেই তিনি তা বর্ণনা করেছেন।[৫১০]

আবু আবদিল্লাহ (আ.) এমনকি শত্রুপক্ষের নেতাদের, যেমন উমর বিন সা'দ ও শিমারকেও উপদেশ দেয়া থেকে বিরত থাকেননি। আশুরার দিন দুই বাহিনীর মাঝখানে উমরের সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি বলেন : 'হে সা'দের সন্তান! আফসোস তোমার জন্য, তুমি কি সেই আল্লাহকে ভয় কর না যাঁর দিকে ফিরে যেতে হবে? আমি কার সন্তান তা জানা সত্ত্বেও কি তুমি আমার সাথে যুদ্ধ করবে? এ (বিপথগামী) গোষ্ঠীকে ত্যাগ করে আমার সাথে আস তাহলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে।'

উমর ইবনে সা'দ বলল : 'আমি ভয় পাচ্ছি যে, আমার বাড়ি- ঘর ধ্বংস করে ফেলা হবে।'

ইমাম বললেন : 'আমি তোমার জন্য তা তৈরি করে দেব।'

উমর ইবনে সা'দ বলল : 'আমি ভয় পাচ্ছি যে, আমার ধনসম্পদ, সহায়- সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

ইমাম বললেন : 'হেজাজে আমার যে সম্পদ (ভূমি) আছে তার চেয়েও ভালো সম্পদ তোমাকে দেব।'

উমর ইবনে সা'দ বলল : 'আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানের জীবন নিয়ে শঙ্কিত।'

ইমাম হোসাইন (আ.) নীরব হয়ে গেলেন এবং কোন উত্তর দিলেন না। ইমামের লক্ষ্য ছিল নিজেকে বিকিয়ে দেয়া এক নীচ ও হীন ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়া যে তাঁকে হত্যা করে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনকে নিজের জন্য অবধারিত করেছে।

ইমাম হোসাইনের এসব বক্তৃতা এবং উপদেশ- নসিহতের দু'টি লক্ষ্য ছিল :

১. শত্রুদের প্রতি তাঁর হুজ্জাত পূর্ণ (চূড়ান্ত প্রমাণ পেশ) করা এবং তাদের জন্য কোন অজুহাতের পথ খোলা না রাখা।

২. মুষ্টিমেয় লোককে হলেও জাগ্রত করা, যেমন হুর ইবনে ইয়াযীদ- যাঁর মনে আহলে বাইতের ভালোবাসা এবং ইমামের আলো জ্বলে উঠেছিল।

এই দয়ার্দ্র এবং জাগরণমূলক বক্তৃতামালা মুসলমান নামধারীদের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক সৈন্যের মনে প্রভাব ফেলেছিল এবং কিছুসংখ্যক ইমামের বাহিনীতে যোগ দিয়ে চিরন্তন সৌভাগ্য ও মর্যাদা অর্জন করেছিল। এই ছিল ঐশী নেতার পাপী এবং নির্দয় শত্রুদের মোকাবিলায় ভালোবাসা, স্নেহ- মমতা এবং মানবপ্রেমের প্রকাশ। এই হচ্ছে হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.)- এর সন্তানের নীতি ও পদ্ধতি, যিনি চরম স্পর্শকাতর মুহূর্তেও আল্লাহর নির্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত হননি।

আশুরার নামায

প্রশ্ন নং ৬৪ : ইমাম হোসাইন (আ.) কেন আশুরার দিন তাঁর কিছুসংখ্যক সাথি শহীদ হবেন জেনেও শত্রুসেনাদের মাঝে যোহরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করেন?

উত্তর : নামায হচ্ছে ধর্মের ভিত্তি। [৫১১] আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ় বন্ধন হচ্ছে নামায। নামাযের দ্বারাই মুমিনকে চেনা যায়। এই সিঁড়ি দিয়ে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত (মিরাজে) যাওয়া যায় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। [৫১২]

নামায আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সর্বোত্তম পন্থা এবং রাসূল (সা.)- এর নয়নের আলো।[৫১৩] আর তাই নবী (সা.)- এর প্রথম ও শেষ উপদেশ ছিল নামায প্রতিষ্ঠা করা।[৫১৪] নামায মানুষকে পাপকাজ এবং কলুষতা থেকে মুক্ত রাখে।[৫১৫] এমনকি অপূর্ণাঙ্গ এবং অমনোযোগী নামাযও মানুষ ও পাপ কাজের মধ্যে বাধার সৃষ্টি করে।[৫১৬] ইমাম জাফর সাদিক (আ.)- এর সাথি মুয়াবিয়া বিন ওয়াহহাব ইমামকে জিজ্ঞেস করলেন : 'কোন্ উত্তম বস্তু বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কী?'

ইমাম বললেন : 'আমার দৃষ্টিতে আল্লাহর পরিচয় লাভের পর নামাযের থেকে উত্তম কিছু নেই।'[৫১৭]

হোসাইন বিন আলী (আ.) আল্লাহর ধর্মকে জীবিত রাখা, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং কুসংস্কার ও আত্মপূজারি অত্যাচারীদের হাত থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য কালজয়ী বিপ্লব করেছেন। আর নামায হচ্ছে আল্লাহর এই ধর্মের ভিত্তি। এই ধর্ম এবং মুহাম্মাদ (সা.)- এর শরীয়তের রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে ইমাম হোসাইন (আ.) কেন ধর্মের খুঁটি নামাযকে রক্তাক্ত কারবালা প্রাঙ্গনে চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে শত্রুদের কাপুরুষোচিত হামলার সামনে প্রতিষ্ঠা করবেন না আর এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় ও গভীর করবেন না?

আবু সুমামাহ ছাইদাবী তাঁর নেতা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর ভালোবাসায় নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিলেন। তিনি আশুরার দিন দুপুরে যখন ইমাম শত্রু কর্তৃক সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হন তখন তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে যোহরের নামাযের সময় স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাঁর পেছনে জামাআতে নামায পড়ে আল্লাহর সাক্ষাতে যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেন। ইমাম এর উত্তরে বলেন : 'তুমি আমাকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ। আল্লাহ তোমাকে নামায আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।'[৫১৮]

হোসাইন বিন আলী (আ.)- এর সঙ্গী- সাথিরা শত্রুদের থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়া তীরের সম্মুখে যোহরের নামায আদায় করলেন এবং তাঁদের কয়েকজন নামাযের সময় রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং শাহাদাতের ডানায় ভর করে প্রিয়জনের দর্শনে যাত্রা করলেন।

আশুরার রাতে ইমাম, তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাথিদের কোরআন তেলাওয়াত, ইবাদত- বন্দেগি এবং দোয়া ও মোনাজাতের দৃশ্য মহান আল্লাহর দাসত্বের সর্বোত্তম প্রদর্শনী। নামাযের প্রতি প্রেম, আল্লাহর নিকট নিজের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে গোপনে প্রার্থনা করা এ সবকিছুই আবু আবদিল্লাহ (আ.) তাঁর সম্মানিত পিতার নিকট থেকে শিখেছিলেন। ইবনে আব্বাস সিফফিন যুদ্ধের চরম উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে আলী (আ.)- কে দেখলেন যে, আকাশের দিকে মুখ তুলে যেন কোন কিছুর অপেক্ষা করছেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন : 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি কোন কিছুর জন্য চিন্তিত?' তিনি বললেন : 'হ্যাঁ নামাযের সময় হওয়ার অপেক্ষায় আছি।' ইবনে আব্বাস বললেন : 'এই চরম

মুহূর্তে যুদ্ধ বাদ দিয়ে আমরা নামাযে নিমগ্ন হতে পারি না।' আমীরুল মুমিনীন (আ.) বললেন : 'আমরা তো নামাযকে প্রতিষ্ঠার জন্যই তাদের সাথে লড়াই করছি।'

সত্যিই যখন আমাদের নেতা ও পথপ্রদর্শক যুদ্ধের রক্তাক্ত প্রাঙ্গনেও নামাযের মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি এতটা দৃষ্টি রেখেছেন এবং ঐ কঠিন ও চরম মুহূর্তেও নামায আদায় করেছেন, তখন আমরা যাঁরা ঐ রূপ যুদ্ধের অবস্থায় নেই, বরং শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে আছি, আমাদের জন্য কি নামাযকে অবহেলা করা ও হালকা করে দেখা শোভনীয়? এটা কি যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য যে, আমরা ঐসব মহান ও পবিত্র ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা পোষণ করি এবং নিজেদেরকে তাঁদের অনুসারী মনে করি, অথচ যে নামাযকে টিকিয়ে রাখা এবং প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তাঁরা এত কিছু করেছেন আমাদের জীবনে তার কোন গুরুত্ব থাকবে না?

আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত যে, কোরআন পাঠ, দোয়া এবং নামাযে কি গুপ্ত রহস্য ও স্বাদ লুকিয়ে রয়েছে যে কারণে ইমাম হোসাইন (আ.) মুহররমের নবম দিন আছরের সময় যখন মুনাফিক বাহিনী হামলা করার প্রস্তুতি নিয়ে ইমামের তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছিল তখন তিনি তাঁর সাহসী- বীর ভাই আব্বাসকে তাদের নিকট এ বলে পাঠালেন যে, যদি পার যুদ্ধকে কাল পর্যন্ত পিছিয়ে দাও। অতঃপর বললেন : 'এটা এজন্য যে, যেন আজ রাতে পরওয়ার দিগারের জন্য নামায আদায় করতে এবং তাঁর দরবারে দোয়া করতে পারি। আল্লাহ্ জানেন যে, আমি তাঁর জন্য নামায আদায়, তাঁর কিতাব পাঠ এবং তাঁর নিকট ইস্তিগফার করাকে কত ভালোবাসি![৫১৯]

এটা কি সেই ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কথা নয় যিনি 'নিশ্চয় অপমান আমাদের থেকে দূরে'- এই স্লোগান দিয়ে যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ইসলাম ও মনুষ্যত্বের পথে চরম আত্মত্যাগের শিক্ষা মানবজাতির জন্য রেখে গিয়েছেন? অথচ তিনিই অমানুষ পাষ- দলের কাছে কোরআন তেলাওয়াত, ইবাদত ও নামাযের জন্য সময় চেয়েছেন।

নামায আদায় এবং আল্লাহর দরবারে মোনাজাত ও গোপন প্রার্থনা করার মধ্যে কী মহান মর্যাদা নিহিত আছে যে, শহীদদের নেতা সে জন্য শত্রুদের কাছে যুদ্ধ বিলম্বিত করার আবেদন জানান।

কারবালার অন্যায় অবিচারের মূল কোথায়?

প্রশ্ন নং ৬৫ : অনুগ্রহপূর্বক বলুন, ইমাম হোসাইন (আ.) কারবালার সমস্ত অত্যাচার- নির্যাতন এবং পাপাচার ও অনাচারের মূল ভিত্তিকে কিভাবে চিহ্নিত করেছেন? কেননা, এই কারণগুলো তাঁর বাণীসমূহ থেকে অধিকতর সুস্পষ্ট ও অনুধাবনযোগ্য।

উত্তর : নিষ্ঠুর এবং পাষাণহৃদয় থেকেই অন্যায়, অত্যাচার, পাপাচার এবং হিংস্রতার সৃষ্টি হয়। নিষ্ঠুর এবং পাষাণ হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে হারাম খাওয়া। যে কোন প্রকারের হারাম খাওয়ার অকল্পনীয় মন্দ প্রভাব রয়েছে। আত্মার (ক্বালব) মৃত্যু, ঐশী সহজাত প্রকৃতি (ফিতরাত) পর্দাচ্ছাদিত হওয়া, সত্য ও ন্যায়ের দিকে ঝোঁক না থাকা, আল্লাহর অবাধ্যতা এবং তাঁর ওলীদের সাথে শত্রুতা করা ইত্যাদি হারাম খাওয়ারই ফল। ইসলাম ধর্মে ইবাদতের ব্যাপক অর্থ রয়েছে। হারাম মাল না খাওয়া এবং সৎ চরিত্রকে সবচেয়ে বড় ইবাদত বলে গণ্য করা হয়েছে। অন্যদিকে হারাম মাল খাওয়া অনেক বড় গোনাহের কাজ এবং তা ধ্বংসকারীও বটে। ইমাম বাকের (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : 'আল্লাহর নিকট পেট এবং গুপ্তাঙ্গকে হারাম থেকে রক্ষা করা থেকে উত্তম কোন ইবাদত নেই।'[৫২০]

হারাম (মাল) খাওয়ার অন্যান্য প্রভাব হচ্ছে বিবেক- বুদ্ধি হারিয়ে ফেলা, জ্ঞানান্ধ হয়ে পড়া এবং সত্যকে উপলব্ধি করতে না পারা। পবিত্র কোরআন এবং নিষ্পাপ ইমামরা এ অবস্থাকে 'হৃদয় মোহরাঙ্কিত হওয়া' বলে অভিহিত করেছেন। সত্যের বিপরীতে ঔদ্ধত্য দেখানো, বাতিলের পথে একগুঁয়েমি করা এবং অন্যায়- অবিচার, কুফর ও যুলুমের অনুসরণ করা, এসবই হারাম খাওয়ার পরিণতি।

আশুরার দিন যখন শত্রুবাহিনী ইমাম হোসাইনকে মূল্যবান পাথরের ন্যায় চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছিল তখন তিনি তাঁর বক্তৃতার মধ্যে এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নির্দেশ করে বলেন : 'যে আমাকে অনুসরণ করবে সে হেদায়াত পাবে, যে আমার বিরোধিতা করবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা সবাই আমার বিরোধিতা করছ, আমার কথায় কর্ণপাত করছ না!

কেননা, তোমাদের পেট হারাম মালে পূর্ণ হয়ে আছে এবং তোমাদের অন্তরে মোহর মারা হয়েছে, আফসোস তোমাদের জন্য! তোমরা কেন আমার কথা শোনার জন্য নীরব হচ্ছ না?'[৫২১]

তৃতীয় কারণ যা প্রকৃতপক্ষে মানুষের বিচ্যুত হওয়ার মূল তা হলো আল্লাহকে ভুলে যাওয়া এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে উদাসীনতা। আল্লাহর স্মরণ সকল সুখশান্তি, পূর্ণতা এবং বরকতের উৎস। মানুষ যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তা যেন এক ফোঁটা পানি- যা অসীম, পূর্ণ এবং সৌন্দর্যময় এক মহাসাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। এ অবস্থায় সে সংকীর্ণ বন্দিশালা থেকে নিজেকে বের করে নির্মল, স্বচ্ছ, আলোকিত ও অসীম মহাশূন্যে ডানা মেলতে সক্ষম হয়েছে। এর বিপরীতে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন মানুষের অবস্থা স্থবির এক পুকুরের ন্যায় যা জীবনের স্বচ্ছ ঝরনাধারা থেকে আলাদা হয়ে পচা ও দুর্গন্ধময় হওয়ার মুখে পড়েছে।

আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ আত্মা শয়তানের বিচরণের উত্তম ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। শয়তান তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে নিজের বন্ধু ও সহযোগীদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এমন আত্মায় গুনাহ এবং অবাধ্যতার বীজ খুব সহজে এবং দ্রুত অঙ্কুরিত হয় এবং অল্পতেই শয়তানের ফাঁদে পড়ে তার অনুসারী হয়ে যায়। ইমাম হোসাইন (আ.) বিপুল সংখ্যক শত্রুর সম্মুখে দেয়া খুতবায় তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন : 'নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে দিয়েছে।'[৫২২] ইমামের এই বক্তব্য আল্লাহর কালামেরই ভাবার্থ। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে : 'শয়তান এদের ওপর পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। অতঃপর তাদের আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে, এরা হচ্ছে শয়তানের দল, তুমি জেনে রাখ, শয়তানের দলের ধ্বংস অনিবার্য।'[৫২৩] ইমাম হোসাইনের বাণী যুগ-যুগান্তরের সকল মানুষের জন্য বার্তাস্বরূপ যা প্রকৃত সৌভাগ্যের চাবি এবং সর্বপ্রকার বিপথগামিতা ও বিচ্যুতির বিরুদ্ধে ধারালো তরবারি, আর তা ঐসব গুনাহ যা অপরাধ এবং বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্র তৈরি করে সেগুলোর মোকাবেলায় ঢালস্বরূপ। সব সময় আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি মনোযোগই কেবল মানুষকে সত্যের পথে অবিচল রাখে।

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সঙ্গী- সাথিদের বিশেষত্ব

প্রশ্ন নং ৬৬ : আবু আবদিল্লাহ (আ.)- এর সঙ্গী- সাথিদের মর্যাদা এবং অবস্থান কোথায়? তাঁদের সবারই অবস্থা কি এক রকম ছিল এবং তাঁরা সবাই কি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইমামের সাথে ছিলেন?

উত্তর : আবু আবদিল্লাহ (আ.)- এর সঙ্গী- সাথিরা মর্যাদার আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে আছেন। তাঁরা সকল মানুষের জীবনের জন্য নিজেদেরকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং তাঁদের পবিত্র নামসমূহের স্মরণ যে কোন সমাবেশকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। তাঁদের মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দানে মুহররমের নবম দিবসের আসরের সময়ে ইমামের ভাষণই যথেষ্ট, যেখানে তিনি বলেছেন : 'আল্লাহর শুকরিয়া আদায় এবং প্রশংসার পর আমি বলছি, নিশ্চয় আমার সঙ্গী- সাথিদের থেকে বিশ্বস্ত এবং শ্রেষ্ঠ কোন সাথি আমি দেখিনি এবং আমার পরিবারের চেয়ে উত্তম দয়ালু কোন পরিবার দেখিনি। আল্লাহ তা'আলা আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেবেন।'[৫২৪]

কোন কোন যিয়ারতে ইমাম হোসাইনের সঙ্গী- সাথিদের উদ্দেশে বলা হয়েছে : 'আপনারা ইহকাল এবং পরকালে শহীদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অগ্রগামী।'[৫২৫] ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত যিয়ারতের কিছু অংশে এসেছে- 'আপনারা আল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ, আল্লাহ আপনাদেরকে আবু আবদিল্লাহর জন্য নির্ধারণ করেছেন।'[৫২৬] ইমামের সাথিদের সম্পর্কে خاصة الله (আল্লাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা) শব্দটির ব্যবহার তাঁদের উচ্চ মর্যাদার নির্দেশক।

আবু আবদিল্লাহর জন্য উৎসর্গিত তাঁর সঙ্গী- সাথিদের জীবনী অধ্যয়ন থেকে বোঝা যায় যে, যদিও তাঁদের সকলেরই জীবনের শেষ পরিণতি সুন্দর ও মঙ্গলময় হয়েছিল অর্থাৎ তাঁরা সকলেই সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন, কিন্তু ইমামের বিপ্লবের প্রথমদিকে প্রেমাসক্তি, সংকল্প ও ইমামের সাহচর্যের দৃষ্টিতে সবার অবস্থা এক ছিল না। কেননা, ইমামের

সঙ্গীদের জীবনীর এই দিকটা পর্যালোচনা করলে অনেক উপকারী এবং গঠনমূলক তথ্য পাওয়া যাবে। আমরা খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে ইমামের কয়েকজন সঙ্গীর সৌভাগ্যপূর্ণ জীবনের কিছু পাতা উল্টে দেখব যেন তাঁদের জীবনের চড়াই- উৎরাই থেকে উপকৃত হতে ও শিক্ষা নিতে পারি।

হুর বিন ইয়াযীদ

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কাফেলা কয়েকটি গন্তব্য অতিক্রম করে 'শারাফে' পৌঁছল। তখন হুর বিন ইয়াযীদ বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ইমামের গতিরোধ করলেন। কেননা, এ উদ্দেশ্যেই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। হৃদয়বান ইমাম পথের ধুলায় ধুসরিত, ক্লান্ত- শ্রান্ত ও পিপাসার্ত শত্রুবাহিনীকে দেখে নিজের সহচরদেরকে তাদের এবং তাদের ঘোড়াগুলোকে পানি পান করানোর আদেশ দিলেন। আর ইমামের সহচররাও তাঁর আদেশ অনুযায়ী কাজ করলেন। একদিকে ঐ বাহিনীর লোকদের পানি পান করানো হলো অন্যদিকে পাত্রসমূহ পানি পূর্ণ করে ঘোড়াগুলোর সামনে রাখা হলো। হুর বাহিনীর একজন বর্ণনা করেছে : "আমি প্রচণ্ড তৃষ্ণা এবং ক্লান্তির কারণে সবার পরে সৈন্যদের নিকট পৌঁছলাম। ইমামের সঙ্গী- সাথিরা আমাদের সৈন্যবাহিনীকে পানি পান করানোয় ব্যস্ত থাকায় কেউ আমার দিকে খেয়াল করল না। এমতাবস্থায় হোসাইন বিন আলী (আ.) আমাকে লক্ষ্য করলেন এবং নিজে পানির মশক নিয়ে এসে আমাকে দিলেন। আমি অতিরিক্ত তৃষ্ণা এবং প্রচণ্ড ক্লান্তির কারণে মশক থেকে পানি ঢেলে খেতে পারছিলাম না। ইমাম নিজে মশক থেকে পানি ঢেলে আমাকে পান করালেন। এই আদর, ভালোবাসা, আপ্যায়ন এবং সামান্য বিশ্রামের পর যোহর নামাযের সময় ইমামের বিশেষ মুয়াযি্যন আযান দিলেন। ইমাম (আ.) বললেন : 'তুমি (হুর) তোমার বাহিনী নিয়ে নামায পড়।' হুর বলল : 'আমি আপনার সাথে এবং আপনার ইমামতিতে নামায পড়ব।' আসরের নামাযও একইভাবে অনুষ্ঠিত হলো।

ইমাম আসরের নামাযের পর হুর বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন এবং নিজের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থাপন করলেন। ইমাম এবং হুরের মধ্যে কথাবার্তা হওয়ার পর সে বলল :

‘আমরা আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি যে, আপনাকে কুফায় ইবনে যিয়াদের নিকট না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আপনার থেকে আলাদা হব না।’ ইমাম রাগান্বিত হলেন এবং বললেন : ‘তোমার মৃত্যু তোমার এই চিন্তা ও ধারণার থেকে উত্তম।’ তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে আদেশ করলেন : ‘তোমরা বাহনে আরোহণ কর এবং ফিরে চল।’ হুর তার বাহিনী নিয়ে তাঁদের পথ আটকালো এবং যাত্রায় বাধা দিল। ইমাম (আ.) হুরকে বললেন : سكلتك امّك ما تريد؟ ‘তুমি কি করতে চাও? তোমার মা তোমার জন্য শোক করুন!’ হুর বলল : ‘যদি আপনি ছাড়া অন্য কেউ আমার মায়ের নাম নিত তবে তার জবাব দিয়ে দিতাম, কিন্তু আপনার মায়ের সম্পর্কে সম্মানজনক কথা ছাড়া মুখে কিছু আসবে না।’

আশুরার দিন হুর যখন উমর বিন সা’দের বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে দেখল এবং অসহায় ইমাম হোসাইনের সাহায্যের আহ্বান শুনতে পেল তখন নিজেকে দুই পথের ‘সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য’ এবং ‘বেহেশ্ত ও দোযখ’ এর মধ্যে দেখতে পেল। আর সে নিজের অন্তর্দৃষ্টি ও বিবেক দিয়ে সৌভাগ্য এবং সম্মানের পথ বেছে নিল। সে তার হাত দু’টি মাথায় রেখে আল্লাহর দরবারে তার কৃত ভুল- ত্রুটি এবং গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় নিজের ঘোড়াকে হাঁকিয়ে নিয়ে ইমামের কাছে পৌঁছল। অতঃপর তাঁকে বলল : ‘হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান! আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গিত হোক! আমিই সেই ব্যক্তি যে আপনার ফেরার রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে আপনাকে এই বিপদসঙ্কুল স্থানে নিয়ে এসেছি। কখনই ভাবিনি যে, এ গোষ্ঠী আপনার সাথে যুদ্ধ করবে এবং আপনার সাথে এমন আচরণ করবে! আমি এখন দুঃখিত এবং লজ্জিত। আল্লাহর দরবারে তওবা করছি। আল্লাহ আমার তওবা কবুল করুন।’ হযরত হোসাইন (আ.) বললেন :

‘আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করুন।’[৫২৭]

ইমামের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান এবং তাঁর প্রতি শিষ্টাচারই হুরের প্রত্যাবর্তন এবং জাগ্রত হওয়ার মূল কারণ। নামাযে হুর মহান ইমামের ইকতিদা করেছেন এবং ইমামের সম্মানিত মাতা

সম্পর্কে শ্রদ্ধা, সম্মান এবং নম্রতা প্রকাশ করাই এ স্বাধীনচেতা মানুষের মুক্তি এবং সৌভাগ্যের কারণ।

অবশেষে হুর বিন ইয়াযীদ ইমামের প্রতিরক্ষার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। নিজের জীবনকে বাজি রেখে শত তরবারির আঘাতপ্রাপ্ত ও তীরবিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং শাহাদাতের কোলে ঢলে পড়েন। সঙ্গীরা মৃতপ্রায় অবস্থায় হুরকে ইমামের কাছে নিয়ে আসলে তিনি তাঁর পবিত্র হাত তাঁর মুখে বুলিয়ে দিয়ে বলেন :

انت الحر كما سمتك امك و انت الحر في الدنيا وانت الحر في الاخرة

‘তুমি মুক্ত মানব, যেমন তোমার মা তোমার নাম রেখেছেন, তুমি ইহকাল এবং পরকাল দুই কালেই স্বাধীন।’[৫২৮]

সম্ভবত হুর সম্পর্কে ইমামের উল্লিখিত বক্তব্য এই ইঙ্গিত বহন করে যে, হুর কামনা- বাসনা এবং দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মর্যাদার ঐ উচ্চ আসনে পৌঁছেছিলেন যা নবী, আওলিয়া এবং সত্যবাদীদের জন্য নির্ধারিত।

এই পূর্ণতায় পৌঁছা আল্লাহর বিশেষ রহমত এবং ইমামের সুদৃষ্টিরই ফলস্বরূপ। পরকালের বালা-মুছিবত থেকে মুক্ত হওয়া ঐ পূর্ণতারই অংশ। “وانت الحر فى الاخرة” বাক্য দ্বারা সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৫২৯]

মানুষের সামনে উন্মুক্ত দু’টি বিপরীত পথের- সম্মান ও অপমান, পবিত্রতা ও হীনতা ও কুফর ও ঈমান- মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার পরীক্ষায় হুর বিন ইয়াযীদ উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর নির্বাচন ছিল বিজ্ঞতাপূর্ণ। সকল আসক্তি ত্যাগ করা এবং মন্দ ও বাতিলের বাহ্যিক আকর্ষণীয় চেহারা ও সৌন্দর্যের পেছনে বিদ্যমান নিকৃষ্টরূপ দেখতে পারা হুরের মতো মুক্ত মানুষেরই কাজ। তিনি চিন্তা করে দেখেছেন যে, অন্ধকার বাহিনীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন মানুষের আলোকিত বাহিনীতে যোগদান যদিও কষ্টকর ও কঠিন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিরন্তন সৌভাগ্য এবং ইহকালীন ও পরকালীন সম্মান ও মর্যাদা এতেই নিহিত রয়েছে।

হুর তাঁর জীবনে যেরূপ ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন আমরাও আমাদের জীবনে অনুরূপ ঘটনার মুখোমুখি হই। কারণ, আমরাও প্রতিনিয়ত আনুগত্য ও অবাধ্যতা এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনের কামনা- বাসনা ও চিরস্থায়ী জীবনের সৌভাগ্য এই দুই পথের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকি। এ ক্ষেত্রে আমাদের উচিত স্বাধীনতা এবং উদারতার পথকে বেছে নেয়া এবং ধ্বংসশীল পার্থিব জীবনের জাঁকজমকপূর্ণ তুচ্ছ সামগ্রীর ভোগে লিপ্ত না হওয়া। যৌবনের অহমিকা, অর্থ- সম্পদ ও পদমর্যাদা যেন আমাদেরকে মন্দ মানুষে পরিণত না করে এবং সত্য- সঠিক ও তাকওয়ার পথ থেকে বিচ্যুত না করতে পারে।

ইমাম সাদিক (আ.)- এর গভীর অর্থবোধক নিম্নোক্ত বাণীতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন :

كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا

অর্থাৎ প্রতিটি দিনই আশুরা এবং প্রতিটি যমিনই কারবালা।[৫৩০]

অর্থাৎ আশুরার ঘটনা ঐ দিন এবং ঐ বদ্ধ ভূমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আশুরা এক চিরন্তন সংস্কৃতি যা স্থান ও কালের গর্ভে বিরামহীনভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। সত্য- মিথ্যা, হাবিল- কাবিল, ইবরাহীম- নমরূদ, মূসা- ফিরআউন, রাসূল (সা.)- আবু সুফিয়ান, ইমাম আলী (আ.)- মুয়াবিয়া এবং ইমাম হোসাইন (আ.) ও ইয়াযীদের সংঘর্ষ চিরস্থায়ী- সব সময়ের জন্য বিদ্যমান। অন্ধকারের বাহিনীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আলোর কাফেলার সাথে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ সবসময় রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কখনই দেরী হয়ে গেছে বলা ঠিক নয়, এমনকি জীবনের অল্প কয়েকটি মুহূর্তও যদি বাকি থাকে।

هل من ناصر ينصرني অর্থাৎ 'কোন সাহায্যকারী কি আছে যে আমাকে সাহায্য করতে পারে?'- ইমাম হোসাইনের এ ফরিয়াদ সর্বকালের সকল প্রজন্মের কানেই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অর্থাৎ ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

যুহাইর বিন কাইন

যুহাইর কুফার একজন সাহসী এবং বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো। ষাট হিজরিতে সাইয়্যেদুশ শুহাদা (আ.) মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার সময় তিনি তাঁর পরিবারের সাথে হজ থেকে ফিরছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে, ইমামের সাথে সাক্ষাৎ করবেন ও একসাথে অবস্থান করবেন। যখনই ইমাম কোন স্থান থেকে যাত্রা করতেন যুহাইর সেখানে যাত্রা বিরতি করতেন এবং যেখানেই হোসাইন (আ.) অবস্থান করতেন যুহাইর দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করতেন। এক জায়গায় তিনি বাধ্য হলেন ইমামের যাত্রা বিরতিস্থল থেকে কিছু দূরে তাঁবু স্থাপন করতে। যুহাইরের কিছুসংখ্যক সফরসঙ্গী বলে : "আমরা খাবার খাওয়ায় ব্যস্ত ছিলাম, এমন সময় ইমামের দূত এসে সালাম দিয়ে যুহাইরকে বললেন : 'আবু আবদিল্লাহ তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।' এই ঘটনা আমাদের জন্য এতটা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ছিল যে, আমাদের গলা শুকিয়ে গেল। এমন অবস্থা হলো যে, আমরা মুখের ভেতরের খাবার না গিলতে পারছিলাম, না ফেলতে পারছিলাম। যুহাইরের স্ত্রী তাঁকে বললেন : 'সুবহানাল্লাহ! নবীর সন্তান তোমাকে ডাকছে আর তুমি যেতে বিলম্ব করছ?' এই কথায় যুহাইর সম্বিৎ ফিরে পেলেন এবং তাঁকে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা থেকে বের করে আনল।

যুহাইর ইমাম হোসাইন (আ.)- এর নিকট গেলে ইমাম তাঁর সাথে কথা বললেন। ইমামের অমিয় বক্তব্য তাঁর অন্ধকার হৃদয়কে প্রজ্বলিত ও আলোকিত করল। তিনি ইমাম হোসাইন (আ.)- এর অনুরাগী ও অনুসারী হয়ে গেলেন এবং আনন্দমাখা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে ফিরে আসলেন এবং নিজের তাঁবুকে ইমামের তাঁবুর নিকট স্থাপন করলেন।

তাঁর জাগ্রত হৃদয়ের দ্বারা যে দুর্গম পথ তিনি বেছে নিয়েছেন সে পথে স্ত্রীর সম্ভাব্য ক্ষতির কথা বিবেচনা করে তাঁকে তালাক দিলেন। অতঃপর তাঁকে তাঁর পরিবার- পরিজনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কয়েকজনকে দায়িত্ব দিলেন। কিন্তু এ পরিণামদর্শী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নারী যুহাইরকে ত্যাগ করার জন্য এ শর্ত দিলেন যে, তিনি কিয়ামতের দিন নবী (সা.)- এর কাছে তাঁর জন্য শাফায়াত করবেন।

যখন হুরের বাহিনী ইমামের পথ অবরূদ্ধ করল, যুহাইর সাইয়্যেদুশ শুহাদার অনুমতি সাপেক্ষে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করলেন (কিন্তু সফল হলেন না)। অতঃপর তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ইমামকে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু ইমাম তা মানলেন না।

তা'সুয়ার (মুহররমের নবম) দিন বিকালে ইমাম (আ.) তাঁর পরিবার- পরিজন এবং সঙ্গী-সাথিদের তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলে যুহাইর এক আকর্ষণীয় বক্তৃতায় তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং স্বীয় জীবন বাজি রেখে ইমামের প্রতিরক্ষায় একনিষ্ঠভাবে প্রচেষ্টা চালানোর অঙ্গীকার করেন। তিনি বলেন : 'আল্লাহর শপথ, যদি হাজার বার নিহত হতাম এবং হাজার বার জীবিত হতাম এবং এর ফলে আল্লাহ আপনি এবং আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করতেন আমি তা করাই পছন্দ করতাম।'[৫৩১]

আশুরার দিন সাইয়্যেদুশ শুহাদা ডান দিকের সেনাবাহিনীর দায়িত্ব যুহাইরের ওপর অর্পণ করেন। ইমাম হোসাইন (আ.)- এর বক্তব্যের পর তিনিই প্রথম ব্যক্তি হিসেবে অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অশ্বে আরোহণ করে শত্রুদের সামনে যান এবং তাদেরকে উপদেশ দেন। আশুরার দিন যোহরে তিনি এবং সাদ বিন আবদুল্লাহ ইমামের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ান, ইমাম নামায আদায় করেন। নামাযের পর তিনি যুদ্ধের ময়দানে যান এবং সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাতের সুধা পান করেন। ইমাম (আ.) তাঁর শিয়রে এসে তাঁর জন্য দোয়া করেন এবং তাঁর হত্যাকারীদেরকে ভর্ৎসনা ও অভিসম্পাত করেন।[৫৩২]

ইমামের সাথে যুহাইরের ক্ষণস্থায়ী সাক্ষাতে তাঁর মত ও পথ পরিবর্তন আশুরার একটি রহস্যময় ও আশ্চর্যজনক শিক্ষণীয় ঘটনা। এটি সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায় না যে, ঐ আধ্যাত্মিক সাক্ষাতে যুহাইর ইমামের পবিত্র মুখনিঃসৃত এমন কী বাণী শুনেছিলেন যে, মাটি থেকে আরশের দিকে যাত্রা করেছেন এবং ইমামের প্রতি এতটা আকৃষ্ট হয়েছেন যে, তাঁর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

নিঃসন্দেহে যুহাইর তাঁর যুগের ইমাম, হোসাইন (আ.)- এর সুনজরে পড়েছিলেন। ফলে তাঁর ফিতরাতের ওপর থেকে পর্দা উঠে গিয়েছিল। নিজের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী তিনি ইমাম

হোসাইনের বেলায়াত (ঐশী কর্তৃত্ব) ও ইমামতের মর্যাদাকে চিনতে পেরেছিলেন। যুহাইরের বিভিন্ন বক্তব্য, সাহসিকতা ও উৎসর্গী ভূমিকা তাঁর আত্মার মহত্ত্বের পরিচয় দান করে এবং তিনি যে প্রকৃত অর্থেই ইমাম হোসাইনের মহান মর্যাদাকে অনুধাবন করেছিলেন তা অনুভব করা যায়।[৫৩৩]

নিঃসন্দেহে মানুষের মধ্যে যদি উপযুক্ত ধারণক্ষমতা এবং সত্যকে গ্রহণের অনুকূল ক্ষেত্র সৃষ্টি না হয় তবে সত্যকে গ্রহণে ভাগ্য তার সহায় হয় না এবং কখনই সে মঙ্গলজনক পরিণতি লাভে সক্ষম হয় না। নবী (সা.) বলেছেন : 'আল্লাহর অনুগ্রহের বাতাস তোমাদের দিকে আকস্মিকভাবে প্রবাহিত হয়। তাই সবসময় তোমরা সজাগ থাক এবং নিজেদেরকে তার জন্য প্রস্তুত রাখ। তার থেকে বিমুখ হয়ো না।'[৫৩৪] হুর এবং যুহাইরের মতো শ্রেষ্ঠ বীরেরা সর্বস্ব নিয়ে আল্লাহর রহমতের বায়ু প্রবাহিত হওয়ার রাস্তায় নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছেন এবং তাঁদের অস্তিত্ব বৃক্ষ তা থেকে পরিপুষ্ট ও তৃপ্ত হয়েছে। তাঁরা সৌভাগ্য, আধ্যাত্মিকতা ও প্রেমের ফল উপঢৌকন হিসেবে পেয়েছেন।

ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁর চলার পথে আরো অনেককে তাঁর মর্যাদাকর আলোর কাফেলার সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান, কিন্তু ঐ অভাগাদের এই যোগ্যতা ছিল না যে, মানবতা ও মহানুভবতার এ অগ্রপথিকের পায়ে পা মিলিয়ে গর্বের সাথে শাহাদাতের দিকে ধাবিত হবে এবং তাদের নামকে চিরস্মরণীয় করবে। এই বঞ্চিত ব্যক্তিদের কাফেলা ছিল অনেক বড় এবং তাদের লক্ষ্য- উদ্দেশ্যও ছিল বিভিন্ন রকমের। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যার একটি নমুনা উপস্থাপন করা হলো :

উবায়দুল্লাহ বিন হুর জু'ফী

বনি মাকতাল নামক স্থানে ইমাম যাত্রা বিরতি করলে তাঁকে সংবাদ দেয়া হলো যে, উবাইদুল্লাহ বিন হুর জু'ফী এখানেই অবস্থান করছে। উবাইদুল্লাহ খলিফা উছমানের সমর্থক ছিল এবং তাঁর

মৃত্যুর পর সে মুয়াবিযার কাছে চলে যায় এবং ছিফফিনের যুদ্ধে তার পক্ষ হয়ে আলী (আ.)- এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।[৫৩৫]

ইমাম হোসাইন (আ.) প্রথমে হাজ্জাজ বিন সারুক নামক এক ব্যক্তিকে তার কাছে পাঠালেন। হাজ্জাজ তাকে বললেন : 'তোমার জন্য একটি মূল্যবান উপহার নিয়ে এসেছি। হোসাইন বিন আলী (আ.) এখানে এসেছেন এবং তোমাকে সাহায্যের জন্য ডেকেছেন যেন তাঁর সাথে যোগ দিয়ে মহাসৌভাগ্য ও পুণ্য অর্জন করতে পার।'

উবায়দুল্লাহ বলল : 'আল্লাহর কসম ! আমি কুফা থেকে বের হওয়ার সময় অধিকাংশ মানুষ হোসাইন (আ.)- এর সাথে যুদ্ধ এবং তাঁর অনুসারীদের ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। এটা আমার কাছে পরিষ্কার যে, এই যুদ্ধে ইমাম নিহত হবেন। আর তাঁকে সাহায্য করার মতো সামর্থ্য আমার নেই। আমি মোটেই চাই না যে, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হোক।' হাজ্জাজ ইমামের কাছে ফিরে এসে উবায়দুল্লাহর জবাব পেশ করলেন। ইমাম নিজেই কিছুসংখ্যক সঙ্গীকে সাথে নিয়ে উবায়দুল্লাহর নিকট গেলেন। সে ইমামকে অভ্যর্থনা এবং সম্ভাষণ জানালো।

হোসাইন (আ.) তাকে বললেন : 'তুমি তোমার জীবনে অনেক পাপ কাজ করেছ এবং অনেক ভুল- ত্রুটি ও খারাপ কাজ তোমার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। তুমি কি তওবা করতে বা নিজের গুনাহসমূহ থেকে পবিত্র হতে চাও?'

উবাইদুল্লাহ বলল : 'কিভাবে তওবা করব?' ইমাম বললেন : 'তোমার নবীর মেয়ের সন্তানকে সাহায্য কর এবং তার পাশে থেকে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।' উবাইদুল্লাহ বলল : 'আল্লাহর কসম, আমি এটা জানি যে, যে আপনার আদেশের অনুসরণ করবে সে চিরস্থায়ী সুখ ও সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। কিন্তু আমি মনে করি না যে, আমার সাহায্য আপনার উপকারে আসবে। আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, আমাকে এ কাজ থেকে রেহাই দিন। কেননা, আমি মৃত্যুকে প্রচণ্ড ভয় করি। কিন্তু আমার অতুলনীয় এ ঘোড়াটি- যা পশ্চাদ্ধাবন ও পলায়নে পটু তা আপনাকে

দান করছি।’ ইমাম (আ.) বললেন : ‘ যখন আমাদের পথে নিজেকে উৎসর্গ করা থেকে বিরত থাকছ, তখন না আমার তোমাকে প্রয়োজন আছে, না তোমার ঘোড়াকে।’

উবায়দুল্লাহ এমন সুযোগ ও সৌভাগ্য হাতছাড়া করার জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনুতাপ ও অনুশোচনা করেছে।

যদি আমরা নিষ্পাপ ইমামদের পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি এবং যুদ্ধ-সন্ধি, পদক্ষেপ গ্রহণ ও নীরবতা পালনের পেছনে নিহিত কারণ নিয়ে পর্যালোচনা করি তাহলে খুব ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারব যে, ইমামরা নবী- রাসূলদের পথের অনুবর্তনকারী। মানবতার মুক্তিদান ও অন্ধকারে নিমজ্জিতদের পরিত্রাণ দেয়া ছাড়া তাঁদের অন্য কোন লক্ষ্য নেই। এই মুক্তিদান কখনো সর্বজনীনভাবে এবং কখনো ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

উবায়দুল্লাহর তাঁবুতে ইমামের আগমন প্রকৃতপক্ষে রোগীর গৃহে ডাক্তারের আগমনের মতো। আল্লাহর ওলীদের দৃষ্টিতে একজন মানুষকে মুক্তি দেওয়া এবং সৌভাগ্য ও পূর্ণতার কাফেলায় আনার মূল্য অনেক। বিশেষত যদি এই কাজ ঐ পবিত্র বিপ্লবের পথে হয় যে পথে সাইয়্যেদুশ শুহাদা তাঁর সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু যখন ইমাম দেখলেন যে, উবায়দুল্লাহ তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারছে না এবং একটি ঘোড়া উপহার দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে সে প্রমাণ করেছে যে, সে বিষয়টিকে সংকীর্ণ বস্তুগত দৃষ্টিতে দেখেছে এবং ভেবেছে বাহ্যিক জয়- পরাজয়ের মধ্যেই সফলতা নিহিত রয়েছে, তাই ইমাম তাকে বললেন : ‘আমার না তোমাকে প্রয়োজন আছে, না তোমার ঘোড়াকে।’

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস জুন

অন্যদিকে জুনের মতো ব্যক্তিরাও আশুরা বিপ্লবে উপস্থিত ছিলেন। জুন একজন কাফ্রী ক্রীতদাস ছিলেন। আমীরুল মুমিনীন (আ.) তাঁকে ১৫০ দিরহাম দিয়ে ক্রয় করে হযরত আবু যার গিফারীকে

উপহার দিয়েছিলেন। হযরত আবু যার ‘রাবাযাহ’র মরুচরে নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথেই ছিলেন।

জুন হযরত আবু যারের মৃত্যুর পর ইমাম আলী (আ.)- এর নিকট ফিরে আসেন এবং ইমামের সেবায় নিয়োজিত থাকার মহান গৌরব অর্জন করেন। অতঃপর তিনি ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম হোসাইনের খেদমত করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইমাম সাজ্জাদ (আ.)- এর সাথে ছিলেন এবং তাঁর সাথে কারবালা সফরে যান।

আশুরার দিন কারবালায় যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ ধারণ করলে এই কৃষ্ণকায় গোলামের শ্বেত হৃদয় ইমাম হোসাইন (আ.)- এর অসহায় ও অত্যাচারিত অবস্থা দেখে বিষণ্ন এবং ব্যথিত হয়ে পড়ে। তখন তিনি ইমামের কাছে এসে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন।

ইমাম বললেন : ‘আমি তোমাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। কেননা, তুমি সুখ- শান্তি ও আরামের জন্য আমাদের সঙ্গী হয়েছ, যুদ্ধ- বিগ্রহ এবং কষ্ট ও ঝামেলায় জড়ানোর জন্য নয়। সুতরাং তোমার আমাদের পথ ধরার কোন প্রয়োজন নেই।’

ঐ সৌভাগ্যবান কৃষ্ণাঙ্গ হোসাইন বিন আলী (আ.)- এর দুই পায়ে পড়ে চুমু দিয়ে বলতে লাগলেন : ‘হে নবীর সন্তান! এটা কিভাবে হয় যে, আমি সুখ- শান্তি এবং আরামের সময় আপনাদের সাথে থাকব আর বিপদের মুহূর্তে আপনাদের ছেড়ে চলে যাব? আল্লাহর কসম, আমার শরীরে দুর্গন্ধ, আমার বংশ নীচ এবং আমার চামড়ার রঙ কালো বলেই কি আপনি আমাকে অনুমতি দিচ্ছেন না? আল্লাহর কসম, ততক্ষণ আমি আপনাদের থেকে আলাদা হব না যতক্ষণ না আমার কালো রক্ত আপনাদের রক্তের সাথে মিশ্রিত হয়।’ অবশেষে জুন ইমামের অনুমতি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে যান এবং সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাতের সুধা পান করেন।

আবু আবদিল্লাহর সঙ্গী- সাথিদের সর্বোচ্চ আনন্দ এটা ছিল যে, তাঁরা তাঁদের জীবনের শেষ মুহূর্তে চোখ মেলে তাঁদের শিয়রে ইমামের প্রেমময় চেহারা দেখতে পেরেছেন এবং এই নগদ বেহেশ্ত দেখার কারণে মৃত্যু তাঁদের কাছে মধুর মতো সুমিষ্ট ও সুস্বাদু মনে হয়েছে।

ইমাম হোসাইন (আ.) জুনের শিয়রে আসলেন এবং বললেন : ‘হে আল্লাহ! তার মুখমণ্ডলকে শুভ্র এবং তার গন্ধকে সুবাসিত করে দাও এবং তাকে পুণ্যবানদের সাথে পুনরুত্থিত কর। মুহাম্মাদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরের সাথে তার বন্ধনকে ঘনিষ্ঠ করে দাও।’[৫৩৬]

ইমামের (আ.) এই দোয়া কবুল হয়েছিল। যার ফল এই দুনিয়াতেই প্রকাশ পেয়েছিল। কেননা, হযরত বাকের (আ.) তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন : যখন লোকেরা কারবালার শহীদদের দাফন করার জন্য আসল, জুনের শরীরকে দশ দিন পর এমন অবস্থায় পেয়েছিল যে, তাঁর শরীর থেকে মৃগনাভীর গন্ধ ভেসে আসছিল।[৫৩৭]

তুর্কি গোলাম

কারবালার ইতিহাসে একজন তুর্কি গোলাম সম্পর্কেও বলা হয়েছে। যখন তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তখন ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁর শিয়রে বসে কেঁদেছিলেন। তিনি তাঁর সন্তান আলী আকবরের সাথে যে আচরণ করেছিলেন তাঁর সাথেও ঠিক সে আচরণই করলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর মুখটি ঐ তুর্কি গোলামের মুখের ওপর রাখলেন। এটা ঐ তুর্কি গোলামের কাছে এতটাই অবিশ্বাস্য ও উপভোগ্য ছিল যে, তিনি হাস্যোজ্জ্বল মুখে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।[৫৩৮]
ইমাম তাঁর পূত- পবিত্র খাঁটি এ সঙ্গীদের প্রতি প্রেম- ভালোবাসার দ্বার উন্মোচিত করে বিশ্ববাসীর প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, মহা মূল্যবান সত্যের প্রতিরক্ষায় সাদা, কালো, কাছের ও দূরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সকলের রঙ ‘আল্লাহর রঙ’ আর অভিন্ন চেহারা হচ্ছে ‘তাকওয়া’।

আশুরা এবং ফারসি সাহিত্য

প্রশ্ন নং ৬৭ : অনুগ্রহপূর্বক ফারসি সাহিত্যে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর বিপ্লবের প্রভাব বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করুন।

উত্তর : এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এক প্রবন্ধের ধারণক্ষমতার বাইরে। সুতরাং সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব। ইমাম হোসাইন (আ.)- এর বিপ্লবের বিষয়বস্তু তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে

ফারসি সাহিত্যে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রথম দিকে খুব জোরালো ছিল না; বরং উপমা এবং প্রামাণ্য উদাহরণ হিসেবে ইমাম হোসাইন এবং কারবালার শহীদদের ঘটনা উল্লেখ করা হতো।

এর এক-দুই শতাব্দী পর (প্রায় ৫ম ও ৬ষ্ঠ হিজরি শতাব্দিতে) سنایی সানায়ী তাঁর সাহিত্যকর্মে বিশেষভাবে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শাহাদাতের বিষয়টি সরাসরি উল্লেখ করেন। পঞ্চম শতাব্দীর পর (নাসের খসরুর যুগে) কোন কোন সাহিত্যে প্রসঙ্গক্রমে আশুরা এবং ইমাম হোসাইনের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু তৈমুরী শাসনামল থেকে এই বিষয়ের প্রতি পরিপূর্ণ এবং নির্দিষ্টভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। সাফাভী শাসনামলে শিয়া মাযহাব আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ইরানের শাসনব্যবস্থা ও শিয়াদের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আসে। তার সাথে কবিদের মধ্যেও আশুরার প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়।

ইবনে হিশাম নামের একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব সাফাভী শাসনামলের পূর্বেও আশুরার বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি এমন একজন কবি ছিলেন যাঁর অধিকাংশ সাহিত্যকর্ম আশুরার ঘটনা প্রসঙ্গে। তাঁর পরবর্তীকালে অনেক কবির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ‘কাজার’ শাসনামল এবং তার পরবর্তী সময়ে আশুরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনেক কবিতা রচিত হয়েছে।

এক : কবি ‘মুহতাশিম কাশানি’র সমস্ত লেখনির সাথে বিশেষ করে আশুরা এবং ইমাম হোসাইন (আ.)-এর কাহিনী সম্বলিত লেখনির সাথে কম-বেশি সকল ইরানীই পরিচিত। তিনি সাফাভী আমলের একজন প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত কবি ছিলেন। তিনি আহলে বাইতের স্মরণে কবিতা রচনা করেছেন এবং এই ধাঁচের কবিতা রচনায় এমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন যে, তাঁকে শোকগাথায় ইরানের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবি বলে মনে করা হয়। তাঁর বারো লাইনবিশিষ্ট মর্সিয়া শোকগাথাগুলো এখনো পর্যন্ত সজীবতা ও প্রাঞ্জলতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে, সত্যের বাণীকে উত্তমরূপে ধারণ এবং সংরক্ষণ করছে।

সমগ্র সৃষ্টিলোকে এ কোন্ আর্তনাদের ধ্বনি জেগেছে আবার

এ কোন্ শোকের মাতম উঠেছে ধরায়, তীব্র করুণ যার স্বর।

ভূলোক ভেদিয়া এ কোন্ মহা উত্থানের ধ্বনি বারবার প্রতিধ্বনিত হয়

সিঙ্গায় ফুঁক ছাড়াই মহা আরশে তার রব পৌঁছে যায়।

দুই: কবিসম্রাট মুহাম্মাদ তাকী বাহার (শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের কবি) শহীদদের নেতার প্রশংসায় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন।

তিন: সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হোসাইন শাহরিয়ার আহলে বাইত এবং পবিত্র ইমামদের প্রতি প্রেমাসক্ত এবং ভক্ত এক ব্যক্তি যিনি ইমাম হোসাইন এবং কারবালায় শহীদদের প্রশংসায় অসংখ্য কবিতা রচনা করেন এবং তাঁদের মুসিবতের কথা স্মরণ করে প্রতিনিয়ত ক্রন্দন করেছেন। ওস্তাদ শাহরিয়ার 'কারবালার কাফেলা' শিরোনামে একটি গজল রচনা করেছেন- যার সূচনা এভাবে হয়েছে-

হে হোসাইন! তোমার অনুসারীরা কারবালায় প্রতীক্ষায় রয়েছে

তাদের মন প্রতিক্ষণ তোমার কাফেলার সাথে রয়েছে

কিন্তু দুঃখ যে, তোমার শত্রুরা নির্দয়, আর তোমার বন্ধু (হওয়ার দাবিদার) রা

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।

তাই হোসাইনের সমস্যা একটি নয় দু'টি, যা তাঁর কষ্টকে করেছে ভারী।

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর বিপ্লব এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর ফারসি সাহিত্যে অনেক গদ্য ও কবিতা রচিত হয়েছে যা উল্লেখ করলে প্রবন্ধ অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই এ আলোচনার এখানেই ইতি টানছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুহররম ও প্রশিক্ষণ এবং মনস্তত্ত্ব

ক্রন্দন সহজাত স্বাভাবিক প্রবণতা নাকি মানসিক ভারসাম্যহীনতা

প্রশ্ন ৬৮ : ইমাম হোসাইনের জন্য ক্রন্দনে উদ্বুদ্ধকরণ কি মানুষকে সর্বক্ষণ দুঃখ-ভরাক্রান্ত থাকা ও মন: কষ্টে জীবন কাটানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না ? এটা কি মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতে একটি নেতিবাচক বিষয় নয়? ইসলাম আমাদের ইমাম হোসেইনের জন্য ক্রন্দনে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে আমাদেরকে কি এক প্রকার মানসিক অস্বাভাবিকতার দিকে পরিচালিত করছে না? এ ধরনের কাজ কি মানুষের উন্নয়ন ও বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক নয়?

উত্তর : মহানবী (সা.) ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত ইমামদের (আ.) হাদীসসমূহে ক্রন্দনের প্রতি অনেক বেশী উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এর জন্য অসংখ্য সওয়াব ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।[৫৩৯] এ বিষয়টি পর্যালোচনার পূর্বে দু'টি বিষয়কে আমাদের দৃষ্টিপাত রাখতে হবে :

১. সব কান্নায় শোক ও দুঃখের প্রকাশ নয়। কান্নার অনেক প্রকার আছে। কান্নার উদ্দেশ্যওে প্রকরণ ভিক্তিতে তার সঠিকতার যাচাই করতে হবে।

২. সব শোকের কান্নারই নেতিবাচক প্রভাব নেই ও তাকে অস্বাভাবিকতা বলে অভিহিত করা যায় না।

আমরা এখানে প্রথমে দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ ইমাম হোসাইনের জন্য কান্না যে বিশেষ প্রকৃতির শোকের প্রকাশক তা নিয়ে আলোচনা করব।

ক্রন্দন করা ঐ ধরনের বিষন্নতা ও শোকগ্রস্ত হওয়া নয় যা মানসিক বিপর্যস্ততা ও অস্বাভাবিকতার জন্ম দেয় এবং মানসিক রোগ বলে গণ্য হয়। শোকগ্রস্ত ও দুঃখগ্রস্ত ও দুঃখভরাক্রান্ত হওয়ার বিভিন্ন অবস্থা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে স্পষ্ট ও অতি সূক্ষ্মভাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়নি। শোক-দুঃখ প্রকাশ, শোকে মূহ্যমান হওয়া, ক্রন্দন ও আহাজারি

করা, দুঃখে ভরাক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলোকে এভাবে ভাগ করা যায় :

বিলাপ করে শোক জ্ঞাপন করা : যে কোন শোকের বিষয়ের মুখোমুখি হয়ে ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশিত শারীরিক, মানসিক ও আচরণগত বিশেষ এক প্রতিক্রিয়া যা বিব্রতকর ভিত্তিতে মৃদু থেকে মারাত্মক ও সংকটময় অবস্থায় পৌঁছতে পারে।

শোকে মূহ্যমান হওয়া : অতি নিকট সম্পর্কের বা ভালবাসার পাত্র কেউ মারা গেলে তাকে হারানোর দুঃখে আবেগময় প্রকাশ এভাবে ঘটে থাকে।

আজাদারি : চরম শোকের কোন বিষয়ে সমবেতভাবে (স্বতঃপ্রণোদিতভাবে) দুঃখ প্রকাশ করা হয়। মনোসমীক্ষণে কারো মনঃকষ্ট দূর করার জন্য কখনও কখনও যে সমবেত শোক প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হয় তার সঙ্গে এর পার্থক্য আছে।

মনঃকষ্ট : ব্যক্তির কাছে মূল্যবান বলে প্রতিভাত কোন বস্তু হাতছাড়া হওয়ার কারণে মনে উদ্ভূত কষ্ট।

দুঃখ কখনও কখনও কোন ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ার হতে পারে, তবে তা মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় বিষন্নতার সমার্থক নয়। তবে বিষন্নতা মনঃকষ্টের একটি রূপ যা প্রাত্যাহিক জীবনের কার্যক্রমে কোন কিছুর মূল্যায়ন, বিচার ও প্রাকৃতিক ও জৈবিক কাজের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে।

এখন দেখতে হবে, যে কোন ধরনের শোক প্রকাশই কি নেতিবাচক ও মনস্ততত্ত্বের দৃষ্টিতে রোগ বলে গণ্য হয়?আর ইমাম হোসাইনের জন্য ক্রন্দন করার কিরূপ প্রভাব রয়েছে ?

মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতে সবধরনের রোগই শোক প্রকাশই রোগ বলে গণ্য নয়। যখন শোকের মাত্রা, তীব্রতা ও স্থায়িত্ব সীমা ছাড়িয়ে যায় বিশেষত যদি কোনরূপ তা বাহ্যিক ও উপযুক্ত কারণ ছাড়া দেখা দেয় তাহলে তা অস্বাভাবিক। যদি শোকের প্রভাব এতটা

তীব্র হয় যে, অসঙ্গত আচরণ প্রকাশ করে অথবা দীর্ঘদিন কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়া অব্যাহত থাকে ও হ্রাস না পায় তবে তা রোগ বলে গণ্য হবে।

অন্যভাবে বলা যায়, কিছু নির্দিষ্ট লক্ষণ যদি শোকাহত ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয় তবে তা একটি রোগ এবং এর নিরাময়ের প্রয়োজন রয়েছে। সেগুলো হলো :

১: শারীরিক অবনতি

২: একাকিত্বকে বেছে নেয়া ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া

৩: নিজেকে মূল্যহীন মনে করা

৪: পাপের অনুভূতি

৫: আত্মহত্যার চেষ্টা

৬: লক্ষ্যহীনতা ও কর্ম অনীহা

৭: দীর্ঘ বিষন্নতা ও সার্বক্ষণিক মনোবেদনা

৮: আকস্মিক অস্বাভাবিকতা লক্ষণ ও আচরণ প্রকাশ

এখন দেখতে হবে, যারা ইমাম হোসাইনের জন্য শোক প্রকাশ করে তারা এ ধরনের শারীরিক ও মানসিক লক্ষণের অধিকারী কি না ? ইমাম হোসাইনের জন্য শোক প্রকাশের সময় কোন ব্যক্তি কিরূপ অনুভূতির মুখোমুখি হয়? বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সে কি স্বাভাবিকতার সীমা ছাড়িয়ে যায়? না কি সে ইমাম হোসাইন সম্পর্কে পূর্ন জ্ঞান নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক দৃষ্টিতে গ্রহনযোগ্য আচরণ করে?

যদি তার আচরণ পরিপূর্ণ জ্ঞানসহ ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে স্বীকৃতি কাঠামোর মধ্যে- কোনরূপ বিশেষ ছাঁচে হতে হবে এমন গোঁড়ামি ছাড়া- হয় তবে তা সঠিক। ইমাম হোসাইনের জন্য শোক প্রকাশ কখনই প্রাণহীন ও আচারসর্বস্ব প্রতীকি বিষয় নয়; বরং তা ইমাম হোসাইনের আন্দেলন ও শাহাদাতের মহান লক্ষ্যের ওপর নিবেদিত থাকার নিদর্শন। তাই তার জন্য রচিত শোকগাথা ও কবিতাগুলোর মধ্যে সত্য আদর্শকে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যে, তা তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনকে সেভাবে পরিচালিত

করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। যে কোন অন্যায় ও অনাচার প্রতিরোধ, ধর্মীয় মহান মূল্যবোধের জাগরণ ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া এবং অসম্মান ও অপমানজনক জীবনকে প্রত্যাখানের আদর্শে উজ্জীবিত করে।

তাই তার জন্য শোকপ্রকাশ ও ক্রন্দন অস্বাভাবিক কোন আচরণ নয়; বরং তা আত্মিক বিকাশ, মানসিক সুস্থতা এবং সামাজিক ও ধর্মীয় স্বীকৃতি প্রথার অনুকূল। এ শোক প্রকাশ ইমাম হোসাইনের মহান আত্মার সাথে একাত্মতার প্রকাশক যা ব্যক্তিকে পূর্ণতা দান করে।

বাস্তবে প্রকৃত বিষয় হলো যদি কোন, মুসলমান ইমাম হোসাইনের মহান আত্মত্যাগের প্রতি কোনরূপ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া না দেখায় ও ক্রন্দনের মাধ্যমে তাঁর সমবেদনা প্রকাশ না করে তবে সে ধর্মীয় দৃষ্টিতে রোগাক্রান্ত। এমনকি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতেও যদি কেউ এধরনের কোন ঘটনা শ্রবণে নিষ্ক্রিয় থাকে তাহলে সে অসুস্থ বলে গণ্য হবে। যদি কেউ তার কোন একান্ত নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুতে শুধু তাৎক্ষণিক নয়, এমনকি দীর্ঘ সময়েও শোক প্রকাশ না করে বা জোর করে শোককে চেপে রাখে তবে তা নেতিবাচক প্রভাব অবশ্যই তার মনে পড়বে এবং তা রোগে পর্যবসিত হবে। যেমনভাবে পূর্বোল্লিখিত আটটি বৈশিষ্ট্য কোন শোকাক্রান্ত লোকের মধ্যে থাকলে তা রোগ বলে গণ্য তেমনি শোককে জোর করে চেপে রাখা এবং শোক প্রকাশে দেরী করাও এক প্রকার রোগ।

তবে একথার অর্থ এই নয় যে, যদি কেউ ইমাম হোসাইনের শোকানুষ্ঠানে ক্রন্দন না করে তবে সে অসুস্থ। কারণ, এটা এজন্য হতে পারে যে ইমাম হোসাইনের প্রতি ভালোবাসা নেই এবং তাঁর সাথে আদৌ একাত্মতার অনুভূতি তার মধ্যে নেই। সে নিজেকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন মনে করে। যতক্ষন কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি কারো ভালোবাসা না জন্মাবে ততক্ষণ সে তাকে হারানোর বেদনায় কাঁদবে না। যদি কেউ ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের ঘটনার মর্মান্তিকতাকে অনুভব নাও করে, তাঁর বরকতময় অস্তিত্বের অনুপস্থিতি মানবজাতির জন্য কতটা ক্ষতিকর তা নাও

বোঝে, তাহলেও অন্তত তা শোনার পর তার কোন পরিচিত প্রতিবেশীর মৃত্যুর শোকের পরিমানে হলেও শোকাহত হওয়া উচিত। নতুবা অবশ্যই সে অসুস্থ। কোন মুসলমান যদি এপরিমান ভালোবাসাও ইমাম হোসাইনের প্রতি না রেখে তবে তার উচিত স্বীয় ইমামের বিষয়টিকে যাচাই করে দেখা। কেননা, তার ধর্ম ধর্মীয় আদর্শ পুরুষদের প্রতি এতুটুকু ভালোবাসাও নেই যে, তাঁদের ওপর আপতিত এত বড় বিপদ ও মুসিবত তাকে নাড়া দেবে।

এধরনের লোকেরা মহানবী (সা.)-এর প্রতি কোনরূপ ভলোবাসাই রাখে না। এসম্পর্কে ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : 'আমাদের অনুসারীরা আমাদের প্রকৃতিতে সৃষ্ট হয়েছে, তাদের অন্তর আমাদের বেলায়াতের আলোয় আলোকিত, আমাদের ইমামতে তারা সুন্তষ্ট। আর আমরাও আমাদের বন্ধুত্ব ও অনুসরণের কারণে তাদের প্রতি সুন্তষ্ট। আমাদের কষ্ট তাদেরকে কষ্ট দেয় এবং আমাদের বিপদ-মুসিবতে তারা ক্রন্দন করে, আমাদের বেদনায় তারা বেদনাগ্রস্থ হয় আর আমাদের আনন্দে তারা আনন্দিত হয়। আমরাও তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ও সকল অবস্থায় তাদের সাথে আছি। তাদের কষ্ট ও চিন্তা আমাদের চিন্তাগ্রস্থ ও কষ্টে ফেলে। তারা কখনই আমাদের থেকে পৃথক হয় না এবং আমরাও তাদের থেকে কখনও পৃথক হই না।[৫৪০]

সুতরাং ইমাম হোসাইনের জন্য শোক প্রকাশ ও ক্রন্দন অসুস্থতা ও মানসিক রোগের লক্ষণ নয়; বরং তা মানসিক সুস্থতা ও ধার্মিকতার প্রমাণ। এ ধরণের শোক প্রকাশ ও ক্রন্দন মানুষের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে, তা তার কন্য উপশম বলে গণ্য।

ক্রন্দন শোকাক্রান্ত ব্যক্তির মনের ওপর চাপ হ্রাস করে। যদি সে চাপ ক্রন্দনের মাধ্যমে প্রকাশিত না হয় তবে তা শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, অশ্রু বিসর্জনের মাধ্যমে ক্ষতিকর অনেক উপাদান দেহ থেকে বের হয়ে যায়।

কারবালার ঘটনা আমাদের দৃষ্টিতে নিছক মনস্তত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের কাছে তার যৌক্তিকতাকে আমরা প্রমাণ করতে চাচ্ছি। কারণ, এমন অলৌকিক ঘটনাকে শুধু মানবিক

জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা কখনই ঠিক নয়। তাই আমাদের উদ্দেশ্যও এটা নয়। বরং আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতেও এধরনের ঘটনার জন্য ক্রন্দন করা সঠিক এবং অনেক নেতিবাচক প্রভাব এর মাধ্যমে দূর করা যায়।

ইমাম হোসাইনের ন্যায় আদর্শ ব্যক্তির ওপর আপতিত কঠিন কষ্ট ও মুসিবতে ক্রন্দন করার পেছনে যে ধর্মীয় ও মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা রয়েছে তার কিছু দিক নিম্নে উল্লেখ করছি :

১. যখন মানবতা ন্যায়ের মহাশিক্ষক মহানবী (সা.)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন এবং তার আহলে বাইতের ওপর আপতিত মুসিবতের বিবরণ শুনে ক্রন্দন করা হবে তখন তার মাধ্যমে এ মনঃকষ্টের জন্য সান্তনা পাবে ও তার প্রশমন ঘটবে। সেসাথে তাদের প্রিয় ব্যক্তির সুন্দর ও উত্তম বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং যে মহান উদ্দেশ্যের জন্য তিনি আত্মত্যাগ করেছেন সেগুলোর স্মরণ তাদের মনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

অবশ্য ধর্মীয় দৃষ্টিতে কারবালার ঘটনার স্মরণ শুধু একারণে নয়; বরং এটা প্রতি মুহূর্তে মহানবীর রেসালাতের মিশনকে। অব্যাহত রাখা, সত্যদ্বীনের প্রচার এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইমাম হোসাইনের আদর্শ ও সংস্কৃতিকে জাগ্রত রাখার প্রানসঞ্চারক উপাদান। এ শোকপালন আত্মপ্রশান্তি ও সান্তনার উর্ধ্বে ইমাম হোসাইনের শিক্ষালয়ে ধর্মরক্ষা ও পালনে আত্মত্যাগ, স্বাধীনতা, মনুষ্যত্ব ও পৌরুষের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়। তাই এটা একই সঙ্গে ধর্মীয় জ্ঞান ও শিক্ষার উন্নয়ন এবং ঐশী সহজাত প্রকৃতি ও আবেগ-অনুভূতির জাগরন- একদিকে অনুধাবন অন্যদিকে উদ্দীপনা।

২. ইমাম হোসাইনের জন্য শোক পালনের সংস্কৃতি দুই উৎস থেকে উৎপত্তি ও রূপ লাভ করেছে : ধর্মীয় নিয়মনীতি ও প্রথা এবং প্রত্যেক জাতির নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান। সুতরাং এ বিষয়টি যেমনি ঐশী তেমনি শরীয়তের অনুমোদিত গণ্ডিতে প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠীর স্থানীয় রীতি ও প্রথার ওপর নির্ভরশীল। তাই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে

শোক প্রকাশের স্থানীয় রীতি-প্রথা অন্যতম স্বীকৃত মাধ্যম-যা ব্যক্তির মনের কষ্ট দূর করতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

আহলে বাইতের ইমামগণ শোকগাথা পাঠ ও শোকপালনের যে পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন তা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতি সবধরনের লক্ষ্যহীন কর্ম ও বাড়াবাড়িমূলক আচরণ থেকে মুক্ত হিসেবে ইমাম হোসাইনের শোকে হৃদয়কে নাড়া দেয়ার মাধ্যমে প্রশান্তি অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা। যে হৃদয় ইমাম হোসেইনের ভালোবাসায় সিক্ত এবং আহলে বাইতের সাথে এই বন্ধনে আবদ্ধ তা তাঁদের কষ্ট ও মুসিবাতে ক্রন্দন করে স্বস্তি ও প্রশান্তি পায়। কিন্তু যে হৃদয়ে মহানবীর আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা নেই এবং তাঁদের বেদনায় বেদনাদগ্ধ হয় না সে এরূপ প্রশান্তির অর্থ বোঝে না। তার কাছে এ ধরনের শোক প্রকাশ অর্থহীন কর্ম বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা, সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ ও আহাজারির সাথে অপরিচিত ব্যক্তির কাছে এরূপ মায়ের বাঁধনহারা ক্রন্দন পাগলের বিলাপ ছাড়া কিছুই নয়।

৩. কোন ব্যক্তি যে কোন মুসিবতের কারনেই মনোবেদনায় থাকুক না কেন যখন ইমাম হোসাইনের শোকানুষ্ঠানে প্রবেশ করে তখন শোকাবহ পরিবেশ তার মনে প্রশান্তি এনে দেয়। এমন ব্যক্তি কোন আনন্দের অনুষ্ঠানে স্বস্তি বোধ করে না। কারণ, ঐ পরিবেশ তার মনের সাথে খাপ খায় না; বরং তার দুঃখক্লিষ্ট মন তার মতোই পরিবেশ চায় যাতে নিজের শোককে প্রকাশ করতে পারে।

৪. যার মন শহীদদের নেতার শাহাদাত আহলে বাইতের নিপীড়িত হওয়ার কষ্ট ও বন্দিত্বের মুসিবতের স্মরণে মূহ্যমান হয়েছে অথবা তার মনে কান্নার ভাব এসেছে সে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। অবশ্য যদি কারো মন ইমাম হোসাইনের প্রতি ভালোবাসাশূন্য হয়, তবে এরূপ অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে আরোগ্য লাভের জন্য অন্য কোন উপায় খুঁজতে হবে।

সুতরাং ইমাম হোসাইনের জন্য ক্রন্দন করা রোগ তো নয়ই; বরং তাঁর শোকে শোকাহত না হওয়াই অসুস্থত্র লক্ষণ। তাঁর কষ্টের সমব্যথী ব্যক্তি তাঁর স্মরণে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অংশগ্রহন ও ক্রন্দনের মাধ্যমেই প্রশান্তি পায়। ইমাম হোসাইনের জন্য ক্রন্দন করা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জন ছাড়াও তাঁর আন্দোলনের মহান লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন, ইসলামের পথে শাহাদাত ও আত্মত্যাগের আদর্শকে নিজেদের মধ্যে জাগ্রত রাখা এবং সত্যের প্রতিষ্ঠায় সাহসী ভূমিকা পালনের অনুপ্রেরণা দেয়।

৫. সামষ্টিকভাবে শোক পালনের অন্যতম সুফল হলো শোকাহত ব্যক্তির মানসিক চাপ দ্রুত পশমিত হয়। যেহেতু এরকম অনুষ্ঠানে সকলের মধ্যে একই অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া এতে পারস্পারিক মত বিনিময় এবং এক অপরের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। উত্তম আচরণ ও বিষয়ের অন্যের অনুসরণ, পারস্পারিক মেলামেশার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ, অন্য মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি জাগা ও মন হালকা হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোও এ থেকে অর্জিত হয়। মানসিক চাপ কমাতে এগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইমাম হোসেইনের স্মরণে আয়োজিত শোকানুষ্ঠানে তাঁর শোকে শোকাহত ব্যক্তিদের সামষ্টিক অংশগ্রহনের ফলে উপরিউক্ত সকল কল্যাণ হস্তগত হয়। মুমিন ব্যাক্তরা ইমাম হোসাইনের প্রতি এভাবে তাদের ভালোবাসা ব্যক্ত করার মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি অর্জন করে।

প্রশ্ন ৬৯ : ইসলামে দুঃখ ও আনন্দের স্থান কোথায় ?

উত্তর : ইসলাম হাসি- আনন্দ এবং দঃখ- শোকের কোনটিকেই সত্তাগতভাবে মূল্যবান বা মূল্যহীন অথবা পছন্দনীয় বা অপছন্দনীয় গণ্য করে নি। তাই এই দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্যের কোনটিই অপরটির ওপর শেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য রাখে না। কোন কারণ ছাড়াই ক্রন্দন বা আনন্দ করা একটি ভালো কাজ, এমন কথা ইসলাম বলে না। তবে আনন্দ

বা হাসির কারণ ও উদ্দেশ্যের ভিক্তিতে তা ভালো বা মন্দ হতে পারে। হাসি-কান্না মানুষের আত্মিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের প্রকাশক। এ দু'টি কাজ সামাজিক সম্পর্ক ও আল্লাহর দাসত্বের পথে নেতিবাচক প্রভাব না ফেললে তা সমর্থনযোগ্য ও কাঙ্খিত কর্ম। যদি ক্রন্দন মানুষের মনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, তা সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহর দাসত্ব ও মানবসেবার পথে প্রতিবন্ধক হয় তবে তা নিন্দনীয়। তেমনি হাসি ও আনন্দ যদি ধর্মীয় ও মানবিয় দায়িত্ব পালনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তবে তা সমালোচিত। হাসি ও ক্রন্দন এই দুই সহজাত অনুভূতির উৎস ও ফলাফলের ওপর এদের মূল্য নির্ধারিত হয়।

হাদীসে অজ্ঞতাপ্রসূত ও অর্থহীন হাসিকে নিন্দা এবং জ্ঞানপ্রসূত ও অর্থপূর্ন হাসিকে মূল্যায়ন ও প্রসংসা করা হয়েছে। ইমাম হাসান আসকারী (আ.) বলেছেন : 'অর্থহীন হাসি অজ্ঞতার পরিচায়ক।'[৫৪১] ইমাম কাযিম (আ.) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি কোন কারণ ছাড়া অযথা হাসে আল্লাহ্ তাকে ঘৃনা করেন।'[৫৪২]

সুতরাং সকল হাসিই মন্দ ও নিন্দিত নয়। তেমনি সকল কান্না ও দুঃখও অপছন্দনীয় নয়। যেমন আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনইসলামে অত্যন্ত মূল্যবান গণ্য হয়েছে। ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : মহান আল্লাহর কাছে রাতের অন্ধকারে তাঁর ভয়ে নিষ্ঠার সাথে এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন ও ক্রন্দনের চেয়ে প্রিয় কিছু নেই।'[৫৪৩]

হযরত আলী (আ.) বলেছেন : 'আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন আল্লঅহর রহমত বর্ষনের চাবিসরূপ।'অন্যত্র তিনি এ ধরনের কান্নাকে অন্তরের আলো ও গুনাহ থেকে ফিরে আসা ও দূরে থাকার নিয়ামক বলেছেন।[৫৪৪]

যেহেতু এ ধরনের ক্রন্দন জ্ঞান থেকে উদ্ভুত ও মানবীয় সহজাত প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিশীল তাই তা মূল্যবান। এ কান্না আত্মগঠন, আত্মসংশোধন ও আত্মিক উন্নতির সহায়কই শুধু নয়; বরং এজন্য অপরিহার্য। আল্লাহর বান্দাদের বিশেষত তাঁর প্রিয়

বান্দাদের বিপদে ও কষ্টে সহানুভূতি ও একাত্মতা প্রকাশে ক্রন্দনও এরূপ কান্নার অন্তর্ভূক্ত।

হাসি ও আনন্দও কখনই মন্দ ও অসুন্দর নয়। মহানবী (সা.)-এর জীবনীতে এসেছে, তিনি তার কোন সাহাবাকে বিষন্ন দেখলে তাকে আনন্দ দানের মাধ্যমে খুশি করতে চেষ্টা করতেন।[৫৪৫] তাই শরীয়তের সীমায় কৌতুক ও আনন্দ করা অপছন্দনীয় তো নয়ই, কখনও কখনও কাঙ্খিত।

এমনকি বিশেষ অবস্থা ছাড়া সাধারণভাবে মানুষের হৃদয় সবসময় প্রফুল্ল থাকা বানঞ্ছনীয়। তাই মনকে প্রফুল্ল রাখার জন্য শরীয়ত সমর্থিত প্রচলিত সকল পন্থা অবলম্বনে কোন সমস্যা নেই। যেমন খেলাধুলা, ব্যায়াম, ভ্রমণ, সুগন্ধি ও আতর ব্যবহার, আনন্দদায়ক পোশাক পরিধান, সর্বক্ষণ ভালো ও ফলদায়ক ও উপকারী কাজে ব্যস্ত থাকা ইত্যাদি। এগুলো মানুষের মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল রাখে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। ইসলামে মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে সবসময় মুখে মৃদু হাসি, হাসিমুখে সকলকে অভ্যর্থনা জানানো, অন্যের সঙ্গে সহজেই মেশা ও আচরণে তাদের আকৃষ্ট করা ইত্যাদি উল্লেখিত হয়েছে। আর এর বিপরীতে ভ্রুকুঞ্চিত মুখ, কর্কশ ও কঠোর আচরণকে মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে।[৫৪৬]

মানবজাতির মহাআদর্শ মহানবী (সা.) বলেছেন : 'আমিও মানুষ হিসেবে তোমাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করি, কিন্তু কখনও আমার কথা ও আচরণ সত্যকে অতিক্রম করে না (অর্থাৎ সত্যের মানদণ্ডকে বজায় রেখেই আমি তা করি)।[৫৪৭]

রাসূল (সা.) একবার কৌতুক করে বলেন : 'কেবল সুন্দর যুবকরাই বেহেশতে প্রবেশ করবে।' উপস্থিত বৃদ্ধরা এতে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : 'তোমরা প্রথমে যুবক হবে, তারপর বেহেশতে প্রবেশ করবে।'

অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে কাঙ্খিত আনন্দ হলো সেটাই যা অন্য মুমিনকে সন্তুষ্ট করা, সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করা, আচরণের মাধ্যমে ইসলামের রূপকে সুন্দররূপে উপস্থান

করার লক্ষ্যে সম্পাদিত হয়। তাই এই হাসি ও আনন্দের পেছনে ধর্মীয় বিশ্বাস, ইসলামের বিধান, নৈতিক ও সামাজিক কল্যান নিহিত রয়েছে। সঠিক চিন্তা ও শিক্ষার প্রসার তার অন্যতম লক্ষ্য।

কাউকে অপমান, সমালোচনা ও তিরস্কার, ঠাট্টা ও বিদ্রুপ, গীবত ও অপবাদ আরোপের উদ্দেশ্যে যদি হাসা হয় ও আনন্দ করা হয় তবে তা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত হবে এবং তা অবৈধ। তেমনি বিভিন্ন হাদীসে অট্টহাসি ও আনন্দের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘন ও মিথ্যা বলে মানুষকে হাসানো নিন্দিত হবে।

রাসূল (সা.) বলেছেন : 'অধিক হাসি ঈমানকে বিলীন করে।'[৫৪৮]

তিনি আরো বলেছেন : 'অট্টহাসি শয়তানের থেকে।'[৫৪৯]

সুতরাং কেউ আনন্দের বিষয়টি সম্পূর্নভাবে জীবন থেকে বাদ দিতে চায় তা ঠিক নয়। কেননা, সব ক্ষেত্রেই হাসি ও আনন্দ গুনাহ নয়।

আর ক্রন্দনের ক্ষেত্রেও কেবল সেই ক্রন্দনই মূল্যবান যা আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা এবং তার পছন্দনীয় বান্দাদের ওপর আপতিত মুসিবতে হয়। কারণ, এ কান্না জ্ঞান, নৈতিকতা ও আল্লঅহর পরিচয় ও ভীতি থেকে উৎসারিত। আর যে ক্রন্দন অযৌক্তিক ও পার্থিব কোন কারণে হবে তা নিন্দনীয়। তাই এ ধরনের কোন কারনে চিৎকার করে কান্না, মাথা ওবুক চাপড়ানো নিন্দনীয় কর্ম।

মোটকথা মুসলমানদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রফুল্ল, সজীব ও সতেজ থাকা বাঞ্ছনীয় এবং এটা সামাজিক দায়িত্ব পালন ও ব্যক্তি উন্নয়নের অপরিহার্য। এভাবেই তারা তাদের প্রতিভা ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটাতে পারবে।

স্বাভাবিকভাবে তার জীবনে এ অংশটা প্রাধান্য পাবে। এ কারনেই ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য হাস্যমুখ ও প্রফুল্ল স্বভাবের বলা হয়েছে। হাদীসে এসেছে : 'মুমিনের মুখ হাস্যোজ্জল এবং তার কষ্ট তার অন্তরে।'[৫৫০]

অন্যদিকে ইসলামে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করার প্রতি তাগিত দেয়া হয়েছে, কিন্তু তা একাকিত্বে ও গোপনে করতে বলা হয়েছে। প্রকাশ্যে মানুষের উপস্থিতিতে করতে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসে বলঅ হয়েছে : 'সিজদার সময় ক্রন্দন করা হলো আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থা।'[৫৫১] তেমনি বর্ণিত হয়েছে : রাতের অন্ধকারে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনে ঝরা এককোঁটা অশ্রু আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়।'[৫৫২]

তবে মনে রাখতে হবে, ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজের মানুষের মন প্রফুল্ল ও সতেজ থাকাকে আবশ্যক মনে করে, কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, ইসলাম মানুষকে হাসানোর জন্য কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করাকে জায়েজ সনে করে; বরং এসব হাসি ঠাট্টার অনুষ্ঠানকে বাতিলপন্থীদের কাজ বলে মনে করে ও এধরণের ব্যক্তিদের ক্ষতি গ্রস্থ বলে গণ্য করে।[৫৫৩] অন্যদিকে ইসলাম মুমিনকে প্রফুল্ল থাকতে বলেছে, ঠিকই কিন্তু তাকে সব সময় আল্লাহর স্মরণে রাখতে, তার ভয়ে ক্রন্দন করতে এবং তার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের শোকে শোকাহত ও তাদের বেদনায় ক্রন্দন করতেও বলেছে।

মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতে আনন্দ

আনন্দের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, কোন জয় ও কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়ার ফলে অর্জিত মানসিক শান্তির অনুভূতি। কষ্টহীন সুখকেও আনন্দ বলে অভিহিত কার হয়েছে। অ্যারিষ্টটলের দৃষ্টিতে সবার আনন্দের অনুভূতি হলো শারীরিক আনন্দ লাভ; মধ্যম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সুখ হলো ভালো কাজ করার ফলে আনন্দ পাওয়া এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের সুখ ও আনন্দ হলো জ্ঞান লাভ ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন। সক্রেটিস এজন্যই বলেছেন : 'আমি দুঃখিত মানুষ হওয়াকে আন্দিত শুকর হওয়ার ওপর প্রাধান্য দেই। কেননা, সে যদিও দৈহিকভাবে সর্ব্বোচ্চ সুখ ভোগ করে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তার চেষ্টাগত অবস্থানকে নির্ণয়ে সক্ষম নয়। তাই নিজের সন্তুষ্টিকে ব্যক্ত করতে পারে না।'

এ দৃষ্টিতে আনন্দ হলো সন্তুষ্টি ও সুখের পর্যায়ের (প্রকারের) সমষ্টি। তাই মানুষ জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন যাপনের আনন্দ লাভে সক্ষম না হলেও যেন সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে।

আনন্দিত থাকার পন্থা সম্পর্কে নিম্নোক্ত কাজগুলোকে উল্লেখ করা হয়ে থাকে : ১. উদ্বিগ্নতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম; ২. প্রতিকূলতা মোকাবিলা ও সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি; ৩. ভ্রমণ. ৪. খেলাধুলা; ৫. সাজা ওসুন্দর পোশাক পরা; ৬. আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগদান; ৭. কামনা-বাসনাকে সীমিত করা; ৮. মৃদু হাসি ও কৌতুক করা।

সুতরাং আনন্দ লাভের অন্যতম পথ হলো মৃদুহাসি, কিন্তু মনে রাখতে হবে ইসলামী জীবনে যে বিষয়টি কাঙ্খিত তা হলো সবসময় আনন্দে থাকা, সবসময় হাসা নয়। এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। এ আনন্দ ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের ছায়ায় অর্জিত হয়।

যদি হাসির মাধ্যমে রোগ ও অসুস্থতার চিকিৎসা করা যায় তবে কেবল তা দৈহিক ও পার্থিব কষ্টের জন্য নিরাময়ের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু মানব সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেক মানুষ সকল মানুষের কষ্টের সমব্যথী। তাই সে শুধু নিজের কষ্ট থেকে মুক্তি পেলেই আনন্দ অনুভব করে না ; বরং তার মনুষ্যত্বের দাবি হলো তার আনন্দ হবে বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিবেকপ্রসূত এবং জ্ঞান, ন্যায়, সত্য ও ভালোবাসার ভিক্তিতে আনন্দকে সার্বজনীনভাবে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে। এ আনন্দের অধিকারীরা নিজেকে বঞ্চিত রেখেও অন্যদের আনন্দিত করতে চায়। তারা ততক্ষণ আনন্দের স্বাদ পায় না যতক্ষণ না সকলকে আনন্দিত দেখে।

ধর্মীয় দৃষ্টিতে শোকের অনুষ্ঠান পালনের লক্ষ্যে।

মূলত তিনটি উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয় :

১. মহান আল্লাহর ইবাদত ও সন্তুষ্টি অর্জন।

২. ধর্মীয় জ্ঞান, বিধিবিধান, সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচার-আচরণ এবং জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সার্বিক বিষয় শিক্ষাদান করা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য;

৩. মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সৃষ্টি এবং মুমিনদের মধ্যে ভাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ়করণ;

৪. মহান আল্লঅহর পথে তাঁর যে সকল মহান বান্দা আত্মোৎসর্গ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং তাদের প্রদর্শিত পথে জীবন অতিবাহিত করার জন্য প্রতিশ্রুতবদ্ধ হওয়া।

বিশেষ শোকের দিনগুলোতে কালো পোশাক পরিধান

প্রশ্ন ৭০ : কালো পোশাক পরিধান কি মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না?তবে কেন শোকের দিনগুলোতে কালো পোশাক পরা হয় ?

এ ধরনের চিন্তা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে মানুষের মনের ওপর বিভিন্ন রংয়ের প্রভাবের যুক্তিনির্ভর। মনে রাখা আবশ্যক, যদি কেউ জীবনের প্রতি নিরাশ হয়ে একে নিরর্থক ভেবে সবসময় কালো পোশাক পড়ে (অন্য রংয়ের পোশাককে চিরতরে বর্জন করে) তবে হয়তো এমন চিন্তার ফলে কারো মনের ওপর ঐ রংয়ের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে, কিন্তু যদি কেউ এমন চিন্তার বশবর্তী না হয়ে শুধুই শোকের আবহ সৃষ্টির জন্য ও অন্যদেরকে শোকের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করার জন্য তা পরে, মনস্তাত্ত্বিকভাবে এমন ব্যক্তির ওপর ঐরূপ প্রভাব কখকই পড়তে পারে না। কেননা, রংয়ের প্রভাব মানুষের মনের ওপর এতটা তীব্র নয় যে, কেউ সীমিত দিন ও সময়ের জন্য কালো পোশাক পড়লে তার চিন্তা-চেতনা ও আচরণে অস্বাভাবিক প্রভাব ফেলবে। এরূপ ক্ষেত্রে কালো পোশাক পরার অর্থ জীবনের প্রতি নিরাশ হওয়া নয়; কারো ওপর প্রিয় ও নিকট

কাউকে হারানোর মতো বিপদ ও দুঃখ আপতিত হলে এরূপ পোশাক তার মনে দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি করে ও তাকে এ শোকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ও নীরবতা পালনে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে তার মনের সাথে তা বহ্যিক ভূষণের সমরূপতা দেখা দেয় যা তার মনের সান্তনার কারণ হয়। তাকে আনন্দময় পরিবেশ থেকে দূরে রাখে। তাই সাময়িক সময়ের জন্য এমন রংয়ের পোশাক পরা ক্ষতিকর নয়।

কিন্তু ইসলামে সকল সময় এ রংয়ের পোশাক পরতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে : 'কালো পোশাক পরিধান করো না, কেননা, তা ফিরআউনের পোশাক।[৫৫৪] এর বিপরীতে ইসলামের সবচেয়ে পছন্দীয় রং হলো সাদা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : 'সর্বোত্তম পোশাক হলো সাদা।'[৫৫৫] ইসলামের দৃষ্টিতে সাদা হলো দিনের প্রতীক- যা প্রশান্তি, সজীবতা, কর্মচঞ্চলতা ও চেষ্টা প্রচেষ্টার চিহ্নবাহী। সাদার পর ইসলামের পছন্দের রং হলুদ ও সবুজ। কালো হলো ক্লান্তি ও অবসানের প্রতীক।

তাই কালো পোশাক পরার অনুমতি সাময়িকভাবে শোকের দিনের জন্য দেয়া হয়েছে। ইবনে আকিল হাদীদ বর্ণনা করেছেন : ইমাম হাসান (আ.)-এর মৃত্যুর পর কালো পোশাক পরে জনতার সামনে উপস্থিত হন। এভাবেই তাদের সামনে বক্তব্য রাখেন।[৫৫৬] কিন্তু সাধারণভাবে এ রংয়ের পোশাক পরা অপছন্দনীয় এবং কালো পোশাক পরে নামায পড়া মাকরুহ।

প্রশ্ন ৭১ : কিভাবে ইমাম হোসাইনের স্মরণে আমরা ক্রন্দনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করব?

এ প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য প্রথমে মনের কষ্ট ও বেদনাকে প্রকাশের একটি মধ্যম ও আচরণগত অবস্থা হিসাবে কান্নাকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এতে এধরণের অনুভূতি প্রকাশে যে সকল প্রভাব উপাদান ও কারণ হয়েছে তাকে কার্যকর করার পদ্ধতি বর্ণনা করে।

কান্না অনেক প্রকার; কান্নার ধরণ আনন্দের কান্না থেকে শোকের কান্না পর্যন্ত বিস্তৃত। যেহেতু ইমাম হোসেইনের জন্য কান্না শোকের কান্না, তাই আমাদের আলোচনা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব।

শোকের কান্না দুঃখের অনুভূতির প্রতিক্রিয়ায় দুঃখভরাক্রান্ত ব্যক্তি থেকে প্রকাশিত হয়। এটি শোক ও মনঃকষ্টের একটি আচরণগত ও সামাজিকভাবে প্রকাশিত রূপ। সুতরাং আজাদারিতে ক্রন্দন করতে হলে এর উদ্দীপক ও নিয়ামকগুলোকে অর্জন করতে হবে। কোন শোকাবহ ঘটনা, যেমন প্রিয় কোন বস্তু বা মানুষকে হারানোর প্রতিক্রিয়ায় দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে থাকে। কারো কাছে যদি ইমাম হোসাইন অত্যন্ত প্রিয় বলে গণ্য হন তবেই কেউ তার বিচ্ছেদে ক্রন্দন করবে। যদি কারো অন্য কিছুর প্রতি বেশী ভালোবাসা থাকে তবে তার হৃদয় ইমাম হোসাইনের জন্য আলোড়িত হবে না।

ইমাম হোসাইনের শাহাদাত ও তাঁকে হারানোর বেদনা যদি মনে প্রচন্ড প্রভাব ফেলে তবেই কারো কান্না পাবে। আর এ ধরনের অনুভূতি সৃষ্টির জন্য এ মহান ব্যক্তিকে আমাদের চিনতে হবে। যখন কেউ তার জীবনে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ভূমিকা ও প্রভাব সম্পর্কে জানবে কিংবা তার কাছে মহামূল্যবান বলে গণ্য কোন কিছুর প্রতিরক্ষায় কারো আত্মত্যাগী অবদানের কথা শুনবে তাঁর প্রতি ব্যক্তির মনে ভালোবাসার বন্ধন সৃষ্টি হবে। তাই ইমাম হোসাইনের জন্য কান্নার জন্য প্রথমে তাঁর সঠিক পরিচিতি অর্জন করতে হবে। ইমাম হোসাইনের ব্যক্তিত্ব, তাঁর আদর্শ ও অনুসৃত পন্থা, তাঁর জীবনের লক্ষ্য, তাঁর বিশ্বাস, ব্যক্তি, সমাজ ও ইসলামের জন্য তাঁর আত্মত্যাগী ভূমিকা, আমাদের জীবনে তাঁর চরিত্র ও কর্মের প্রভাব- এগুলোর সবই তাঁর সাথে আমাদের ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি করে। অবশ্য এ পরিচিতি শুধু চিন্তাজগতে থাকা যথেষ্ট নয়; বরং আমাদের জীবনে এ ভালোবাসার সরব ও লক্ষ্যনীয় উপস্থিতি থাকতে হবে, তবেই তাঁর অনুপস্থিতি আমাদের জন্য বেদনাদায়ক ও অসহনীয় হবে। এমনভাবে আমাদের জীবনে তাঁর উপস্থিতি থাকতে হবে যেন আমরা অনন্তকাল ধরে এ মহান পুরুষের সান্নিধ্যে কাটিয়েছি এবং তার সুন্দর

ও প্রেমপূর্ণ ছোঁয়া আমাদের প্রতি মুহূর্তে স্পর্শ করেছে। আমরা যেন তাকে হারিয়ে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

যে ব্যক্তি তার মধ্যে ইমাম হোসাইনের উষ্ণ উপস্থিতি ও ভালোবাসাকে যত বেশী অনুভব করবে তাঁর বিচ্ছেদ তাকে তত বেশী মর্মাহত করবে। যে অনুভব করবে ইমাম হোসাইনের সাথে সে অনন্তকাল জীবন কাটিয়েছে ও তার স্নেহ ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছে সে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবে; তাঁর কষ্ট, দুঃখ ও বেদনাকে নিজের দুঃখ কষ্ট ও বেদনার চেয়ে অসহনীয় মনে করবে। (আর এ অবস্থাটি কেবল তাদের মনেই সৃষ্টি হয় যারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে তাদের পিতামাতা, সন্তান, স্ত্রী, গোত্র, জাতি, ব্যবসা-বানিজ্য, বাসস্থান ও গৃহ, এমনকি নিজেদের প্রান থেকেও ভালোবাসে যেরূপ ভালোবাসার নির্দেশ আল্লাহ সূরা তাওবার ২৪ নং আয়াতে দিয়েছেন এবং তা না থাকাকে অবাধ্যতা বলে গণ্য করেছেন।)

প্রশ্ন ৭২: মানুষের কর্ম ও আচার-আচরণ অবশ্যই তার বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তা এবং জ্ঞান-পরিচিতির ভিক্তিতে হওয়া উচিৎ: তাহলে কেন আশুরার শোকানুষ্ঠান আবেগ-অনুভূতি ও উদ্দীপনার ভিক্তিতে করা হয় ? তদুপরি আবেগ-অনুভূতির মধ্য হতে কেন শুধু নেতিবাচক অনুভূতি, যেমন ক্রন্দন ও বিলাপকে বেছে নেয়া হয়? আশুরার অনুষ্ঠান কেন হাসি-আনন্দ, নিরবতা পালন এবং সভা-অধিবেশনের মাধ্যমে পালিত হয় না ?

উত্তর : এ প্রশ্নের জবাবে প্রথমে ভূমিকা হিসিবে দু'টি প্রশ্ন উপস্থাপন করব। এরপর এদু'টি প্রশ্নের শেষে মূল প্রশ্নের উত্তরে যাব। প্রথমত, কোন উপাদানগুলেঅ মানুষের আচার-আচরণের প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে?দ্বিতীয়ত, মুসলমানরা কোন উদ্দেশ্যে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর জন্য শোকানুষ্ঠান পালন করে ?

প্রথমত, আচার –আচরণ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদাসমূহ

মানুষ থেকে যে অসংখ্য আচরণ এবং কর্ম প্রকাশিত হয়ে থাকে তার মধ্য হতে একটি হলো আশুরার ঘটনার স্মরণ ও শোকপালন। সুতরাং মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষের আচার-আচরণের ওপর কার্যকর সুফল মূলনীতি ও নিয়ম থেকে এটা ব্যতিক্রম নয়। তাই যে সকল মূলনীতি, নিয়ম ও ক্ষেত্র কোন আচরণের পেছনে বিদ্যমান ইমাম হোসাইনের শোক পালনের আচরণের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কমপক্ষে দু'টি মৌলিক উপাদান মানুষের কর্ম ও আচার-আচরণের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি পরিচিত এবং অপরটি উৎসাহ-উদ্দীপনা।

মানুষের আচরণের একটি কার্যকারী উপাদান হলো পরিচিতি ও জ্ঞান। যার মাধ্যমে মানুষ কোন বিষয়কে অনুধাবন করে, একে গ্রহন করে এবং এর ওপর ভিক্তি করে কাজ করে থাকে। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিশেষ বিষয় সম্পর্কে না জানে ও তার সাথে পরিচিত না হয় ততক্ষণ ঐ বিষয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। তবে কোন বিষয়ে বিশেষ আলোচনার ক্ষেত্রে পরিচিতিমূলক উপাদান জরুরি, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। কোন কাজের জন্য পরিচিতি ছাড়াও অন্যান্য উপাদান থাকতে হবে যা ঐ আচরণের প্রকাশের জন্য আমাদেরকে উৎসাহ যোগাবে। ঐ বিষয়ের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হতে হবে, ফলে কাজটি বাস্তব রূপ লাভ করবে। কোন আচরণের ক্ষেত্রে আবশ্যকভাবে এর প্রতি আকর্ষন ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হতে হবে তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে।

একটি সাধারণ উদাহরনের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা সম্ভব। কোন পথ অতিক্রম করার জন্য পথের নকশা এবং তা পাড়ি দেয়ার জন্য বাহন ও মাধ্যম প্রয়োজন। পরিচিতিমূলক উপাদান পথের নকশার মতো কাজ করে, কিন্তু মানুষের আচরণের যন্ত্র চালু হওয়ার জন্য নকশা ছাড়াও আরো শক্তিশালী কোন উৎপাদন দরকার যা দিয়ে সে নির্দিষ্ট পথে যাত্রা শুরু করতে পারে। অর্থাৎ উৎসাহ-উদ্দীপনা মানুষের আচরণের জন্য

ইঞ্জিনসরূপ এবং পরিচিতিমূলক জ্ঞান হলেঅ নকশা। সুতরাং স্পষ্ট যে, কোন বিষয় সম্পর্কে পরিচিতি ও জ্ঞান- যা নকশার ভূমিকা পালন করে, তা কোন বিশেষ কাজ ও আচরণকে বাস্তব রূপ দানের জন্য যথেষ্ট নয় এবং তা আমাদের মধ্যে গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রার জন্য গতির সৃষ্টি করে না।

যদিও শোক প্রকাশের জন্য কারবালার ঘটনা এবং ইমাম হোসাইন (আ.)- এর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর আন্দোলনের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে পরিচিত থাকা অত্যন্ত জরুরী, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়; পরিচিতি ছাড়াও উৎসাহ- উদ্দীপনার প্রয়োজন রয়েছে।

অনেক মানুষ আছে যারা ইমাম হোসাইন (আ.) সম্পর্কে জানে, কিন্তু তাদের শোক প্রকাশের জন্য কোন উৎসাহ নেই। এ কারণেই বছরের পর বছরমুসলমান হিসেবে জীবনযাপন করলেও এবং তারা তৃতীয় ইমাম হিসেবে ইমাম হোসাইনের সাথে অপরিচিত না হলেও তাদের অন্তরে শোক পালনের বিন্দুমাত্র উৎসাহ খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি তাদের কেউ কেউ ইমাম হোসাইন (আ.)- এর প্রতি শোক পালনকারীদের ঠাট্টা- বিদ্রুপ করে থাকে। তাদের এ শোক পালনকে মূর্খতা ও অর্থহীন কর্ম এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বলে মনে করে। এ শ্রেণির দৃষ্টিতে ইমাম হোসাইন (আ.) একটি আন্দোলন করেছেন, ভালো- মন্দ যাই হোক না কেন, তা গত ও নিঃশেষ হয়ে গেছে ? কেন আমরা এত বছর এবং শতাব্দী পরও শোক পালন করব, এ ঘটনাকে পুনরুজ্জীবিত করব? এ কাজের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?এতে ইমাম হোসাইন (আ.) বা আমাদের কোন লাভ আছে কি ?

কিন্তু শোকানুষ্ঠান কিভাবে উৎসাহ- উদ্দীপনা বৃদ্ধি করা যায়- এটি অন্যত্র আলোচনার বিষয় এবং উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরের সাথেও সম্পর্কিত নয়। বর্তমানে আমাদের মূল আলোচনার বিষয় হলেঅ কোন উৎসাহ- উদ্দীপনার কারণে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য শোক প্রকাশকারীরা আযাদারি ও শোক পালন করে থাকে। মূলত আমরা জানতে

চাই, কোন ধরনের আচরণ থেকে শোকপালনের দু'টি মৌলিক উপাদান (পরিচিতি এবং উৎসাহ- উদ্দীপনা) প্রতিফলিত হয়।

দ্বিতীয়ত, মুসলমানরা কোন উদ্দেশ্যে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর জন্য শোকানুষ্ঠান পালন করে

উৎসাহ-উদ্দীপনা কোন আচরণের কারনকে ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ যখন কোন কাজের পেছনে বিদ্যমান উৎসাহ-উদ্দীপনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে তখন এর উদ্দেশ্যে হলেঅ কোন কারণে এ ধরনের আচরণ করা হয়েছে এবং কোন বিষয়গুলো একাজের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তা জানতে চাওয়া। আমাদের খুব ভালোভাবে জানা রাখা দরকার কেন মুসলমানরা শোকপালনের সংস্কৃতি এবং ইমাম হোসাইন (আ.) ও তাঁর অন্দোলনের প্রতি অনুরাগ দেখায়।

প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিচিত এবং উৎসাহ উদ্দীপনার পর্যায় অনুযায়ী শোক পালন করে থাকে। অর্থাৎ শোক পালনের ক্ষেত্রেমুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকাশের অনেক ধরণ থাকতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের অন্তরে যে সকল উদ্দীপনাে এ বিষয়টির পেছনে কাজ করে সেগুলোকে তালিখা আকারে প্রকাশ করা এখানে উদ্দেশ্যে নয়; বরং এ বিষয়টি বিশ্লেষনের উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল উদ্দীপনার বিষয় বর্ণনা করা যেগুলো গ্রহনযোগ্য ধর্মীয় শিক্ষা এবং এর প্রসারে কাজে লাগে অথবা ঐ সকল সার্বিক বিষয় বর্ণনা যেগুলেঅ মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

ইসলামী চিন্তার গভীরে এবং মানুষের স্মৃতিতে স্থায়িত্ব লাভের দৃষ্টিতে কোন ইতিহাসে সৃষ্টিকারী ঘটনা নিম্নলিখিত তিনটি উদ্দেশ্যে পালিত হয়ে থাকে :

১. স্মৃতিতে ঐ ঘটনাকে পুনরুজ্জীবিত এবং পুনঃনির্মাণ করা।

২. গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মর্যাদা রক্ষা এবং এর রচয়িতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞপন।

৩. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শিক্ষাগ্রহন এবং আদর্শ বিনির্মাণ।

যেহেতু আশুরার ঘটনাটি নবুয়াতের মিশন[৫৫৭] ও ইসলামের অব্যাহততার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং সকল যুগের মানুষের দ্বীনি উদ্দেশ্যকে (নৈতিক বিকাশ এবং সমাজের হেদায়েত) অর্জনের লক্ষ্যে সম্পাদিত হয়েছে, সে কারনে আমরা শোকানুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে ঐ ঘটনাটিকে স্মৃতিতে জাগরুক এবং ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশে একে পুনঃনির্মাণ করে থাকি যাতে তা সকল সময়ের জন্য মানবজীবনের আদর্শ হিসেবে থাকে।

অন্যদিক থেকে মুসলমানদের স্মৃতিতে ইমাম হোসাইন (আ.) সম্পর্কে একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুভূতি এবং তাঁর প্রতি ঋণী থাকার অনুভূতি রয়েছে। যদি কেউ নিজেকে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর কাছে ঋণী এবং তাঁর প্রতি দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে শোকানুষ্ঠানে অংশগ্রহন করে; যেন নিজের বিবেককে সন্তুষ্ট করতে পারে। অবশ্য হয়তো এ শোকপালন তাৎক্ষনিকভাবে তার জন্য হেদায়েত ও পথনির্দেশনার উপকরণ নাও হতে পারে; কিন্তু ঐতিহাসিক এ ঘটনার রচয়িতা ইমাম হোসাইন (আ.) ঐ সময়ে তাঁর মহান ভূমিকার কারণে মুসলমানদের ওপর এ অধিকার রাখেন যে, শোকের মাধ্যমে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং নিজের ঋণ পরিশোধ করবে।

স্বাধীনতাকামীদের নেতা ইমাম হোসাইনের জন্য শোকানুষ্ঠান পালন এবং আশুরার বার্তাকে পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে তাঁর আন্দোলন থেকে মডেল তৈরী সম্ভব যেন হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে ইমাম হোসাইনের মতো সত্যের পক্ষে বিপ্লবী কাজ করা সম্ভব হয়। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, কোন কর্মের পেছনে বিদ্যমান কারণ ও উদ্দেশ্যই তার ধরণ, গুণগত মান এবং পরিমাপকে নির্ধারিত করে। মানুষের বসবাসের জন্য নির্মান করা ভবনের কাঠামোর সাথে বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত ভবনের পার্থক্য রয়েছে।

ইমাম হোসাইন (আ.)-এর আন্দোলনের শোক এমনভাবে পালন করতে হবে যেন এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের সহযোগী হয়। কিভাবে আমরা ইমাম হোসাইনের শোকানুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি?

হোসাইন ইবনে আলী (আ.)-এর শাহাদতকে এমনভাবে পালন করা উচিত যেন তা মানবজীবন গঠনের শিক্ষা দেয় এবং মুসলমানদেরকে রিসালাতের মিশন বাস্তবায়নের পথে পরিচালিত করে।

কখনই কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ, সেমিনার ও সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে ইমাম হোসাইনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন ও আল্লাহর রাসূলের মিশনের পথকে অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়।

যেমনভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন কাজের ধরণ ও গুণগত মান এমনভাবে হতে হবে যেন মানুষের মধ্যে সঠিক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টিতে সাহায্য করে, এ কারণে কিছু কিছু অনুষ্ঠান উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টিতে সাহায্য তো করেই না; বরং তাকে নষ্ট করে। তাই আনন্দ অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে আদালত ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার হোসাইনী আন্দোলনকে উপযুক্ত মর্যাদা দান এবং এর আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

হয়তো এমন অনেক অনুষ্ঠান রয়েছে যা মানুষের কাজের উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, কিন্তু তার উদ্দেশ্যের একাংশকেই কেবল পূর্ণ করে অথবা উদ্দেশ্যের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। উদাহরণসরূপ, কিছু সময়ে নীরবতা পালনের মাধ্যমে কিভাবে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর পথকে অব্যাহত রাখা সম্ভব এবং কিভাবে তাঁর আদর্শের বাস্তবায়নে তা ভূমিকা রাখবে?যদিও ইমাম হোসাইনের মতাদর্শের পরিচিতি এবং উদ্দেশ্যের প্রচারের জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন অথবা একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন কিছুটা ভূমিকা পালন করে, কিন্তু কেবল একাজগুলো ইমামের আদর্শ অনুসারে কর্ম সম্পাদন এবং তাঁর শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

আমরা অনেকে ক্ষমার মতো ভালো গুণ সম্পর্কে জানি, কিন্তু বাস্তব জীবনে অন্যদের ক্ষমা করার ইচ্ছা পোষণ করি না এবং উৎসাহ খুঁজে পাই না। মহান হোসাইনী আন্দোলনের গুরুত্বের জ্ঞান এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্যর ক্ষেত্রে এর বিশাল প্রভাবের কথা জানার পরও আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ পথের ওপর আমল করার জন্য

উদ্দীপনা পাই না। কেবল তখনই শহীদদের নেতা সম্পর্কে জ্ঞান এবং তার স্মৃতির স্মরণ আমাদেরকে তাঁর পথ অনুসরণ করার জন্য অগ্রসর করে যখন আমরা উদ্দীপ্ত হই এবং আমাদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। এ উদ্দীপনার ওপর ভিত্তি করেই আমরা এ কাজগুলো করতে পছন্দ করি এবং তাঁর উদ্দেশ্যে এবং অন্দোলনের পথে পা বাড়াই। অবশ্যই আমাদের আবেগ-অনুভূতিকে এ ধরনের কাজ ও আচরণের প্রতি অনুপ্রাণিত হতে হবে ; তাহলেই আমরা ইমাম হোসাইনের অনুরূপ কাজ করতে পারব এবং এর মাধ্যমে আমাদের ঋণ আদায় এবং তাঁর স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারব।

এ কারণে এ অনুষ্ঠানগুলোতে যখন দু'টি মৌলিক উপাদানের উপস্থিতি থাকবে তখনই তাঁর ঋণ আদায় এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে। এ দু'টি মৌলিক উপাদানের একটি ইমাম হোসাইন (আ.) ও তাঁর আন্দোলন এবং উদ্দেশ্যে সম্পর্কে সার্বিক পরিচিতি; অপরটি হলো পরিচিতির পর আবেগ-অনুভূতিকে তাঁর পথে শক্তিশালী করা এবং মানুষকে ইমামের উদ্দেশ্য ও মতাদর্শ অনুযায়ী চলার জন্য অনুপ্রাণিত করা। অর্থাৎ অন্তরসমূহে হোসাইনী আদর্শের জ্ঞান বৃদ্ধি করা ও উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটানো যার ফলাফল দাঁড়াবে, সে হোসাইন (আ.)-এর মতো কাজ করবে।

কেউ কেউ মনে করতে পারে, এইধরণের অনুষ্ঠানগুলোতে আবেগ-অনুভূতির মিশ্রণ থাকার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য; কিন্তু প্রশ্ন হলো আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও কেন আমাদেরকে শুধু নেতিবাচক অনুভূতি, যেমন- ক্রন্দন, আহাযারি, শোকগাথার মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে হবে।

ক্রন্দন-হাসি, আনন্দ-দুঃখ অনুভূতি প্রকাশের দু'টি বিপরীতমুখী দিক; এ দুটিই অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। কিন্তু এদর বাস্তব প্রভাব ভিন্ন। এ কারণে এমন আবেগ ও অনুভূতিকে নির্বাচন করতে হবে যেখানে পরিচিতির পাশাপাশি এর উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রও প্রস্তুত করে এবং প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা জোগায়। যদি ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শোক হাসির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয় তাহলে তা কখনই হোসাইনী আন্দোলনকে

পনুরুজ্জীবিত করার কারণ হবে না। হাসি-তামাশা ও আনন্দ-উল্লাস মানুষকে কখনই শাহাদাত ও ত্যাগের পথে আহবান করতে পারে না, মানুষের মধ্যে প্রতিরোধ এবং সত্যানুসন্ধানের প্রবণতাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে না।

আরেক দিক থেকে মানুষের মধ্যে আবে-অনুভূতির সম্পর্কের গভীরতম পর্যায়টি কেবল ক্রন্দন এবং শোকপালনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। একসঙ্গে হাসি-আনন্দ করা সবসময় তাদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে আত্মিক সম্পর্কের লক্ষণ নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার কেউ আনন্দ উল্লাসের অংশীদার ও সাথি হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে অন্তরের গভীরে সন্তুষ্ট নাও থাকতে পার। কিন্তু মানুষের অন্তরের গভীর থেকে . উত্থিত. দুঃখ-বেদনা ও ক্রন্দনে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য থাকে না। এ কারণে বলঅ হয়-কারো সুখের সময়ের সঙ্গী হওয়া প্রকৃত বন্ধুর ও প্রেমিকের পরিচয় বহন করে না, কিন্তু প্রকৃত বন্ধু ও প্রেমিক হলো সে যে আপনার দুঃখ ও অভাবের সময়ে সঙ্গী হয়। এ ছাড়াও দুঃখ-বেদনার কোন সুনির্দিষ্ট ঘটনা থেকে যে গভীর প্রভাবের সৃষ্টি হয়, আনন্দের ঘটনা থেকে তা হয় না।

এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর ভিত্তি করে বলা যায় ইমাম হোসাইন (আ.)-এর সাথে সহযোগীতা করা ক্রন্দনের মাধ্যমে দৃশ্যমান ও স্পষ্ট হয়। কোন মুসিবত ও দুঃখ-ভরাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন এবং শোকপালন করা অধিকতর নির্ভেজালভাবে তার সাথে একাত্ম বিষয়টিকে চিত্রায়িত করে। যদি নিজের পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তির প্রতি নিষ্ঠার সাথে সহমর্মিতার বিষয়টি ব্যক্তি ও তাঁর প্রতি ভালোবাসাকে প্রমাণ করতে চাই তাহলে তার দুঃখের অংশীদার হতে হবে-আনন্দের নয়। এ বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে বলা সম্ভব, ইমাম হোসাইন (আ.)-এর স্মরণ যদি শোকানুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে করা হয় তাহলেই তাঁর সাথে প্রকৃত সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয় এবং উত্তমরূপে তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করা হয়।

তথ্যসূত্র

১. আনগীযেস ও হায়াজন, এডওয়ার্ড জী. মুরী, অনুবাদক মুহাম্মদ তাকীবারাহিনী, শেরকাতে সাহমীয়ে চেহর, ফারসি সাল ১৩৬৩, পৃ. ৩২।

২. যামিনেয়ে রাওয়ান-সেনোসীয়ে ইজতেমায়ী, আলী আকবার মেহের অরো, মেহেরদদ্, প্রকাশনী, ফারসি সাল১৩৭৩, পৃ. ১৮৪।

৩. অযারাখসে দিগার আয অসেমনে কাবালা, মুহাম্মদ তাকী মেসবাহ ইয়াযদী, মুয়াসসেসে অমুযেস ও পাযুহেসে ইমাম খোমেইনী প্রকাশনী, ফারসি সাল ১৩৭৯, পৃ. ১১-২০।

৪. খুলাসেয়ে তরিখে ইসলাম, সাইয়্যেদ হাশেম রাসূলী মাহাল্লাতী, দাফতারে নাশর ওয়া ফারহাঙ্গে ইসলামী প্রকাশনী, ফারসি সাল ১৩৭২, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯।

সপ্তম অধ্যায়

আশুরা সংক্রান্ত মঞ্চ অনুষ্ঠান

৭৩ নং প্রশ্ন : বিশেষ করে অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলের মসজিদ ও ইমামবাড়িতে মঞ্চ অনুষ্ঠান আয়োজন করে, এ জন্য যে এটা তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি। কখনো এটা মানুষের অন্তরের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ ধরনের অনুষ্ঠানের হুকুম কী?

উত্তর : যদি আশুরা সংক্রান্ত এ ধরনের নাট্য অনুষ্ঠান মিথ্যা ও বাতিল না হয় এবং এ সকল অনুষ্ঠানে সত্য মাযহাবের অবমাননা না হয় তাহলে কোন সমস্যা নেই। এমন অবস্থায় উত্তম হচ্ছে ঐ সকল অনুষ্ঠানের পরিবর্তে ওয়াজ মাহফিল, জনগণকে সঠিক পথপ্রদর্শন, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মুসিবতের স্মরণ ও মর্সিয়া পাঠের অনুষ্ঠান চালু করা।[৫৫৮]

আয়াতুল্লাহ সাফী গুলপাইগানী- 'যদি তাজিয়া ও আশুরা সংক্রান্ত নাট্য অনুষ্ঠান হারাম কজের শামিল না হয় তাহলে কোন সমস্যা নেই।'[৫৫৯]

পতাকাবাহী শোক পালন

৭৪ নং প্রশ্ন : ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোকের অনুষ্ঠানে পতাকা রাখা এবং তা শোক পালনকারীদের হাতে বহন করার হুকুম কী?

উত্তর : হযরত আয়াতুল্লাহ খোমেইনী, আয়াতুল্লাহ তাবরিযি, আয়াতুল্লাহ ফাজেল লানকারানী, আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজী, হযরত আয়াতুল্লাহ সিসতানীর মতে কোন সমস্যা নেই।[৫৬০]

হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনাঈর মতে, মৌলিক ভাবে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু এ সকল বিষয়কে ধর্মের অংশ হিসেবে গণ্য করা যাবে না।[৫৬১]

আয়াতুল্লাহ নূরী হামেদানীর মতে, এগুলোকে সমাজে বর্তমানে প্রচলিত পর্যায়ে ব্যবহারে (অর্থাৎ অতিরঞ্জন না হলে) কোন সমস্যা নেই।[৫৬২]

আয়াতুল্লাহ সাফী গুলপাইগানীর মতে, পতাকা বহন করা ধর্মীয় নিদর্শনসমূহের (شعائر) প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হতে পারে এবং তাতে কোন সমস্যা নেই।[৫৬৩]

শোকের অনুষ্ঠানে বাদ্য বাজানো

৭৫ নং প্রশ্ন : শোকের অনুষ্ঠানে আমোদ- প্রমোদের যন্ত্র এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের হুকুম কী?

উত্তর : আয়াতুল্লাহ বাহজাত ও আয়াতুল্লাহ সাফী গুলপাইগানী ছাড়া সকল ফকীহর মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে যে, যদি ঐ সকল বাদ্যযন্ত্র শুধু আমোদ- প্রমোদ ও হারাম কাজের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে কোন অবস্থাতেই ঐগুলো শোকের অনুষ্ঠানে ও অন্য কোন অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি এমন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় যেগুলো আমোদ- প্রমোদ ও হারাম কাজে ব্যবহৃত হয় আবার হালাল কাজেও (যেমন যুদ্ধের ময়দানে) ব্যবহৃত হয় তাহলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে শোকের অনুষ্ঠানে অথবা আনন্দের অনুষ্ঠানে ব্যবহারে কোন সমস্যা নেই।[৫৬৪]

আয়াতুল্লাহ বাহজাত ও সাফী গুলপাইগানীর মতে, সার্বিকভাবে বাদ্য বাজানো যে কোন অবস্থায় হারাম। তা শোকের অথবা আনন্দের অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।[৫৬৫]

৭৬ নং প্রশ্ন : শোকের অনুষ্ঠানে বাঁশি, শানাই বাজানোর হুকুম কী?

উত্তর : আয়াতুল্লাহ খোমেইনী, আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী, আয়াতুল্লাহ ফাজেল লানকারানী : এমনভাবে বাদ্যযন্ত্র বাজানো যা শ্রোতার মধ্যে নাচের প্রবণতা ও আমোদ- প্রমোদের ভাব সৃষ্টি করে এবং গুনাহ ও আনন্দ- ফুর্তির অনুষ্ঠানের উপযোগী তা শোকের অনুষ্ঠানে বাজনো হারাম।[৫৬৬]

আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজী, আয়াতুল্লাহ সিসতানি, আয়াতুল্লাহ জাওয়াদ তাবরিযি, আয়াতুল্লাহ নূরী হামাদানী, আয়াতুল্লাহ ওয়াহিদ খোরাসানীর মতে, গুনাহ ও আনন্দ- ফুর্তির অনুষ্ঠানে যেভাবে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় সেভাবে বাজানো হারাম।[৫৬৭]

আয়াতুল্লাহ সাফী গুলপাইগানী ও আয়াতুল্লাহ বাহজাতের মতে সকল অবস্থায় সমস্যা আছে।[৫৬৮]

ব্যাখ্যা : আয়াতুল্লাহ সাফী গুলপাইগানী এবং আয়াতুল্লাহ বাহজাত ছাড়া সকল মারজার মতে বাদ্য বাজানো- আনন্দের অনুষ্ঠানে এবং শোকের অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি আমোদ- প্রমোদের জন্য হয় তাহলে হারাম আর যদি আমোদ- প্রমোদের জন্য না হয় তাহলে কোন সমস্যা নেই।

৭৭ নং প্রশ্ন : শোক এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে তবলা, করতাল বাজানোর হুকুম কী?

উত্তর : আয়াতুল্লাহ সাফী গুলপাইগানী ও আয়াতুল্লাহ বাহজাত ছাড়া সকল মারজার মতে, যদি সাধারণভাবে ও আমোদ- প্রমোদের উদ্দেশ্য ছাড়াই বাজানো হয় তাহলে কোন সমস্যা নেই।[৫৬৯]

কামাযানি (কিরিচ দিয়ে নিজেকে রক্তাক্ত করে মাতম করা)

৭৮ নং প্রশ্ন : কামাযানি (কিরিচ দিয়ে নিজের মাথা ও পিঠ রক্তাক্ত করা) কি জায়েয?

উত্তর : আয়াতুল্লাহ খোমেইনী, আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী, আয়াতুল্লাহ ফাজেল লানকারানীর মতে, বর্তমান সময়ে এর কোন গ্রহণযোগ্যতা এবং যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যাখ্যা না থাকায় মাযহাব সমালোচনা ও নিন্দার সম্মুখীন হয়। অবশ্যই এ ধরনের কাজ বর্জনীয়।[৫৭০]

আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজীর মতে, আহলে বাইতের জন্য শোক পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কাজ এবং শীয়া মাযহাবকে জীবিত রাখার চাবিকাঠি। কিন্তু শোক পালনকারীদের জন্য জরুরি হচ্ছে যে সকল কাজ মাযহাবের জন্য অবমাননাকর এবং নিজের শরীরের জন্য ক্ষতিকর তা বর্জন করা।[৫৭১]

আয়াতুল্লাহ নূরী হামাদানীর মতে, কামাযানিতে শরীয়তের দৃষ্টিতে সমস্যা আছে।[৫৭২]

আয়াতুল্লাহ জাওয়াদ তাবরিযির মতে, আহলে বাইতের (আ.) জন্য শোক পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কাজ এবং শিয়া মাযহাবকে জীবিত রাখার চাবিকাঠি। কিন্তু শোক পালনকারীদের জন্য

জরুরি হচ্ছে যে সকল কাজ মাযহাবের জন্য অবমাননাকর এবং ইসলাম ও আহলে বাইতের শত্রুরা সেটাকে অপব্যবহার করে তা বর্জন করবে।[৫৭৩]

আয়াতুল্লাহ সাফী গুলপাইগানীর মতে, যদি শরীরের জন্য বিশেষ কোন ক্ষতির কারণ না হয় তাহলে কোন সমস্যা নেই।[৫৭৪]

৭৯ নং প্রশ্ন : লুক্কায়িত ভাবে কামাযানি (চাকু মারা) কি জায়েয? যদি এ ব্যাপারে কেউ নজর (মানত) করে থাকে তাহলে তার দায়িত্ব কী?

উত্তর : আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর মতে, সামাজিক দৃষ্টিতে (সভ্য সমাজের) কামাযানি দুঃখগুবেদনা প্রকাশের শামিল হবে না। ইমামদের এবং তার পরবর্তী যুগে এর কোন নজির ছিল না ও এ কাজে তাঁদের কোন সমর্থন নেই। বর্তমান সময়ে তা মাযহাবের জন্য অপমান ও বদনামের কারণ হয়েছে। তাই কোন অবস্থায়ই এটা জায়েয নয়। যদি কেউ এ ধরনের কাজের জন্য মানত করে তবে তা সঠিক বলে গণ্য হবে না এবং তা আঞ্জাম দেওয়ারও প্রয়োজন নেই।[৫৭৫]

জিঞ্জির মারা

৮০ নং প্রশ্ন : কিছু কিছু মুসলমান নিজের শরীরে জিঞ্জির মেরে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য মাতম করে। এর হুকুম কী?

উত্তর : আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর মতে, যদি তা সাধারণভাবে প্রচলিত পন্থায় (যাতে ক্ষতিকর কিছু করা হয় না) হয়ে থাকে এবং সামাজিক দৃষ্টিতে শোক প্রকাশের শামিল হয় তাহলে কোন সমস্যা নেই।[৫৭৬]

৮১ নং প্রশ্ন : যে সকল জিঞ্জিরের মাথায় ব্লেড আছে তা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে হুকুম কী?

উত্তর : আয়াতুল্লাহ খোমেইনী, আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী, আয়াতুল্লাহ জাওয়াদ তাবরিযি, আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজী, আয়াতুল্লাহ ফাজেল লানকারানীর মতে, যদি এ ধরনের জিঞ্জির ব্যবহার করার

কারণে জনগণের কাছে মাযহাব অপমানের শিকার হয় অথবা শরীরের জন্য বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়, তাহলে তা জায়েয নয়।[৫৭৭] আয়াতুল্লাহ সাফী গুলপাইগানীর মতে, যদি শরীরের জন্য বিশেষ কোন ক্ষতির কারণ না হয়, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোকের অনুষ্ঠানের জন্য তা করায় কোন সমস্যা নেই।[৫৭৮]

আয়াতুল্লাহ নূরী হামাদানীর মতে, শীয়াদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত পন্থায় ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোক পালনে কোন সমস্যা নেই।[৫৭৯]

মাতম করা (বুক চাপড়ানো)

৮২ নং প্রশ্ন : শোক পালনের সময় (কোন নারী উপস্থিত না থাকলে) পুরুষদের শরীরের ঊর্ধ্বাংশের কাপড় খুলে ফেলার হুকুম কী?

উত্তর : অধিকাংশ মারজার মতে কোন সমস্যা নেই। যদি না ফ্যাসাদের (গুনাহয় পড়ার) কারণ হয়। আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজীর মতে, এহতিয়াতে ওয়াজিব হচ্ছে জায়েয নয়।[৫৮০]

৮৩ নং প্রশ্ন : ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোকের অনুষ্ঠানে মহিলাদের সামনে পুরুষদের শরীরের ঊর্ধ্বাংশের কাপড় খোলা কি জায়েয?

উত্তর : আয়াতুল্লাহ খোমেইনী, আয়াতুল্লাহ ফাজেল লানকারানীর মতে, যদি অনাচার ও ফ্যাসাদের (গুনাহয় পড়ার) কারণ না হয় তাহলে সমস্যা নেই। কিন্তু মহিলাদের ওপর ওয়াজিব হচ্ছে, না- মাহরামের দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থাকা।[৫৮১]

আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজীর মতে, এহতিয়াতে ওয়াজিব হচ্ছে, পুরুষদের এ কাজ থেকে বিরত থাকা।[৫৮২]

আয়াতুল্লাহ জাওয়াদ তাবরিযির মতে, সমস্যা নেই।[৫৮৩]

আয়াতুল্লাহ সাফী গুলপাইগানীর মতে, যদি না-মাহরাম মহিলাদের দৃষ্টিতে না পড়ে তাহলে সমস্যা নেই।[৫৮৪]

আয়াতুল্লাহ বাহজাতের মতে, এহতিয়াতে ওয়াজিব হচ্ছে শরীরকে না-মাহরামের দৃষ্টি থেকে ঢেকে রাখা।[৫৮৫]

শোক পালনের সময় লাফিয়ে বুক চাপড়ানো

৮৪ নং প্রশ্ন : শোক পালন অথবা মাতমের সময় লাফিয়ে বুক চাপড়ানোর হুকুম কী?

উত্তর : আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর মতে, ঈমানদারদের জন্য উত্তম হচ্ছে, যে সকল কাজ ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শোকানুষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্য রাখে না তা বর্জন করা। ওপরে উল্লিখিত কাজ যদি শোক অনুষ্ঠানের প্রতি অবমাননার কারণ না হয় তাহলে কোন সমস্যা নেই।[৫৮৬]

মর্সিয়া পাঠ

৮৫ নং প্রশ্ন : কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলা মর্সিয়া পাঠকারী তাদের নারীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত মজলিসে এমনভাবে মর্সিয়া পাঠ করে যাতে পুরুষের কানে ঐ শব্দ পৌঁছায়। এ কাজ কি জায়েয?

উত্তর : আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজী ছাড়া সকল মারজার ঐকমত্য হচ্ছে, যদি মহিলাদের ঐ শব্দ পুরুষদের মধ্যে উত্তেজনার ভাব সৃষ্টি করে তাহলে জায়েয নয়।[৫৮৭]

আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজীর মতে, যদি পুরুষের কানে ঐ শব্দ পৌঁছায় তাহলে জায়েয নয়।[৫৮৮]

শোক পালন ও নামায

৮৬ নং প্রশ্ন : যদি শোকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করায় কিছু কিছু ওয়াজিব কাজ কাযা হয় (যেমন ফজরের নামায কাযা হয়) তার জন্য কি ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করা উত্তম, এমনকি যদি ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করার কারণে আহলে বাইত থেকে দূরে সরে যায়?

উত্তর : এটা সুস্পষ্ট যে, নামায হচ্ছে ওয়াজিব এবং আহলে বাইতের শোকের অনুষ্ঠানের ফজিলতের ওপর তা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অজুহাতে নামায ত্যাগ বা নামায কাযা জায়েয নয়। কিন্তু যদি এমন ভাবে শোকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় যে নামাযের জন্য কোন সমস্যা হবে না, তবে এটা মুস্তাহাবে মুয়াক্কাদাহ্ (তাকিদপূর্ণ মুস্তাহাব)।

৮৭ নং প্রশ্ন : নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে জামায়াতে নামায পড়া উত্তম নাকি ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোক অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখা?

উত্তর : সকল মারজাই একমত যে, জামায়াতে নামায পড়ার গুরুত্ব আগে। ঠিক যেমনভাবে ইমাম হোসাইন (আ.) আশুরার দিনে ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে যোহরের নামায পড়েছিলেন। এদিক থেকে আহলে বাইতের অনুসারিগণ যেন সব সময় চেষ্টা করে যতদূর সম্ভব নামাযের সময় শুরু হওয়ার সাথে সাথেই জামায়াতের সাথে নামায পড়ার। কেননা, আহলে বাইতের সকল ইমাম (আ.) এবং তাঁদের সন্তান ও সাহাবীদের শাহাদাতের লক্ষ্যই ছিল দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। আর দ্বীনের শীর্ষে রয়েছে আল্লাহর মারেফাত ও নামায।[৫৮৯]

৮৮ নং প্রশ্ন : মসজিদ ও ইমামবাড়ির বিল্ডিং থেকে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে কোরআন তেলাওয়াত ও শোক অনুষ্ঠান প্রচার হয়। এ কাজে প্রতিবেশীদের শান্তি বিনষ্ট হয়, কিন্তু কর্তৃপক্ষ ও ইমামবাড়ির বক্তাদের তাগিদ হচ্ছে এটাকে অব্যাহত রাখতে হবে। এর বিধান কী?

উত্তর : মারজারা এ বিষয়ে একমত যে, যদিও বিভিন্ন উপলক্ষে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে উত্তম ও মুস্তাহাব কাজ, কিন্তু শোকানুষ্ঠান আয়োজনকারীদের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে যতদূর সম্ভব প্রতিবেশীদেরকে বিরক্ত করা থেকে বিরত থাকা।[৫৯০]

আশুরার দিনে মানত করা

৮৯ নং প্রশ্ন : কেউ যদি মানত করে যে, আশুরার দিনে মানুষের মধ্যে হালিম বিতরণ করবে। সে কি পারবে ঐ খাবারের পরিবর্তে অন্য খাবার দিতে? অথবা মুহররম মাসের অন্য কোন দিনে তা বিতরণ করতে?

উত্তর : সকল মারজার মতে, যদি নযর শরীয়তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী (যে বিশেষ বাক্যে মানত ফরয হয়ে থাকে, যেমন আল্লাহর নামে আমার জন্য ওয়াজিব করলাম যে, এ কাজটি মানত হিসেবে করব) হয়ে থাকে ঠিক যেভাবে নজর করেছে সেভাবে পালন করবে, আর যদি সঠিক পদ্ধতি মতো না হয়ে থাকে তাহলে তার স্বাধীনতা আছে।[৫৯১]

মুহররম মাসে সাজ- গোজ করা

৯০ নং প্রশ্ন : মুহররম মাসে চেইন পড়া, চুলে রং করা, মহিলাদের সাজ- গোজ করায় কি সমস্যা আছে?

উত্তর : সকল মারজাই একমত যে, যদি পাপাচার ও ইমাম হোসাইন (আ.)- এর প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের শামিল না হয় তাহলে সমস্যা নেই। কিন্তু মুসলমানদের জন্য উত্তম হচ্ছে যে, এ ধরনের সাজ অন্য মাসে বা আনন্দ উৎসবের দিনে করা। কেননা, ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : 'আল্লাহ আমাদের অনুসারীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। তারা আমাদের আনন্দে আনন্দিত হয় এবং আমাদের দুঃখে দুঃখিত হয়।' এটা স্পষ্ট যে, মুহররম মাসের দিনগুলো আল্লাহর রাসূল (সা.) ও ইমামদের জন্য দুঃখগুবেদনার দিন।

মুহররম মাসে বিয়ে

৯১ নং প্রশ্ন : মুহররম মাসে বিয়ে করা, আংটি পড়ানো, মেয়ে দেখা ও বিয়ের প্রস্তাবের অনুষ্ঠান করা কি হারাম?

উত্তর : সকল মারজার মতে, যদি এরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মর্যাদার হানি না ঘটায় এবং পাপের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কিছু তাতে না ঘটে তবে সমস্যা নেই। কিন্তু এ মাসে এরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজনে কোন বরকত নেই। ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন মুসলমানদের উচিত মুহররম ভিন্ন অন্য কোন মাসে উপযুক্ত সময়ে এরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

তথ্যসূত্র:

১. এ ছকটি রেসালাতুল হোসাইন (আ:) পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত আহমাদ কাজী লিখিত "আল বুদুজ্জামানী ফিস সাওরাতিল হোসাইনিয়া" নামক প্রবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে।

২. আল-ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮০; ইবনে আব্দুল বার বলেন, ইসলামের ইতিহাসে একজন মানুষের মাথা কেটে অন্য স্থানে প্রেরণের ঘটনা মুয়াবিয়ার দ্বারা সংঘটিত হয় যখন সে সাহাবী আমর ইবনে হামেকের মাথা কেটে তার কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪।-সম্পাদক

৩. ইবনে কুতাইবা দিনওয়ারী, আল-ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮০ ।

৪. মাওসুআতু কালিমাতি ইমাম হোসাইন (আ.), পৃ. ২৩৯।

৫. আল-ইরশাদ, শেখ মুফিদ, পৃ. ৩৫৫।

৬. মুয়াবিয়ার মনোনীত শাসক ও সেনাপতিরা কোনপ্রকার অন্যায় ও হত্যা করতে দ্বিধা করত না। তার গভর্নর বুশর ইবনে আরতাত ইয়েমেনে প্রবেশ করে অসংখ্য মুসলমান নারীকে বন্দি করে বাজারে বিক্রি করে (আল ইসতিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪০, সংখ্যা ১৭৫) এবং একযুদ্ধে শিশু-বৃদ্ধসহ ত্রিশ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে (আলগারাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৯)। মুয়াবিয়ার মনোনীত গভর্নরদের দ্বারা সংঘটিত হত্যা, নির্যাতন ও নিপীড়নের বীভৎস ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য: তারিখে তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৭-৮১, কামিল ফিত তারিখ, ইবনে আছির, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬২-১৬৭ ও ৪৫০, তারিখে ইবনে আসাকির, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২২ ও ৪৫৯; আলইসতিয়াব, পৃ. ৬৫-৬৬; তারিখে ইবনে কাসির, ৭ম খণ্ড, ৩১৯-৩২২; ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৬।-সম্পাদক

৭. নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ১২৬।

৮. তারীখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০২।

৯. আবুল ফারাজ ইসফাহানী, মাকাতিলুত তালিবীয়ীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০। যেমন সে ইমাম হাসানকে একটি পত্রে লিখে : ...তুমি অবশ্যই জান যে, আমি দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব করছি। এ ক্ষেত্রে তোমার থেকে আমি অভিজ্ঞ এবং বয়সেও তোমার চেয়ে বড়।... তাই আমার আনুগত্যের ছায়ায় প্রবেশ কর।

১০. মাকাতিলুত তালিবীয়ীন, পৃ. ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০; আল-ইরশাদ, পৃ. ৩৫৭।

১১. মাওসুআতু কালিমাতিল ইমাম হোসাইন (আ.), পৃ. ২০৯ ও ২১০।

১২. আল-আখবারুত তোয়াল, পৃ. ২২৭; তাজারিবুল উমাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯।

১৩. তারীখে ইবনে আসাকির, তারজুমাতুল ইমাম হোসাইন (আ.), পৃ. ৭, পাদটীকা ৫।

১৪. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪ তম খণ্ড, পৃ. ২১২।

১৫. তারীখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৮; আল- ইমামাত ওয়াস সিয়াসাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬।

১৬. তারীখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৮।

১৭. প্রাগুক্ত।

১৮. আল- ইমামাত ওয়াস সিয়াসাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১- ১৬৪।

১৯. তারীখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮১।

২০. মুরুজুয যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫।

২১. তারীখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬২।

২২. আল- কামিল ফিত্ তারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৩।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৩- ৫৭৯।

২৪. তারীখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৪ ও ৪০৫।

২৫. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ২১১।

২৬. ওয়াকাআতুত তাফ, পৃ. ৭৫।

২৭. ইবনে আ'ছাম, আল- ফুতুহ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২; ওয়াকাআতুত তাফ, পৃ. ৮১।

২৮. ওয়াকাআতুত তাফ, পৃ. ৭৭।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫ ও ৮৬।

৩০. সূরা কাছাছ ২১।

৩১. ওয়াকাআতুত তাফ, পৃ.১০৩- ১০৭।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৭।

৩৪. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ.২৪৬, কিতাবে হাজ, বাব নং ৭, আবওয়াবুল উমরাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩।

৩৫. ইবনে কাসীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯।

৩৬. ওয়াকাআতুত তাফ, পৃ. ১৫২।

৩৭. সাইয়্যেদ ইবনে তাউস, লুহুফ, পৃ. ৮২।

৩৮. লুহুফের এ অংশে ভুল করে উমর বিন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে তাদের সেনাপতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অন্য অংশে সঠিক করে আমর বিন সাঈদ বিন আসকে তাদের সেনাপতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৯. ইবনে আসির, আল কামিল ফিত তারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৬।

৪০. ইবনে আ 'ছাম কুফী, আল ফুতুহ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৭।

৪১. আল ফুতুহ, পৃ. ৬৬।

৪২. আল- বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৬২।

৪৩. প্রাগুক্ত।

৪৪. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪।

৪৫. মুকাদ্দামে ইবনে খালদুন, পৃ. ২১১।

৪৬. ইবনে আসির, আল- কামিল ফিত্ তারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৫।

৪৭. উসূলে কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮- ৩৬।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮, টীকা ১।

৪৯. লুহুফ, পৃ. ৮৪।

৫০. এ মতবাদের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা এবং এর প্রতি বিশ্বাসীদের সম্পর্কে জানার জন্য পড়ুন : মুহাম্মাদ সিহহাতী সারদরুদী লিখিত 'শাহীদে ফাতেহ দার অঙ্গনেয়ে আনদীশে' , পৃ. ২০৫- ২৩১।

৫১. শাহীদে ফাতেহ, পৃ. ২৩৯।

৫২. তারীখে তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪০৩।

৫৩. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ.৩২৯; ইবনে আ' সাম, আল- ফুতুহ, ৫ম খণ্ড,
পৃ. ২১।

৫৪. শাহীদে ফাতেহ, পৃ. ১৬৯।

৫৫. শাহীদে ফাতেহ, পৃ. ১৭০, উদ্ধৃতি তানজিহুল আমবিয়া, পৃ. ১৭৫।

৫৬. বিরোধিতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়-ন : শাহীদে ফাতেহ, পৃ. ১৮৪- ১৯০ এবং ২০৫- ২৩১।

৫৭. বিরোধিতা এবং পাল্টা জবাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন : রাসূল জাফারিয়ান লিখিত 'ইরানের ধর্মীয় রাজনৈতিক দল ও উপদলসমূহ', পৃ. ২০৮- ২১৪।

৫৮. সাহিফায়ে নূর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪।

৫৯. প্রাগুক্ত, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ১৩০।

৬০. সাহিফায়ে নূর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০।

৬১. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ৩২৯।

৬২. এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কুফাবাসীরা যদিও ইয়াযীদকে খলিফা হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি ও ইমাম হোসাইনকে কুফায় এস নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু তারা ইমাম হোসাইনকে কখনই খেলাফতের প্রকৃত হকদার হিসাবে মনে করে তা করে নি। বরং তাদের প্রায় সকলেই বনি উমাইয়ার শাসনে অতীষ্ঠ হয়ে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে ইমাম হোসেনের- যার সমাজে রাসূলের নাতি হিসাবে জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধি রয়েছে- সহযোগিতা চেয়েছে। - সম্পাদক

৬৩. ওয়াকাআতুত তাফ, আবু মিখনাফ, পৃ. ৯২।

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

৬৫. প্রাগুক্ত।

৬৬. প্রাগুক্ত।

৬৭. তারীখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৫ ও ২১৬।

৬৮. মুরুজুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৪। ইমাম হোসাইনের কাছে পত্র প্রেরণকারীদের মধ্যে অতি নগণ্যই শিয়া ছিলেন। পূর্বেও কুফায় হযরত আলীর ভক্ত সমর্থকদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। বরং বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ও গোত্রপতিদের মধ্যে তার বিরোধীদের সংখ্যা বন্ধুদের তুলনায় বেশী ছিল, আর সাধারণ মানুষরা তাদের নেতাদের মত অনুযায়ী চলতো। একারণেই হযরত আলী যখন কুফায় প্রবেশের পর যখন রাসূলের সুন্নাতের বিপরীতে তারাবীহর নামাজ জামাআতের সাথে পড়ার কাজে বাধা দেন, জনতার পক্ষ থেকে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হন। (ইবনে আবিল হাদীদ, শারহে নাহজুল বালাগা, ১২তম খণ্ড, পৃ. ২৮৩) তিনি পূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক মনোনীত কাজী ও বিচারক শুরাইহকে অপসারণ করার পদক্ষেপ নিলে কুফার জনগণ তার তীব্র প্রতিবাদ করে এবং হযরত আলী বাধ্য হয়ে তাকে তার পদে বহাল রাখেন। - সম্পাদক

৬৯. ওয়াকাআতুত তাফ, পৃ. ১০১।

৭০. ওয়াকাআতুত তাফ, পৃ. ১১২।

৭১. আল- ইরশাদ, পৃ. ৪১৮।

৭২. দিনওয়ারী, আল- আখবারুত্ তোওয়াল, পৃ. ২০৩।

৭৩. ইবনে কাসীর, আল- বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩।

৭৪. তারীখে তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৬, ৩৫৭; আল- কামিল ফিত্ তারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৫।

৭৫. ইবনে মাসকাভেই, তাজারিবুল উমাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২; আল- বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫২।

৭৬. সিবতে ইবনে জাওযী, তাজকিরাতুল খাওয়াস, পৃ. ১৩৮।

৭৭. আল- কামিল ফিত্ তারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৭।

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫।

৭৯. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫১।

৮০. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : আল- গারাত।

৮১. আল- কামিল ফিত্ তারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩১।

৮২. ওয়াকাআতুত্ তাফ, পৃ. ৯২।

৮৩. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪।

৮৪. ওয়াকাআতুত্ তাফ, পৃ. ৯০- ৯১।

৮৫. তারীখে তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২।

৮৬. প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪২৫।

৮৭. প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪২৫।

৮৮. প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪১২।

৮৯. ওয়াকাআতুত্ তাফ, পৃ. ৯৩- ৯৫।

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

৯১. তারীখে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০৬।

৯২. আবদুর রাজ্জাক মুকাররাম, মাকতালুল হোসাইন (আ.), পৃ. ১৮৯। তবে এ লোকেরা কেবল রাসূল (সা.) এর দৌহিত্র হিসাবেই তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। কখনই তাদের মনে তাঁর প্রতি ঐ ভালবাসা ছিল না যা মানুষকে কারো অনুসরণে ও তার জন্য আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। অথচ ইসলাম ও ইসলামের নেতার জন্য দরকার এমন প্রাণোৎসর্গী কর্মী যে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিষয়ে সম্যক অবগত এবং তার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। কিন্তু কুফার জনগণ ইমাম হোসাইনকে কখনই ইসলামের সেই নেতা বলে মনে করত না যার আনুগত্য ওয়াজিব। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ইমাম হোসেনের অনুসারী ছিল না।- সম্পাদক

৯৩. ইতিহাসে এদের সংখ্যা কখনই কম ছিল না। বরং কুফার বড় কয়েকটি গোত্র তাদের অধীনে ছিল। কারবালার রণক্ষেত্রে উপস্থিত জনগণের বড় অংশটি এরাই ছিল। এরা হযরত আলী ও ইমাম হোসাইনের প্রতি চরম বিদ্বেষী ছিল, যদিও কুফার পরিস্থিতি প্রথমে তাদের মুসলিম ইবনে আকিলের পক্ষ নিতে বাধ্য করে। কিন্তু

অচিরেই তারা তাদের প্রকৃত চেহারায় আবির্ভূত হয়। আশুরার দিন এরাই ইমাম হোসাইনকে উদ্দেশ্য করে বলছিল : হে হোসাইন! হে মিথ্যুকের পুত্র মিথ্যুক। (আল কামিল, ইবনে আছির, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৭) এদেরই একদল ইমাম হোসাইনের এ প্রশ্নের (কেন আমাকে হত্যা করতে চাও?) জবাবে বলে : তোমার পিতার প্রতি শক্রতা ও বিদ্বেষের কারণে তোমাকে হত্যা করতে চাই। (ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দাহ্, কুনদুযি হানাফী, পৃ. ৩৪৬) তারাই ইমাম হোসাইনকে নামাজরত দেখে চীৎকার করে বলছিল : হে হোসাইন নামাজ পড়ে তোমার কী লাভ যখন তোমার নামাজ আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না? (ইবনে কাসির, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫) তারাই ইমামকে তিরস্কার করে বলছিল : হে হোসাইন, জাহান্নামের সুসংবাদ গ্রহণ কর। (আল কামিল, ইবনে আছির, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৬; ইবনে কাসির, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩)। সুতরাং সেদিন কারবালায় বনি উমাইয়ার সমর্থকরাই ইমাম হোসাইনকে হত্যার জন্য একত্রিত হয়েছিল।- সম্পাদক

৯৪. ওয়াকাআতুত্ তাফ, পৃ. ১০৯।

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।

১০০. তারীখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫২।

১০১. প্রাগুক্ত।

১০২. আল হায়াতুল ইজতিমাইয়াহ ওয়াল ইকতিসাদিয়াহ ফিল কুফা, পৃ. ৪৯।

১০৩. প্রাগুক্ত।

১০৪. ওয়াকাআতুত তাফ, পৃ. ১১; তারীখে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.২৬৭।

১০৫. আল- হায়াতুল ইজতিমাইয়াহ ওয়াল ইকতিসাদিয়াহ ফিল কুফা, পৃ. ২১৯।

১০৬. ওয়াকাআতুত তাফ, পৃ. ১২৫; তারীখে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৭।

১০৭. বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ৪।

১০৮. হায়াতুল ইমাম হোসাইন (আ.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৩।

১০৯. বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ৮।

১১০. বালাজুরী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮০।

১১১. বালাজুরী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮০।

১১২. আল- ফুতুহ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯১।

১১৩. ওয়াকাআতুত তাফ, পৃ. ১৫২।

১১৪. তারীখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪; লুহুফ, পৃ. ১০৪; ওয়াকাআতুত তাফ, পৃ. ২০১।

১১৫. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ৩১৭।

১১৬. প্রাগুক্ত।

১১৭. আনসাবুল আশরাফ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯; আল- ইরশাদ, পৃ. ৪৫৩।

১১৮. আবুল ফারাজ ইসফাহানী, মাকাতিলুত তালেবীয়ীন, পৃ. ৮৬, উদ্ধৃতি বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ৫১।

১১৯. বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ৪১ ও ৪২।

১২০. লুহুফ, পৃ. ১২৩ ও ১২৪।

১২১. তুরাইহী, আল মুনতাখাব, পৃ. ৪৩৯

১২২. বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: নেয়ামাতুল্লাহ সাফারী ফুরুশানী লিখিত 'ইযযাত তালাবী দার নেহ্যাতে ইমাম হোসাইন (আ.)' প্রবন্ধ যা 'হুকুমাতে ইসলামী' পত্রিকার ২৬তম সংখ্যায় ৭৯- ১১৬ পৃ. প্রকাশিত হয়েছে।

১২৩. বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ১৪৫।

১২৪. বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ১৪০ (উদ্ধৃতি আমালিয়ে শেখ সাদুক, পৃ. ২৩১)।

১২৫. সাইয়্যেদ ইবনে তাউস, ইকবালুল আমাল, পৃ. ৫৮৮।

১২৬. শহীদ কাজী তাবাতাবায়ী, তাহকীক দারবারেয়ে আওয়ালীন আরবাঈনে হযরত সাইয়্যেদুশ শোহাদা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৪।

১২৭. লুহুফ, পৃ. ২৩২, অবশ্য সুস্পষ্টভাবে ইমাম সাজ্জাদ (আ.)- এর নাম উল্লেখ করেননি।

১২৮. ইকবালুল আ'মাল, পৃ. ৫৮৮।

১২৯. আমিনী মুহাম্মদ আমীন, মাআ রাকবুল হোসাইনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩২৪, উদ্ধৃতি মাকতালুল খাওয়ারেজমী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫।

১৩০. আমিনী মুহাম্মদ আমীন, মাআ রাকবুল হোসাইনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩২৪, ৩২৫, উদ্ধৃতি মাকতালুল খাওয়ারেজমী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫।

১৩১. বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ১৪৫।

১৩২. বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ১৭৮, উদ্ধৃতি কামিলুজ জিয়ারাত, পৃ. ৩৪; কাফী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৮।

১৩৩. বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ১৭৮, মাআ রাকবিল হোসাইনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩২৫- ৩২৮।

১৩৪. বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ১৪৫।

১৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

১৩৬. তাজকেরাতুল খাওয়াস পৃ. ২৫৯; মাআ রাকবিল হোসাইনী, পৃ. ৩২৯।

১৩৭. ইবনে সাদ, তাবাকাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১২।

১৩৮ মাআ রাকবিল হোসাইনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩০- ৩৩১।

১৩৯. মাআ রাকবিল হোসাইনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩১- ৩৩৫।

১৪০. মাআ রাকবিল হোসাইনী, পৃ. ৩৩৪, তাজকেরাতুল খাওয়াস, পৃ. ২৬৫।

১৪১. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২০৫।

১৪২. মাআ রাকবিল হোসাইনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩৭।

১৪৩. আমীন আমেলী, সাইয়্যেদ মুহসিন, লাউয়ায়িজুল আশজান ফি মাকতালিল হোসাইন (আ.), পৃ. ২৫০।

১৪৪. বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ১৪৪।

১৪৫. ওয়াকাআতুত তাফ, পৃ. ১৯৭, তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৯; তারীখে তাবারী, খণ্ড ৫, পৃ. ৪১৮, শেইখ মুফীদ, আল- ইরশাদ, পৃ. ৪৪২।

১৪৬. ওয়াকাআতুত তাফ, পৃ. ১৬৬।

১৪৭. প্রাগুক্ত।

১৪৮. একসীরুল ইবাদাত ফি আসরারিশ শাহাদাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮২।

১৪৯. এখান থেকে এ প্রশ্নের শেষ পর্যন্ত সকল নাম 'তারীখে ইমাম হোসাইন (আ.)' নামক গ্রন্থের খণ্ড ৩, পৃ. ২৪২- ২৫০ হতে উল্লেখ করব। বর্তমানে এ কিতাবের ৫টি খণ্ড শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রকাশনী থেকে ছাপা হয়েছে। এ গ্রন্থে কারবালার ঘটনা থেকে শুরু করে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত ইমাম হোসাইন (আ.) সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

১৫০. তারীখে তাবারী, খণ্ড ৫, পৃ. ৩৯৩।

১৫১. আল মানাকেব, খণ্ড ৪, পৃ. ৯৮।

১৫২. মুসীরুল আহজান, পৃ. ২৭- ২৮।

১৫৩. তাজকেরাতুল খাওয়াস, পৃ. ১৪৩।

১৫৪. বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৪৫, পৃ. ৪।

১৫৫. মুরুজুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭০।

১৫৬. আনসাবুল আশরাফ, খণ্ড ৩, পৃ. ১৮৭; দীনওয়ারী, আল- আখবারুত তোওয়াল, পৃ. ২৫৪; ইবনে আশাম, আল ফুতুহু, খণ্ড ৫, পৃ. ১৮৩; বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ৪; ফাততালে নিশাবুরী, রাওজাতুল ওয়ায়েজীন, পৃ. ১৫৮ ইত্যাদি। শহীদের নাম জানার জন্য দ্রষ্টব্য:

ক. বিহারুল আনওয়ার, ১০১তম খণ্ড, পৃ. ২৬৯- ২৭৪, জিয়ারতে নাহিয়ে মুকাদ্দাসে প্রত্যেকটা শহীদের নাম এসেছে এবং তাদের উপর দুরুদ পাঠ করা হয়েছে।

খ. সামাভী, শেইখ মুহাম্মদ, আবসারুল হোসাইন ফি আনসারিল হোসাইন (আ.) নামক গ্রন্থে ইমাম হোসইন (আ.)- এর ১১৩ জন সাথীর নাম ও জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে।

গ. ফুজায়েল বিন যুবায়ের লিখিত তাসমিয়াতু মান কুতেলা মাআল হোসাইন (আ.) মিন আহলিহি ওয়া আওলাদিহি ওয়া শীআতিহী নামক প্রবন্ধটি যা 'তুরাসুনা' পত্রিকার ২য় সংখ্যায় (১৪০৬ হিজরি) ছাপা হয়েছে।

১৫৭. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ১৬৬- ১৬৭।

১৫৮. মাকাতিলুত তালেবীন, পৃ. ১১৯; শাহীদে জাভীদ, পৃ. ১০৯ হতে সংকলিত।

১৫৯. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ১৬৩- ১৬৫।

১৬০. তারীখে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৯; শাহীদে জাভীদ, পৃ. ১০৯ হতে সংকলিত।

১৬১. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৩; শাহীদে জাভীদ, পৃ. ১০৯ হতে সংকলিত।

১৬২. ওয়াকাআতুত তাফ, ভূমিকা, পৃ. ৩২; তারীখে তাবারী, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৫৪ হতে সংকলিত।

১৬৩. আল কামিল ফিত তারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৯।

১৬৪. ওয়াকাআতুত তাফ, পৃ. ৩৪ ও ৩৫ (ভূমিকা)।

১৬৫. ওয়াকাআতুত তাফ, পৃ. ৩৫; ভূমিকা তারীখে তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪২১ ও ৪২২ হতে সংকলিত।

১৬৬. শাহীদে জাভীদ, পৃ. ১০৯; তারীখে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৪৭ ও তাহজীব তারীখে ইবনে আসাকির, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৮ হতে সংকলিত।

১৬৭. মোল্লা অগা দারবান্দী, ইকসীরুল ইবাদাত ফি আসরারিশ শাহাদাত, খণ্ড ৩, পৃ. ১১০।

১৬৮. মোল্লা অগা দারবান্দী, ইকসীরুল ইবাদাত ফি আসরারিশ শাহাদাত, খণ্ড ৩, পৃ. ১১০।

১৬৯. শাহিদী, সাইয়্যেদ জাফর, জেন্দেগানীয়ে আলী ইবনুল হোসাইন (আ.)।

১৭০. জেন্দেগানীয়ে আলী ইবনুল হোসাইন (আ.), পৃ. ১০ ও ১১।

১৭১. শেখ মুহাম্মাদ হাদী ইউসুফী লিখিত 'হাওলুস সাইয়্যেদা শাহরবানু' নামক প্রবন্ধ যা রিসালাতুল হোসাইন (আ.) পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে (প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, রবিউল আওয়াল, ১৪১২ হিজরি)।

১৭২. বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৪৬, পৃ. ৮- ১৩।

১৭৩. ইফতেখার জাদে, মাহমুদ রেযা, শুউবিয়াহ নাসিওনালিজম ইরান, পৃ. ৩০৫, কতগুলো গ্রন্থ থেকে নামগুলো উল্লেখ করেন, যেমন- বালাজুরী লিখিত আনসাবুল আশরাফ, তাবাকাতে ইবনে সাদ, ইবনে কুতায়বা দিনওয়ারী লিখিত 'আল- মাআরেফ' এবং মুর্বারাদ লিখিত 'আল- কামেল' ইত্যাদি।

১৭৪. শাহিদী, জেন্দেগানীয়ে আলী ইবনুল হোসাইন (আ.), পৃ. ১২

১৭৫. বিহারুল আনওয়ার, ৪৬তম খণ্ড, পৃ. ৯, টীকা ২০।

১৭৬. উসূলে কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৯।

১৭৭. শাহরবানুর ইতিহাস জানার জন্য পড়ুন : শুউবিয়াহ নাসিওনালিজম ইরান, পৃ. ২৮৯- ৩৩৭।

১৭৮. উসূলে কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৯, সাইয়্যেদ জাওয়াদ মুস্তাফাভীর অনুবাদ থেকে উল্লিখিত।

১৭৯. আয়াতুল্লাহ খুয়ী, মুজামু রেজালিল হাদীস, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ১০৬।

১৮০. আয়াতুল্লাহ খুয়ী, মুজামু রেজালিল হাদীস, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ১০৬।

১৮১. তারীখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৩।

১৮২. তারীখে কুম, পৃ. ১৯৫।

১৮৩. উসূলে কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৯।

১৮৪. বিহারুল আনওয়ার, ৪৬তম খণ্ড, পৃ. ৯।

১৮৫. উয়ুনু আখবারির রেযা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮।

১৮৬. আল- ইরশাদ, পৃ. ৪৯২।

১৮৭. জেন্দেগানীয়ে আলী ইবনুল হোসাইন (আ.), পৃ. ১২।

১৮৮. শুউবিয়াহ, পৃ. ৩০৫।

১৮৯. হাউলুস সাইয়েদা শাহরবানু, পৃ. ২৮।

১৯০. শুউবিয়াহ, পৃ. ৩২৪।

১৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪।

১৯২. আল- কামিল ফিত তারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭০।

১৯৩. হাউলুস সাইয়্যেদা শাহরবানু, পৃ. ২৮।

১৯৪. উয়ুনু আখবারির রেযা (আ.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮।

১৯৫. বিহারুল আনওয়ার, ৪৬তম খণ্ড, পৃ. ৮।

১৯৭. শুউবিয়াহ, পৃ. ৩২৬।

১৯৭. এ মাযারটি ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)- এর মাতা শাহরবানু হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন- কারিমীয়ান লিখিত 'বোস্তান ও দানেশনামে ইরান এবং ইসলাম' , শাহরবানু শব্দের বর্ণনায়।

১৯৮. আল- ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮।

১৯৯. সিবত ইবনে জাওযী, তাজকেরাতুল খাওয়াস, পৃ. ২৫৬।

২০০. আল- কামিল ফিত তারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৮।

২০১. প্রাগুক্ত।

২০২. তারীখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪১।

২০৩. লুহুফ, পৃ. ৮২।

২০৪. তাজকেরাতুল খাওয়াস, পৃ. ২৭৫;

وانسيت انفاذ اعوانك الى حرم الله لتقتل الحسين عليه السلام

তুমি কি এ বিষয়টি ভুলে গিয়েছো যে, হোসাইনকে হত্যার জন্য তুমিই কাবাঘরে তোমার সঙ্গীদের পাঠিয়েছিলে।

২০৫. ইবনে আবদে রাব্বিহ, আল ইকদুল ফারীদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩০; সুয়ূতী, তারীখুল খোলাফা, পৃ. ১৬৫।

২০৬. তারীখে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫০; তাজারেবুল উমাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭০।

كتب يزيد الى عبيد الله بن زياد ان اغز ابن الزبير فقال: والله لا اجمعها للفاسق ابدا اقتل ابن. رسول الله و اغزوا ابن زبير

ইতোপূর্বে ইয়াযীদ মুসলিম ইবনে আকিলকে হত্যার জন্যও ইবনে যিয়াদকে নির্দেশ দিয়েছিল। তারীখে ইবনে কাসির, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪; ইবনে জাওযি, আল মুনতাযেম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪২।- সম্পাদক

২০৭. তারীখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৮।

২০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪।

২০৯. বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন- আর রাকবুল হোসাইনী ফিশ শাম ওয়া মিনহু ইলাল মাদীনাতিল মুনাওওয়ারাহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, মাআর রাকবুল হোসাইনি মিনাল মাদীনা ইলাল মাদীনা, খণ্ড ৬, পৃ. ৫৪- ৬১ গ্রন্থ হতে সংকলিত।

২১০. তাজকেরাতুল খাওয়াস, পৃ. ২৯।

২১১. তাজারেবুল উমাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭।

২১২. তারীখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৫; তারীখে ইবনে কাসির, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১৫।

২১৩. ইবনে আবুল হাদীদ, শারহে নাহজুল বালাগা, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ২৮০।

২১৪. মাকতালে খাওয়ারেজমী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮ এবং তাজকেরাতুল খাওয়াস, পৃ. ২৬১।

২১৫. নবী-পরিবারকে ইমাম হোসাইনের কর্তিত মাথাসহ ইয়াযীদের সামনে আনা হলে ইয়াযীদ হযরত যায়নাবকে উদ্দেশ্য করে বলে : 'নিশ্চয় তোমার পিতা ও ভাই আল্লাহর দ্বীন থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।' হযরত যায়নাব জবাবে বলেন : 'বরং তোমার দাদা, পিতা ও তুমিই আল্লাহর দ্বীন, আমার নানা, আমার পিতা ও আমার ভাইয়ের ধর্মের দিকে হেদায়াত পেয়েছ।' তারীখে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৩-সম্পাদক

২১৬. আল-কামেল, ইবনে আছীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৩; তারীখে ইবনে কাসির, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩, তারীখুল ইসলাম, যাহাবী, পৃ. ৩০; ইবনে কাসির ও যাহাবী ইমাম হোসাইনের হত্যার বিষয়টি সরাসরি ইয়াযীদের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। যাহাবি তাঁর 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭) ইয়াযীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন: 'ইয়াযীদ নাসেবী (নবী সা.-এর আহলে বাইতের প্রতি চরম বিদ্বেষী) ছিল, সে কঠোর ও রুক্ষ স্বভাবের, অশ্লীল কাজ করত ও মদ্যপ ছিল, তার হুকুমত হোসাইনের হত্যার মাধ্যমে শুরু হয় ও মদীনার লোকদের হত্যা দিয়ে সমাপ্তি ঘটে।-সম্পাদক।

২১৭. আল-কামেল, ইবনে আছীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০২।

২১৮. মিযানুল হিকমাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮০।

২১৯. গুরারুল হিকাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০০।

২২০. সূরা তওবা, আয়াত ৭১।

২২১. উসূলে কাফী, ৫ম খণ্ড, হাদীস ১, পৃ. ৫৫।

২২২ বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ২।

২২৩ মাকতালে খাওয়ারেজমি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮।

২২৪ প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৫।

২২৫. (সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ) শুধু ক্ষমতাবান ও জ্ঞাত (ইসলামের ও শরীয়তের দৃষ্টিতে সৎকাজ ও অসৎকাজ কোনটি সে সম্পর্কে অবহিত) ব্যক্তিদের ওপর ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য। (ফুরুয়ে কাফী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৯)

২২৬. শারতে ওজুব হলো শরীয়তের বিধানটি ব্যক্তির ওপর অপরিহার্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলো অর্জন করা তার ওপর আবশ্যক নয়, বরং যদি আপনাআপনিই ঐ শর্তগুলো তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাকে তা সম্পাদন করতে হবে। যেমন সম্পদহীন বা স্বল্প সম্পদের ব্যক্তির জন্য হজে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ অর্জন করা বা যাকাত দেয়ার জন্য পরিশ্রম করে সম্পদকে যাকাত অপরিহার্য হওয়ার নিসাব পর্যন্ত পৌঁছানোর কোন দায়িত্ব তার নেই। কোন ব্যক্তির যদি স্বাভাবিকভাবেই ঐ পরিমাণ সম্পদ থাকে তবে হজ বা যাকাত তার

জন্য অপরিহার্য হবে। কিন্তু শারতে ওজুদ হলো যে ফরয দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ব্যক্তিকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে। যেমন, নামাযের জন্য পোশাক ও দেহকে পবিত্র করা।- সম্পাদক

২২৭. ফুরুয়ে কাফী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৫।

২২৮. হামাসেয়ে হোসাইনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৪- ৩১২।

২২৯. ইবনে আবি শাইবা, আল মুসান্নাফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮০; তিরমিজি, সুনানুত তিরমিজি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৫৮, হা. ৩৭৭৫, তিরমিজি হাদীসটি হাসান বলেছেন; হাকিম নিশাবুরী, মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃ.১৯৪, সহীহ সূত্রে বর্ণিত; আহমাদ কেনানী, মিসবাহুয যুজাজাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮১; ইবনে হাব্বান, আসসাহিহ, ১৫খণ্ড, পৃ. ৪২৭; আলবানী, সিলসিলাতু আহাদিসিস সাহিহাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৯; মুসনাদ, আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭২; ইবনে মাজাহ, সুনান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১; তাবারানী, আল মুজামুল কাবির, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩।- সম্পাদক

২৩০. মাকতালে খাওয়ারেজমী, খণ্ড ২, পৃ. ৫৮; তাযকিরাতুল খাওয়াস, পৃ. ২৬১।

২৩১. ইয়াকুবী ও খাওয়ারেজমীর বর্ণনানুযায়ী ইয়াযীদ ওয়ালিদকে সুস্পষ্টভাবে লিখেছিল: যদি হোসাইন ও ইবনে যুবাইর বাইয়াত করতে অস্বীকার করে তবে তাদের শিরো- েদ করে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও।’ তারীখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫; মাকতালে খাওয়ারেজমী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮০)।

২৩২. ইবনে আ’ ছাম, আল ফুতুহ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮।- সম্পাদক

২৩৩. সুমুউল মা’না, পৃ. ১১৩ ও ১১৪; মাকতালুল হোসাঈন খাওয়ারেজমী, পৃ. ১৮৪, অধ্যায় ৯।

২৩৪. একজন বিখ্যাত মুসলিম কবি।- অনুবাদক

২৩৫. তাযকিরাতুল খাওয়াস, পৃ. ২৫২।

২৩৬. তারীখে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬২।

২৩৭. সুমুউল মা’না, পৃ. ১১৮।

২৩৮. আল- আদালাতুল ইজতেমাইয়্যাহ ফিল ইসলাম, পৃ. ১৮০ ও ১৮১।

২৩৯. মা’না, পৃ. ১৮১।

২৪০. আল- ইসলাম ওয়াল ইসতিবদাদুস সিয়াসী, পৃ. ১৮৭ ও ১৮৮।

২৪১. সুমুউল মা’না, পৃ. ২৮। যেমন মুয়াবিয়া শুক্রবারের স্থলে বুধবারে জুমুআর নামায পড়ায়। (মাসউদী, মুরুজুয যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭২); মুয়াবিয়া বলত: আমি হলাম প্রথম সম্রাট। আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া,

৮ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫; আমি নামাজ, রোজা ও যাকাত প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতা গ্রহণ করি নি। তোমাদের ওপর শাসন করার জন্য এসেছি। সুলহে ইমাম হাসান, পৃ ২৮০; ঐতিহাসিক মাদায়েনীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত- সম্পাদক

২৪২. তাযকিরাতুল খাওয়াস, পৃ. ২৮৩।

২৪৩. সূরা তওবা, আয়াত ৫২।

২৪৪. আল- আদল পত্রিকা, সংখ্যা ৯, বর্ষ ২, পৃ. ৬।

২৪৫. দেখুন: তারীখে তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪২৪- ৪২৭।

২৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭।

২৪৭. সূরা জ্বীন, আয়াত : ২৬- ২৭।

২৪৮. রাব্বানী খালখালী, আলী; চেহরেয়ে দেরাখশানে হোসাঈন বিন আলী (আ.), পৃ. ১৩৪- ১৪০।

২৪৯. তারীখে তাবারী, ৪ম খণ্ড, পৃ. ২৯২, আল- হাসান ওয়াল হোসাইন সেবতাই রাসূলিল্লাহ, পৃ. ৯১ ও ৯২।

২৫০. কামকামু যুখার, পৃ. ২১৫; নাজ্মুদ দুরারুস সিমতাইন, পৃ. ২১৫। আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: মাকতালে খারেজমী, অধ্যায় ৮, পৃ. ১৬০, অধ্যায় ৯, পৃ. ১৮৭, অধ্যায় ১০, পৃ. ২১৮, ১৯১, ১৯২; তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১; তারজামে তারিখে ইবনে আছাম, পৃ. ৩৪৬; কামিল ফিত তারিখ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮; কামকাম যুখার, পৃ. ২৬৩- ৩৩৩.।

২৫১. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪।

২৫২. খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, আদমই (পুরুষই) কেবল মৌলিকত্বের অধিকারী আর হাওয়া শুধু অনুসরণকারী। কিন্তু কোরআন এ চিন্তার কঠোর বিরোধী। এ সম্পর্কে ওস্তাদ আয়াতুল্লাহ শহীদ মোতাহহারী বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। দেখুন : হামাসায়ে হোসাইনী, ১ম খণ্ড ।

২৫৩. হামাসায়ে হোসাইনী, ১ম খণ্ড,

২৫৪. শাহিদী, সাইয়্যেদ জাফর, কিয়ামে ইমাম হোসাঈন (আ.) , পৃ. ১৮৫।

২৫৫. আয়াতী, মুহাম্মদ ইবরাহীম, বাররাসীয়ে তারীখে আশুরা, পৃ. ৪৭। সিরিয়ার লোকদের সামনে মুয়াবিয়া হযরত আলীকে বেনামাজী ও রাসূলের শত্রু বলে পরিচিত করিয়েছিল ও তারাও তা বিশ্বাস করে নিয়েছিল। তারীখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪। মুয়াবিয়া শুক্রবারের স্থানে বুধবারে নামাজ পড়ালেও তারা তা সঠিক বলে মেনে নিত। হযরত আলীকে একজন মরুদস্যু হিসাবে চিনত। তারা এমনকি উটের নর ও মাদীর মধ্যেও পার্থক্য করতে পারত না। মাসউদি, মুরুজুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১- ৪২। - সম্পাদক

২৫৬. ইবনে আবীল হাদীদ, শারহে নাহজুল বালাগা, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯।

২৫৭. সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৩।

২৫৮. আখতাব খাওয়ারেজমী, মাকতালুল হোসাইন (আ.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১, আল- লুহুফ, পৃ.৭৪।

২৫৯. জন সালভিন শাপিরো, লিবারিলিজ্ম, পৃ. ১৫৭।

২৬০. জ্যাঁজ্যাক শোয়ালিয়া, পৃ. ১০৪।

২৬১. জিন হ্যাম্পটন, রাজনীতির দর্শন, পৃ. ১০৭।

২৬২. সুরুশ মোহাম্মদ, প্রতিরোধ ও বৈধতা, ত্রৈমাসিক হুকুমতে ইসলামী পত্রিকা, সপ্তম বর্ষ, সংখ্যা ৩, পৃ. ৭৯, ১৩৮১ ফারসি বর্ষ।

২৬৩. রাজনীতির দর্শন, পৃ. ১১৭।

২৬৪. এলেন তুনিয়েটা, গণতন্ত্রের ভিত্তির পর্যালোচনা, পৃ. ৪৩, ৭১।

২৬৫. ফ্রান্টেস নিউম্যান, স্বাধীনতা, ক্ষমতা ও আইন, পৃ. ৩৬৮।

২৬৬. প্রতিরোধ আন্দোলন ও সরকারের বৈধতা, পৃ. ৮১।

২৬৭. রাজনীতির দর্শন, ইমাম খোমেইনী শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা রচিত, পৃ. ১২৭।

২৬৮. প্রতিরোধ আন্দোলন ও সরকারের বৈধতা, পৃ. ৮১।

২৬৯. জ্যাক রুশো জন, সামাজিক চুক্তি।

২৭০. মওসুয়াতুল ফেকহীয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২০।

২৭১. আন্দোলন ও বৈধতা, পৃ. ৮৪।

২৭২. ইমাম খোমেইনী (রহ.) বেলায়েতে ফকীহ্, পৃ. ৩৭।

২৭৩. কুলাইনি, ফুরুয়ে কাফি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১।

২৭৪. সহীহ হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহ থেকে প্রমাণিত যে, হযরত ফাতিমা (আ.) মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আবু বকরের সাথে তাঁর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে কথা বলেন নি। ইবনে সাদ, আত- তাবাকাত, ২য় খণ্ড, ২৫৭; সহীহ বুখারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮২- ৮৪; সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩। এ থেকে প্রমাণিত হয় হযরত ফাতিমা তাঁর হাতে বাইআত করেন নি।- সম্পাদক

২৭৫. মুহাম্মাদ বাকের মাজলিসি, বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ৩২৫।

২৭৬. নাহজুল বালাগা, পত্র ৬২।

২৭৭. মওসুয়াতে কালেমাতে ইমাম হোসাইন, পৃ. ৩১৪।

২৭৮. তারীখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৬।

২৭৯. তাযকিরাতুল ফুকাহা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪১০।

২৮০. নাহজুল বালাগা, পত্র নং ৩৮।

২৮১. আল- জামাল, শেখ মুফিদ, পৃ. ৪২০।

২৮২. মাশরুইয়াত ওয়া মোকাভামাত, পৃ. ১০৬ (ফারসি)

২৮৩. শহীদ বাকের সাদর, মিনহাজুস সালেহীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।

২৮৪. সহিফায়ে ইমাম, ২১তম খণ্ড, পৃ. ৪৩৬।

২৮৫. বাযারগান, মাহদী, আখেরাত ওয়া খোদা হাদাফে বেসাত, পৃ. ৪৩।

২৮৬. ইবনে আছাম কুফি, আল- ফুতুহ, ৫ম খণ্ড, পৃ.২১; খাওয়ারেযমি, মাকতালুল হোসাইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮- ১৮৯; বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ৩২৯।

২৮৭. সাইয়্যেদ জাওয়াদ রুয়ী, ইমাম হোসাইনের দৃষ্টিতে ধর্মীয় শাসন, পৃ. ২৮৮।

২৮৮. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ৩১৫

২৮৯. কাদ্রদানি কারামালেকি, সেক্যুলারিজম দার ইসলাম ওয়া মাসিহিয়াত, পৃ. ৩১৭।

২৯০. ইমাম হোসাইনের বাণীসমগ্র, পৃ, ২৭৮; মাকতালে খাওয়ারেযমি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮২।

২৯১. ঐ, ৩১৫।

২৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭।

২৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭; ইবনে আসাকির, তারীখে দিমাশক, তারজামায়ে ইমাম হোসাইন (ইমাম হোসাইনের জীবনী পর্ব), পৃ. ১৪১, হাদীস ১৭৮- ১৮০।

২৯৪. ইবনে আসির, আল- কামিল ফিততারীখ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৭, খাওয়ারেযমি, মাকতাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫- ১৯৬।

২৯৫. নাহজুল বালাগা, খুতবা ১২৪ (সূত্রভেদে ১২৬ নং খুতবা)।

২৯৬. আবু জাফর তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭১।

২৯৭. সূরা মায়েদা, আয়াত নং ৩২।

২৯৮. আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ম্যাগাজিন, ১৩৭২ ফার্সি সাল, সংখ্যা ২ ও ৩, পৃ. ৩২।

২৯৯. বিস্তারিত তথ্যের জন্য: সিরাতে ইবনে হিশাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫১, ৫২; তাফসিরে মাজমাউল বায়ান, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৮৪৮; সাফিনাতুল বিহার, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৮।

৩০০. জাফর সুবহানী, রাসূল (সা.)- এর ইতিহাসের খণ্ডাংশ, পৃ. ৪৪৩।

৩০১. পূর্বোল্লিখিত প্রমাণ ও গ্রন্থসমূহ।

৩০২. সাহিফায়ে নূর, ২১তম খণ্ড, পৃ. ৮৬।

৩০৩. তাহরিরুল ওয়াসিলাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২; সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৩০৪. ফিকহুল হুদুদ ওয়াত তাযিরাত, আয়াতুল্লাহ মুসাভী আরদেবেলী, পৃ. ৫১১- ৫২১।

৩০৫. যেমন : ফেদাইয়ানে ইসলাম, হাইয়াতে মোতালাফা ইত্যাদি ইসলামী দল।

৩০৬. বিস্তারিত তথ্যের জন্য, সাইয়্যেদ হামিদ রুহানী রচিত ইমাম খোমেইনীর আন্দোলন, মোহাম্মদী মানুচেহের রচিত ইরানী ইসলামী বিপ্লবের পর্যালোচনা, আলী দাওয়ানী, ইরানী আলেমদের আন্দোলন।

৩০৭. মিশেল ফুকো, ইরানীদের মাথায় কী স্বপড়ব রয়েছে।

৩০৮. আবদুল ওয়াহ্হাব ফোরাতি, যিয়াফাতহয়ে নাযারি বার ইনকিলাবে ইসলামী, পৃ. ২৯৭।

৩০৯. প্রাগুক্ত।

৩১০. আশুরার শিক্ষা, পৃ. ১৮৯।

৩১১. ইমাম খোমেইনীর বাণী ও বর্ণনায় আশুরা আন্দোলন, পৃ. ৫৫।

৩১২. কাওয়াকিয়ান মোস্তফা, হাফত কাতরে আয জারিয়ে যুলালে আনদিশেয়ে ইমাম খোমেইনী, পৃ. ২২৯ (ফারসি)।

৩১৩. ২৯- ১০- ১৩৫৭ ফারসি সালে ইরানী জনগণের সর্বোচ্চ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এর ২৩ দিন পর ২২- ১১- ১৩৫৭ ফারসি সালে (১১ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯) ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হয়।

৩১৪. সহিফায়ে (বাণীসমগ্র) ইমাম (খোমেইনী), ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২৯০।

৩১৫. সহিফায়ে ইমাম, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬।

৩১৬. প্রাগুক্ত।

৩১৭. হাফত কাতরে, পৃ. ২৩৫।

৩১৮. সহিফায়ে ইমাম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৫৮।

৩১৯. প্রাগুক্ত, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ২৩০ ও ২৩১।

৩২০. সূরা শুরা, আয়াত ২৩, সূরা হুদ, আয়াত ২৯ এবং মিজানুল হিকমাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৬।

৩২১. আল- মাহাব্বাত ফীল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ১৬৯- ১৭০, ১৮১- ১৮২।

৩২২. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ২৮৭।

৩২৩. আমালী, পৃ. ৩০৫।

৩২৪. মুয়াবিয়া ইবনে ওয়াহহাবকে উদ্দেশ্য করে ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেন : ‘শোক প্রকাশকারীরা যেন শহীদদের নেতা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য আশুরার দিনে পানি পান ও খাদ্য গ্রহণ থেকে ততক্ষণ বিরত

থাকে যতক্ষণ না আসরের নামাযের ফজিলতের সময় থেকে এক ঘণ্টা আতিবাহিত হয়, (এ সময়ের পর) যেন শোকার্ত ব্যক্তির মতো সামান্য খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে।' - তারীখু নিয়াহাতুল ইমামিশ শাহিদ আল-হুসাইন ইবনে আলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫-১৯৫।

৩২৫. আশুরার অভিধান, (فرهنگ عاشورا) পৃ. ২৬৮-৬৭১; হোসাইন, আকলে সোরখ, পৃ. ৭৭-১১৯; ইমাম হাসান ও হোসাইন (আ.), পৃ. ১১৬-১২১।

৩২৬. পবিত্র কোরআনে এরূপ প্রতিবাদ করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সূরা নিসা : ১৪৮, সূরা হজ : ৩৯, সূরা শোয়ারা : ২২৭।- সম্পাদক

৩২৭. পবিত্র কোরআনেও আল্লাহর নবীদের ওপর আপতিত মুসিবত ও মুমিনদের শাহাদাতের কথা বিশেষ আবহে স্মরণ করা হয়েছে যা তাঁদের প্রতি মহান আল্লাহর সহানুভূতি ও শোকপ্রকাশের চিহ্ন। যেমন সূরা বুরুজে মুমিনদের একদলের শহীদ হওয়ার ঘটনাকে আল্লাহ করুণভাবে উপস্থাপন করেছেন যা পাঠে সকল মুমিনের অন্তর শোকে মূহ্যমান হয়। নবীদের জীবনীতেও আমরা এরূপ শোক প্রকাশের নমুনা দেখতে পাই। যেমন হযরত ইয়াকুব হযরত ইউসূফ (আ.)-কে হারিয়ে দীর্ঘদিন এতটা ক্রন্দন করেছিলেন যে, তাঁর চোখ দু'টি সাদা হয়ে গিয়েছিল। অথচ তিনি জানতেন হযরত ইউসূফ বেঁচে আছেন। (সূরা ইউসূফ : ৮৪-৮৭)।- সম্পাদক

৩২৮. বিহারুল আনওয়ার, ৪৩তম খণ্ড, পৃ. ২২২।

৩২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

৩৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২ ও ২৮৯।

৩৩১. তারীখে ইয়াকুবি, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৬, সুয়ূতি, তারীখুল খোলাফা, পৃ, ২০৮, ইবনে আব্বাস সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে : মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩ ও আল-মুসতাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯৭। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল জিবরাইল (আ.) থেকে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের খবর (ভবিষ্যদ্বাণী) শুনে ক্রন্দন করেছেন। দ্রষ্টব্য : মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪ ও ৬৪৮; মুসনাদে আবি ইয়ালা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬, হাদীস ৩৫৮; আল-মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃ, ১৭৬ ও ১৭৯; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃ, ১৭৯; আসসাওয়ায়েকুল মুহরিকা, পৃ. ১১৫, অন্য সংস্করণে পৃ. ১৯৬; ইবনে সাব্বাগ মালেকী, আল-ফুসুলুল মুহিম্মাহ, পৃ. ১৫৪; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৩; নাসায়ী, খাসায়িসুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫; তারীখে ইবনে কাসির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৩০ ও ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯, মাকতালে খাওয়ারেযমি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯ ও ১৬৩; ইবনে আছাম, আল-ফুতুহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৫।- সম্পাদক

৩৩২. ইমাম হাসান এবং হোসাইন (আ.), পৃ. ১৪৫।

৩৩৩. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ১৪৬।

৩৩৪. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১।

৩৩৫. প্রাগুক্ত, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ১৩১।

৩৩৬. মিসবাহুল মুতাহাজ্জেদ, পৃ. ৭১৩।

৩৩৭. ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (আ.), পৃ. ১৪৩।

৩৩৮. হোসাইন, নাফসুন মুতমাইন্নাহ্, পৃ. ৫৬।

৩৩৯. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ২৮৪।

৩৪০. প্রাগুক্ত, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ২৫৮।

৩৪১. প্রাগুক্ত, ১০১তম খণ্ড, পৃ. ৩২০।

৩৪২. কারণ, বনি উমাইয়া, বনি যুবাইর ও বনি আব্বাসের শাসকরা মহানবী (সা.)- এর বংশধরদের ওপর চরম নির্যাতন চালাত এবং তাদের সবধরনের তৎপরতা ও কর্মকা- কে তীক্ষè নজরে রাখত। ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য শোকানুষ্ঠানের আয়োজন একদিকে তাদের অন্যায়- অবিচারকে প্রকাশ, অন্যদিকে আহলে বাইতের অধিকারকে প্রমাণ করত যা তাদের শাসনের জন্য হুমকি বলে বিবেচিত হতো। তাই তারা এধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনে কঠোরভাবে বাধা দিত। কঠোরতার দিক থেকে মুতাওয়াক্কিল সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এমনকি সে ইমাম হোসাইনের মাযারকে মাটিতে মিশিয়ে দেয় ও সেখানে চাষের জন্য নির্দেশ দেয়। (ইবনে আসির, আল- কামিল ফিত তারীখ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৬- ৩৭)। এক্ষেত্রে উমাইয়া খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজীজ ও আব্বাসী খলিফা নাসির বিল্লাহ ও মুনতাসির ব্যতিক্রম ছিলেন।- সম্পাদক

৩৪৩. আল- মুনতাজাম ফি তারিখিল মুলুক ওয়াল উমাম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৫।

৩৪৪. তাকমিলাতু তারিখিত তিব্বি, পৃ. ১৮৩।

৩৪৫. মিরআতুল জিনান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭, উদ্দেশ্য হলো ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্য প্রকাশ্যে শোকপ্রকাশ।

৩৪৬. আন নুজুমুজ যাহিরা ফি মুলুকে মিসরীন ওয়া কাহিরাতেন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৮।

৩৪৭. আলখুতাত, মাকরিজী, ২/২৮৯; আন নুজুমুজ যাহিরা ফি মুলুকে মিসরীন ওয়া কাহিরাতেন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৬ (৩৬৬ হিজরীর ঘটনার অংশে); মাকরিজীর ইত্তিয়াজুল হুনাফা গ্রন্থে, ২য়খণ্ড, পৃ. ৬৭; সিয়াহপুশী দারসুগে আয়েম্মে নূর থেকে বর্ণিত, পৃ. ১৬১- ১৬২।

৩৪৮. মাকালাতে তারিখি, রাসুল জাফারিয়ান, ১মখণ্ড, পৃ. ১৮৩- ১৮৫, ২০১- ২০৬।

৩৪৯. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা বলেন: যখন আল্লাহর রাসূল (সা.) ইন্তেকাল করলেন আমি কিছুসংখ্যক নারীকে সাথে নিয়ে সমবেতভাবে করুণস্বরে ক্রন্দন করছিলাম এবং মাথা ও বুক চাপরাচ্ছিলাম।' (মুসনাদে আহমাদ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৯০, হাদিস ২৫৮১৬; মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৪৫৬৮।- সম্পাদক

৩৫০. মওসুয়াতুল আতাবাতিল মুকাদ্দাসাহ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮।

৩৫১. মুসিকিয়ে মাযহাবীয়ে ইরান, পৃ. ২৬।

৩৫২. ফারহাঙ্গে আশুরা, পৃ. ৩৪৬।

৩৫৩. মহান আল্লাহ বলেন : (হে রাসূল!) তুমি ক্ষমার পথ অবলম্বন কর এবং পছন্দনীয় কর্মের নির্দেশ দাও, আর অজ্ঞদের উপেক্ষা কর। (সূরা আরাফ : ১৯৯) এ আয়াতে রাসূল (সা.)- কে পছন্দনীয় কর্মের নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে। পছন্দনীয় কর্ম বলতে বুদ্ধিবৃত্তি, বিবেক ও শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য প্রচলিত সামাজিক প্রথা, আচরণ ও রীতি- নীতি বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কোরআন আরবে প্রচলিত অনেক কুসংস্কারপূর্ণ, অশালীন, মন্দ ও অনৈতিক কাজকে অবৈধ বলে প্রত্যাখ্যান ও তার ধ্বংসে পদক্ষেপ নিলেও অনেক প্রচলিত আচার ও রীতিকে ভালো ও পছন্দনীয় বলে সমর্থন দিয়েছে ও মেনে নিয়েছে। যেমন অতিথিপরায়ণতা, নিকটাত্মীয়দের ভালোবাসা, আমানতদারি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করা ইত্যাদি। কখনও কখনও কোরআন প্রচলিত কোন রীতিকে সংস্কার ও পরিশোধিত করে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করেছে। যেমন : মক্কার মুশরিকরা চার মাস যুদ্ধ করাকে নিজেদের মধ্যে হারাম করেছিল, কিন্তু নিজেদের স্বার্থে কখনও কখনও তা পরিবর্তন করে এগিয়ে আনত বা পিছিয়ে দিত। আল্লাহ এর মূল বিষয়টি অর্থাৎ চার মাস যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়াকে ইসলামেও ফরয করেছেন ও তা ভঙ্গ করাকে হারাম বলেছেন। কিন্তু তা অগ্র- পশ্চাৎ ও পরিবর্তন করাকে হারাম করেছেন (তওবা : ৩৭)। তেমনি সুদমুক্ত ঋণদান ও ব্যবসায়িক লেনদেনকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রচলিত শালীন পোশাককে গ্রহণ ও অশালীন পোশাককে প্রত্যাখ্যান, বৈধ খাবারগুলোকে খাওয়ার অনুমতি ও শরাব, মদ, নেশাকর দ্রব্য ও অন্যান্য ক্ষতিকর খাদ্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।- সম্পাদক

৩৫৪. ইমাম হোসাইন নাফেস মুতমাইন্নাহ, পৃ. ৫- ১৮।

৩৫৫. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ২২৩, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৮১, ২৮২, ২৮৯, ২৯১, ২৯৩ এবং...।

৩৫৬. শেখ সাদুক, আমালী, পৃ. ৭৭।

৩৫৭. ইয়দ দশতহয়ী দার যামিনে ফারহাঙ্গ ওয়া তারীখ, পৃ. ২৭২- ২৭৩।

৩৫৮. ইবনে আসির, একজন প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ লিখেছেন : আবু মুসলিম খোরাসানী একদিন বক্তব্য রাখার সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিল : 'তোমার নিকটে যে কালো নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি তা কী কারণে ব্যবহার

করছ।’ তখন আবু মুসলিম বলেছিল : ‘আবু জুবায়ের অর্থাৎ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী বর্ণনা করেছেন : ‘রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের সময় কালো পাগড়ি পরেছিলেন। কারণ, এ পোশাক হলো ব্যক্তিত্ব প্রকাশক ও সরকারি পোশাক। (তরজমায়ে আল- কামিল, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১১৪)

৩৫৯. বিহারুল আনওয়ার, ৪৩তম খণ্ড, পৃ. ১৭৪- ১৮০।

৩৬০. সিয়াহপুশী দারসুগে আয়েম্মে নূর থেকে বর্ণিত, পৃ. ৩১- ৫৩।

৩৬১. মুজামুল বুলদান, হামাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫২ ও তারীখে গিলান ও দিলিমেস্তান, পৃ. ২২৩।

৩৬২. বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭১০- ৭২২।

৩৬৩. রাবিউল আবরার ওয়া নুসুসুল আখবার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৭।

৩৬৪. রাবিউল আবরার ওয়া নুসুসুল আখবার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৭।

৩৬৫. আখবারুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়া, পৃ. ২৪৭।

৩৬৬. সিরাতুন নাবাবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০- ১১।

৩৬৭. দেখুন : চতুর্থ হিজরির ইসলামী সভ্যতা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৭।

৩৬৮. শারহে নাহজুল বালাগা, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২২।

৩৬৯. শারহে নাহজুল বালাগা, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭২।

৩৭০. আখবারুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়া, পৃ. ২৩০- ২৩২, ২৪২।

৩৭১. সিয়াহপুশী দারসুগে আয়েম্মে নূর থেকে বর্ণিত, পৃ. ১৯৫- ২০০, ১২৯- ১৫৫, ৭৬ ও ৭৭।

৩৭২. পিরামুনে আজাদারি আশুরা, আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেয়ীর আশুরা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর বক্তব্যের সংকলন।

৩৭৩. সূরা আনআম, আয়াত ১৬২।

৩৭৪. শাহাদাতের লগেড়ব যখন ইমাম হোসাইনের শির বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছিল তখন তিনি আল্লাহর সঙ্গে মোনাজাতে বলছিলেন : ‘হে ইলাহ্! আমি আপনার সন্তুষ্টিতেই সন্তুষ্ট এবং আপনার নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পিত। (কারণ) আপনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আপনি ছাড়া আমার কেউ নেই, যার কোন সহায় ও সাহায্যকারী নেই, আপনিই তো তার সহায়।’ -হায়াতুল ইমাম হোসাইন (আ.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৪; মুকরিম, মাকতালুল হোসাইন, পৃ. ২৮৩।- সম্পাদক

৩৭৫. আল- আবকারীল হিসান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯; আশকে হোসাইনী সারময়ে শিয়ে, পৃ. ৩৬- ৩৭।

৩৭৬. যিয়ারত বলতে এখানে যিয়ারতনামা বুঝানো হয়েছে যা কোন পবিত্র ও সম্মানীয় ব্যক্তির, বিশেষত মহানবী (সা.) ও তাঁর বংশধর ইমামদের রওযায় গিয়ে পাঠ করা হয়। তবে মূল অর্থে যিয়ারত হলো তাঁদের কবরের নিকট সালাম দানের জন্য উপস্থিত হওয়া- যা একটি মুস্তাহাব আমল। এ কারণে আহলে সুন্নাতের

আলেমরাও সমবেতভাবে ও একাকী আল্লাহর ওলীদের যিয়ারতে যেতেন।- ইবনে হাজার আসকালানী, আত-তাহযিবুত তাহযিব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯; ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৭। রাসূল (সা.)-এর সাহাবারা তাঁর রওযা যিয়ারতে যেতেন। দ্রষ্টব্য: যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮; ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২১৪; আল-মুগনি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৬; শারহে মুয়াত্তায়ে মালিক, লাখনাভী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৮; উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৮; তারীখে দিমাশক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭; নাইলিল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮০।- সম্পাদক

৩৭৭. মহান আল্লাহ মুমিনদের ওপর মহানবী (সা.)-এর রক্তসম্পর্কীয় বংশধরদের প্রতি ভালোবাসাকে ফরয করেছেন এবং এ কর্মকে পুণ্যকর্ম বলে অভিহিত করেছেন। (সূরা শুরা : ২৩) তাই যিয়ারতের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ আল্লাহর নৈকট্যের কারণ।- সম্পাদক

৩৭৮. কেউ মহান আল্লাহর সাহায্যকারী হতে হলে অবশ্যই প্রথমে তাকে তাঁর নবী ও তাঁর উত্তরাধিকারী নেতাদের সাহায্যকারী ও সঙ্গী হতে হবে। যেমনভাবে ঈসা (আ.) বলেছেন : 'কে আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী হবে?' (সূরা ছফ : ১৪) অর্থাৎ ঈসা (আ.)-এর সাহায্যকারী হওয়ার মাধ্যমেই কেবল কেউ আল্লাহর সাহায্যকারী হতে পারে। তাই তাঁর পছন্দনীয় ও মনোনীত ব্যক্তিদের সঙ্গী হয়েই তাঁর পথের সৈনিক হওয়া সম্ভব। এধরনের ব্যক্তিদেরই তিনি পবিত্র কোরআনে 'সাদিকীন' বলে অভিহিত করে মুমিনদেরকে সবসময় তাঁদের সাথে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা তাওবা : ১১৯) যিয়ারতের এ অংশটি এ নির্দেশেরই বাস্তবায়ন।- সম্পাদক

৩৭৯. সূরা ফাতির : ৬।

৩৮০. সূরা মুমতাহিনা : ৪।

৩৮১. সূরা ফাতহ্ : ২৯।

৩৮২. প্রাগুক্ত।

৩৮৩. ইবনে ইমাদ হাম্বালী কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা বর্ণনার পর বলেন : 'আল্লাহ্ তাদের হত্যা করুন যারা এ কাজ (হোসাইনকে হত্যা ও তাঁর পরিবারবর্গকে বন্দি) করেছে এবং তাঁদের সাথে অবমাননাকর আচরণ করেছে; আর তাকেও হত্যা করুন যে এ নির্দেশ দিয়েছে ও যারা এ অন্যায় কর্মে সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে।' (শাজারাতুয যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১-৬৬)- সম্পাদক

৩৮৪. মাওলানা রুমি, মাসনাবী, ৩য় খণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

৩৮৫. নাহজুল বালাগা : খুতবা : ১৮৬, পৃ. ১৮৫।

৩৮৬. মাওলানা রুমি, মাসনাবী, ১ম খণ্ড, ২য় অধ্যায়।

৩৮৭. আল- মিসবাহ (জান্নাতুল আমানাল ওয়াকিয়া ওয়া জান্নাতুল ঈমানুল বাকিয়া) , ইবরাহীম ইবনে আলী কাফ' আমী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৬।

৩৮৮. হাফিজ।

৩৮৯. উসূলে কাফি, ২য় খণ্ড, কিতাবুদ দোয়া, বাবুল বুকা।

৩৯০. দেখুন : দুস্ত শেনাছি ও দুশমন শেনাছি দার কোরআন, ৩য় অধ্যায়।

৩৯১. আবু হামজায়ে ছুমালি, মাফাতিউল জিনানের দোয়া।

৩৯২. উসূলে কাফি, ২য় খণ্ড, কিতাবুদ দোয়া বাবুল বুকা।

৩৯৩. বিহারুল আনওয়ার, ৭৩তম খণ্ড, পৃ. ১৭৬।

৩৯৪. মাওলানা রুমি, মাসনাবী, ২য় খণ্ড, ৩য় আধ্যায়।

৩৯৫. উসূলে কাফি, ২য় খণ্ড, কিতাবুদ দোয়া, বাবুল বুকা।

৩৯৬. মাওলানা রুমি, মাসনাবী, ৩য় খণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

৩৯৭. সূরা ইসরা, আয়াত : ১০৭- ১০৯।

৩৯৮. মাওলানা রুমি, মাসনাবী, ১ম খণ্ড, ২য় আধ্যায়।

৩৯৯. মিজানুল হিকমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫, রেওয়ায়াত : ১৮৪৫।

৪০০. মাওলানা রুমি, মাসনাবী, ৩য় খণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

৪০১. সূরা মারইয়াম : ৫৮।

৪০২. হাফিজ।

৪০৩. সূরা মায়িদা, আয়াত ৮৩।

৪০৪. মাকালাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৯।

৪০৫. মাওলানা রুমি, মাসনাবী, ৩য় খণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

৪০৬. উসূলে কাফী, ২য় খণ্ড, কিতাবুদ দোয়া, বাবুল বুকা।

৪০৭. উসূলে কাফী, ২য় খণ্ড, কিতাবুদ দোয়া, বাবুল বুকা।

৪০৮. মাফাতিহুল জিনান, বিশ্বাসীদের নেতা আলী (আ.)- এর যিয়ারতের পরে পড়ার দোয়া।

৪০৯. আবু হামযা ছুমালি, মাফাতিহুল জিনান- এর দোয়ার অংশ।

৪১০. মিরআতুল উকুল, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৫৬।

৪১১. খাসায়েসুল হোসাইন, পৃ. ১৪০।

৪১২. মুসনাদে ইমাম রেযা (আ.) ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭।

৪১৩. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ২৯১।

৪১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫।

৪১৫. মহান আল্লাহ বলেন : 'এবং যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে সে সেই (প্রিয়) বান্দাদের সাথি হবে নবিগণ, সত্যবাদিগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মপরায়ণদের মধ্য থেকে যাদের আল্লাহ (স্বীয় বিশেষ) নিয়ামত দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন।' (সূরা নিসা : ৬৯) সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের পরম কামনা হওয়া উচিত এই মহান ব্যক্তিদের সাথে সংযুক্ত হওয়া। আর তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে ক্রন্দন করা।- সম্পাদক

৪১৬. খাসায়েসুল হোসাইনীয়া, পৃ. ১৪২: ওসায়েলুশ শিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১২১, ১১২৪।

৪১৭. অয়িনে মেহেরবারজী, আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ অংশে।

৪১৮. মিযানুল হিকমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৫।

৪১৯. বিহারুল আনওয়ার, ৭১তম খণ্ড, পৃ. ২৮১।

৪২০. প্রাগুক্ত, ৭০তম খণ্ড, , পৃ. ৫৫।

৪২১. প্রাগুক্ত, ৭৮তম খণ্ড, পৃ. ৭৩।

৪২২. প্রাগুক্ত, ৭৫তম খণ্ড, পৃ. ৩৭০।

৪২৩. মুসতাদরাকুল ওয়াসায়েল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪১।

৪২৪. তানবিহুল খাওয়াতির, পৃ. ৩৬০।

৪২৫. বিহারুল আনওয়ার, ১ম খণ্ড, পৃ.২০৩ ।

৪২৬. প্রাগুক্ত, ৭৭তম খণ্ড, পৃ. ৪৫।

৪২৭. প্রাগুক্ত, ৭৭তম খণ্ড, পৃ. ৪৫।

৪২৮. প্রাগুক্ত, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৩০৯।

৪২৯. প্রাগুক্ত, ৭৭তম খণ্ড, পৃ. ১৯৯।

৪৩০. প্রাগুক্ত, ৭৮তম খণ্ড, পৃ. ১১৫।

৪৩১. প্রাগুক্ত, ৭৮তম খণ্ড, পৃ. ৩০৮।

৪৩২. মুজামুল আলফাজ গুরারুল হিকাম, পৃ. ৮৬৩।

৪৩৩. বিহারুল আনওয়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৩।

৪৩৪. মিশকাতুল আনওয়ার, পৃ. ১০৭।

৪৩৫. মিশকাতুল আনওয়ার, পৃ. ১০৭।

৪৩৬. নাহজুল বালাগা, খুতবা : ২২২।

৪৩৭. প্রাগুক্ত।

৪৩৮. নাহজুল বালাগা, খুতবা : ১৭৬।

৪৩৯. বিহারুল আনওয়ার, ৯৩তম খণ্ড, পৃ. ২৮৪।

৪৪০. যেমনভাবে মহান আল্লাহ্ গুনাহগার মুমিনদের তাদের গুনাহ ও যুলমের কারণে রাসূল (সা.)- এর শরণাপন্ন হওয়াকে ক্ষমা লাভের উপায় বলেছেন : (হে রাসূল!) যখন তারা (অবাধ্যতা করে) নিজেদের (আত্মার) প্রতি অবিচার করেছিল, যদি তোমার নিকট আসত এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত আর রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত, তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে অতিশয় ক্ষমাশীল, অনন্ত করুণাময় পেত। (সূরা নিসা : ৬৪)- সম্পাদক

৪৪১. মাওলানা রুমি, মাসনাবী, ২য় অধ্যায়, পঙ্ক্তি ২২- ২৩।

৪৪২. তাজাসসোমে আমাল ওয়া শাফায়াত, পৃ. ১০৬- ১১৬।

৪৪৩. বিহারুল আনওয়ার, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৩।

৪৪৪. মাওলানা রুমি, মাসনাবী, ৫ম অধ্যায়, পঙ্ক্তি ২২৬২- ২২৬৭।

৪৪৫. মুনতাখাবুল মিজানুল হিকমা, পৃ. ২৪৯।

৪৪৬. সুতরাং তুমি সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে তোমার মুখ (সমগ্র অস্তিত্ব) সত্যধর্মের প্রতি নিবদ্ধ কর; আল্লাহর সেই প্রকৃতি যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই; এটাই সরল ও প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। (সূরা রোম : ৩০)

৪৪৭. আল্লামা তাবাতাবাঈ, আল- মিজান, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২০৩।

৪৪৮. আনগিজেস্ ও হায়াযান, পৃ. ৩৬৭।

৪৪৯. রাওয়ান শেনোসী শাদী, পৃ. ৪২ ও ১৭২।

৪৫০. যেল্লেহয়ে শাদী দার ফারহাঙ্গ ওয়া শারিয়াত, পৃ. ৪৭।

৪৫১. রাওয়ান শেনাসী শাদী, রাওয়ান শেনাসী কামাল, রযে সদেহ যিস্তি এবং...।

৪৫২. কবি : নাসের খসরু।

৪৫৩. ওয়াসায়েলুশ্ শিয়া, ৪র্থ খণ্ড, বাবে মালাবেস; আমালি, শেখ তূসী, হাদীস নং : ৪৫; বিহারুল আনওয়ার, ৭১তম খণ্ড, পৃ. ৯৫; অয়িনে জেন্দেগী, পৃ. ৩৪।

৪৫৪. কবি : রুদাকি।

৪৫৫. সূরা তাওবা : ৮২।

৪৫৬. গুফতারহা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫- ২৫৬।

৪৫৭. সূরা আরাফ, আয়াত ৩২।

৪৫৮. গুফতারহা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৭- ২২৮।

৪৫৯. তুহাফুল উকুল, হাররানী, পৃ. ৪৯।

৪৬০. গুরারুল হিকাম, হাদীস নং ২০২৩।

৪৬১. বিহারুল আনওয়ার, ৭৮তম খণ্ড, পৃ. ৬৬৩।

৪৬২. উসূলে কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৩।

৪৬৩. বিহারুল আনওয়ার, ৮৫তম খণ্ড, পৃ. ৩২১।

৪৬৪. উসূলে কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২।

৪৬৫. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ১২তম খণ্ড, পৃ. ১২২; বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ১১২।

৪৬৬. কবি : ফেরদৌসি

৪৬৭. আখলাকে ইসলামী, পৃ. ৯৮- ৯৯; আখলাকে ইলাহী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮।

৪৬৮. রাসূল (সা.)- এর একজন সাহাবী তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : 'যদি আমার বন্ধুর সাথে রসিকতা ও হাসি- ঠাট্টা করি, তাহলে কোন অসুবিধা আছে কি?' জবাবে তিনি বলেন : 'যদি কথার মধ্যে কোন অর্থহীন কিছু না থাকে তাহলে সমস্যা নেই।' উসূলে কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৩; তুহাফুল উকুল, পৃ. ৩২৩।

৪৬৯. গুরারুল হিকাম, পৃ. ২২২।

৪৭০. উসূলে কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৫।

৪৭১. আখলাকে ইলাহী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬- ২৫৭।

৪৭২. উসূলে কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৪।

৪৭৩. গুরারুল হিকাম, পৃ. ২২২।

৪৭৪. আখলাকে ইলাহী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮- ২৫৯।

৪৭৫. প্রাগুক্ত।

৪৭৬. উসূলে কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩; ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ২০তম খণ্ড, পৃ. ২১৩।

৪৭৭ কবি : শাবেস্তারী।

৪৭৮. মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী।

৪৭৯. মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী।

৪৮০. মুমিনদের নেতা আলী (আ.) আরেফদের বর্ণনায় বলেছেন : 'দুনিয়া ত্যাগীরা বাহ্যিকভাবে হাসে কিন্তু তাদের অন্তর কাঁদে; যদিও আনন্দিত থাকে কিন্তু অন্তরে দুঃখ ও ব্যথা- বেদনা থাকে।' -নাহজুল বালাগা, খোতবা : ১১৩; শারহে মাকামাতে আরবাঈন, পৃ. ২৬০- ১৬২।

৪৮১. সূরা শুরার ২৩ নং আয়াত যেখানে মুমিনদের ওপর মহানবীর আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসাকে ফরয করা হয়েছে।- সম্পাদক

৪৮২. সূরা নিসার ৯৩ নং আয়াত যেখানে সাধারণ কোন নিরপরাধ মুমিনকে হত্যার শাস্তি আল্লাহর ক্রোধে পতিত হওয়া, তাঁর অভিশাপ বর্ষিত হওয়া এবং চিরন্তন মর্মন্তুদ শাস্তি বলা হয়েছে। সেখানে রাসূলের প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র যাঁকে আল্লাহ বেহেশতের যুবকদের নেতা মনোনীত করেছেন, তাঁকে হত্যার শাস্তি কী হতে পারে!- সম্পাদক

৪৮৩ যেমনটি ইবনে তাইমিয়া করেছে। সে ইমাম হোসাইনকে ফিতনা সৃষ্টিকারী অভিহিত করে তাঁর সমালোচনা করেছে। এর বিপরীতে ইয়াজিদের খেলাফতকে বৈধ বলেছে। (মিনহাজুস সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭- ২৫৭; ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫২২- ৫৩১)। অবশ্য তার থেকে এর বিপরীত কিছু আশা করা যায় না। কারণ সে হযরত ফাতিমাকেও আখেরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দানকারী হিসাবে তাঁর কর্ম মুনাফিকদের মত ছিল বলেছে। ইবনে তাইমিয়া হযরত ফাতিমাকে নিম্নোক্ত আয়াতের দৃষ্টান্ত বলেছে: তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে যারা সাদাকার (যাকাত বণ্টনে) ব্যাপারে তোমাকে দোষারোপ করে। অতঃপর যদি তা হতে তাদের কিছু দান করা হয়, তবে তারা সন্তুষ্ট হয় এবং যদি তা হতে তাদের কিছু না দেওয়া হয় তখন তারা ক্ষুব্ধ হয় (সূরা তওবা : ৫৮)। (মিনহাজুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৫- ২৪৬)- সম্পাদক

৪৮৪. শারহুন্নাবাবী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০৮।

৪৮৫. সীয়ারু আলামিন নুবালা, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮।

৪৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯।

৪৮৭. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ২২তম খণ্ড, পৃ. ৪০২ এবং ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৪।

৪৮৮. মাজমাউল বাহরাইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭; মুঈন, মোহাম্মাদ, ফারসি অভিধান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৮৫; মুফরাদাতে রাগেব, পৃ. ৮১।

৪৮৯. মুহাদ্দেছি, জাওয়াদ, দারস্হাঈ আজ যিয়ারতে আশুরা, পৃ. ১৪; আজিজি তেহরানি, আসগার; শারহে যিয়ারতে আশুরা পৃ. ৩৫।

৪৯০. ثارالله ফারহাঙ্গে আশুরা।

৪৯১. আল- মাহাসেন, বারকি, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১।

৪৯২. মাসনভী, পঞ্চম দফতর।

৪৯৩. বিহারুল আনওয়ার, ৭০তম খণ্ড , পৃষ্ঠা ৩৯।

৪৯৪. প্রাগুক্ত।

৪৯৫. উসূলে কাফি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৮।

৪৯৬. প্রাগুক্ত।

৪৯৭. যেদিন গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশিত হবে (সূরা আ’ লা : ৯)।

৪৯৮. বিহারুল আনওয়ার, ৭৩ তম খণ্ড, পৃ. ১৫৭।

৪৯৯. উসূলে কাফি, ২য় খণ্ড , কিতাবুদ দোয়া।

৫০০. উসূলে কাফি, ২য় খণ্ড, কিতাবুদ দোয়া, বাবুল বুকা।

৫০১. উসূলে কাফি, ২য় খণ্ড।

৫০২. বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড , পৃ. ১১৬।

৫০৩. আইয়ানুশ্ শিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৭।

৫০৪. ইমাম হোসাইন (আ.)- এর বাণী সমগ্র , পৃ. ৩২৮।

৫০৫. সহিফায়ে নূর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫।

৫০৬. আল আমালি, শেখ তুসি, পৃ. ৬৬।

৫০৭. যখন তিনি বলেন, ‘শাহাদাত আমার কাছে মধুর চেয়েও মিষ্টি।’

৫০৮ সূরা শোআরা:৩।

৫০৯. কামেলুয যিয়ারাত, ১৪তম অধ্যায়, পৃ. ১৪; তিরমিযি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৫৮, হাদীস ৩৭৭৫।

৫১০. মদীনা থেকে কারবালা পর্যন্ত ইমাম হোসাইনের বক্তৃতাসমগ্র, পৃ. ২১৯।

৫১১. মিজানুল হিকমাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৬, হাদীস নং ১০২৪৩।

৫১২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১০২৩৮।

৫১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭, হাদীস নং ১০২৩৫।

৫১৪. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১০২৩৪।

৫১৫. সূরা আনকাবুত, আয়াত নং ৪৫।

৫১৬. মিজানুল হিকমাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭১, হাদীস নং ১০২৫৪- ৫।

৫১৭. মিজানুল হিকমাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯, হাদীস নং ১০২৫৪।

৫১৮. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ৩৯২।

৫১৯. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ৩৯২।

৫২০. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ১১তম খণ্ড, পৃ. ১৯৭।

৫২১. বিহারুল আনওয়ার, ৪৫ তম খণ্ড, পৃ. ৮।

৫২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

৫২৩. সূরা মুজাদিলা, আয়াত নং ১৯।

৫২৪. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪ তম খণ্ড, ৩৫তম অধ্যায়।

৫২৫. কামিলুয যিয়ারত, ৭৯ পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৯৬।

৫২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২।

৫২৭. শেখ আব্বাস কুমি, মুনতাহাল আমাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১৩।

৫২৮. বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ১৪।

৫২৯. ফুরুগে শাহাদাত, পৃ. ২০৮।

৫৩০. প্রাগুক্ত।

৫৩১. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪ তম খণ্ড, পৃ. ৩৯৩।

৫৩২. আব্বাস কুম্মী, মুনতাহাল আমাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০৭; আশুরা অভিধান, পৃ. ২০১।

৫৩৩. ফুরুগে শাহাদাত, পৃ. ২০০।

৫৩৪. রেসালাতুল লুববুল আলবাব, আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হোসাইন তেহরানী, পৃ. ২৫।

৫৩৫ তারীখে তাবারী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭।

৫৩৬. বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ৩২।

৫৩৭. প্রাগুক্ত।

৫৩৮. ফুরুগে শাহাদাত, পৃ. ২১৪।

৫৩৯. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ.২৯১ ও আল- খাসায়িসুল হোসেইনিয়াহ, পৃ, ১৪২

৫৪০. বিহারুল আনওয়ার, ৫১তম খণ্ড, পৃ.১৫১

৫৪১. প্রাগুক্ত, ৭২তম খণ্ড, পৃ.৫৯ ।

৫৪২. প্রাগুক্ত, ৭৮তম খণ্ড, পৃ.৩০৯ ।

৫৪৩. উসূলে কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ.কিতাবুদ দুআ বাবুল বুকা ।

৫৪৪. মিজানুল হিকমাহ, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৫৩, হাদীস ১৮৩৬ ।

৫৪৫. সুনানুন্নাবী, পৃ.৬০ ।

৫৪৬. বিহারুল আনওয়ার, ৭৭তম খণ্ড, পৃ.১৫৫ ।

৫৪৭. প্রাগুক্ত, ১৬তম খণ্ড, পৃ.২৯৫ ।

৫৪৮. মিজানুল হিকমাহ, পৃ.৪৮২ ।

৫৪৯. ঐ, পৃ.৪৮৪ ।

৫৫০. বিহারুল আনওয়ার, ৬৯তম খণ্ড, পৃ.৪১১ ।

৫৫১. উসূলে কাফী, ২য় খণ্ড, কিতাবুদ দুআ বাবুল বুকা ।

৫৫২. প্রাগুক্ত ।

৫৫৩. মিজানুল হিকমাহ, ৫ম খণ্ড, পৃ.৪৮৪।

৫৫৪. বিহারুল আনওয়ার, ৮৩তম খণ্ড, পৃ.২৪৮ ।

৫৫৫. প্রাগুক্ত, ৭৮তম খণ্ড, পৃ.৩৩০ ।

৫৫৬. শারহে নাহজুল বালাগাস, ১৬তম খণ্ড, পৃ.২২ ।

৫৫৭. হোসাইন আমার থেকে, আমি হোসাইন থেকে ।- এ হাদীসটির প্রতি ইশারা করা হয়েছে । হাদীসটির সূত্রসমূহ:মুসান্নাফ, ইবনে আবি শাইবা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৩৮০(হাসাস হাদীস); আল- মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃ.১৯৪(সহীহ হাদীস); মাযমাউয যাওয়াইদ, হাইসামী, ৯ম খণ্ড, পৃ.১৮১; আসসাহিহ, ইবনে হিব্বান, ১৫তম খণ্ড, পৃ.৪২৭; আলবানী, সুনানুত তিরমিযি, হাদীস ৩৭৭৫(হাসান হাদীস); আলবানী, সিলসিলাতু আহাদিসিস সাহিহাহ (মুখতাছারাহ), ৩য় খণ্ড, পৃ.২২৯; তিরমিযি, আস সুনান, ৫ম খণ্ড, পৃ.৬৫৮; ইবনে হাম্বাল, মুসনাদে আহমাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.১৭২; বুখারী আদাবুল মুফরাদ, ১ম খণ্ড, পৃ.১৩৩; তাবারানী, মোযামুল কাবির, ৩য় খণ্ড, পৃ.৩৩; ইবনে মাযাহ, সুনান, ১ম খণ্ড, পৃ.৫১ ।- সম্পাদক

৫৫৮. ইসতিফতায়ে ইমাম খোমেইনী, ১ম খণ্ড এবং মাকাসেবে মুহাররামাহ্, মাসআলা ৭০; আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী, আজবেবাতুল ইসতিফতায়াত, মাসআলা ১৪৪০; আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজী, ইসতিফতায়াত, ১ম খণ্ড, মাসআলা ৫৭২ ও ৫৭৩; আয়াতুল্লাহ ফাজেল লানকারানী, জমেউল মাসায়েল, ১ম খণ্ড, মাসআলা ২১৬৬ ও ২১৭০; আয়াতুল্লাহ নূরী হামাদানী, ইসতিফতায়াত, ২য় খণ্ড, মাসআলা ৫৯৬; আয়াতুল্লাহ তাবরিযি, ইসতিফতায়াত, মাসআলা ২০০৩, ২০০৫ ও ২০১৪।

৫৫৯. আয়াতুল্লাহ সাফী, জামেউল আহকাম, ২য় খণ্ড, মাসআলা ১৫৯৯।

৫৬০. ইমাম খোমেইনী, ইসতিফতায়াত, ২য় খণ্ড, মাকাসেবে মুহাররামাহ্, পৃ. ৭২; আয়াতুল্লাহ জাওয়াদ তাবরিযি, ইসতিফতায়াত, মাসআলা ২০০৭; আয়াতুল্লাহ ফজেল লানকারানী, জামেউল মাসায়েল, ১ম

খণ্ড, মাসআলা ২১৭৪; আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজী, ইসতিফতায়াত, ১ম খণ্ড, মাসআলা ৫৭৯; আয়াতুল্লাহ সিসতানী, শায়ায়েরে দ্বীনি ওয়েব সাইট।

৫৬১. আজবেবাতুল ইসতিফতায়াত, প্রশ্ন নং ১৪৪৪।

৫৬২. আয়াতুল্লাহ নূরী হামাদানী ইসতিফতায়াত, ২য় খণ্ড, মাসআলা ৫৯৮, ৬০৪।

৫৬৩. আয়াতুল্লাহ সাফী গুলপাইগানী, জামেউল আহকাম, ২য় খণ্ড, মাসআলা ১৫৯৫।

৫৬৪. ইসতিফতায়ে ইমাম খোমেইনী, ২য় খণ্ড, মাকাসেবে মুহাররামাহ্, মাসআলা ৩০; আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী, আজবেবাতুল ইসতিফতায়াত, মাসআলা ১১৬৪; আয়াতুল্লাহ ফাজেল লানকারানী, জামেউল মাসায়েল, ১ম খণ্ড, মাসআলা ৯৯২; আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজী, ইসতিফতায়াত, ১ম খণ্ড, মাসআলা ৫২৪, ৫২৫; আয়াতুল্লাহ জাওয়াদ তাবরিযি, ইসতিফতায়াত, মাসআলা ১০৫৪, ১০৬৫, সিরাতুন নাজাত, ১ম খণ্ড, মাসআলা ১০০৫; দাফতারে আয়াতুল্লাহ সিসতানি, আয়াতুল্লাহ ওয়াহিদ খোরাসানী ও আয়াতুল্লাহ নূরী হামাদানী।

৫৬৫. আয়াতুল্লাহ সাফী গুলপাইগানী, জামেউল মাকারেম, ১ম খণ্ড, মাসআলা ১০০৩, ১০১৫, ১০১৮।

৫৬৬. আয়াতুল্লাহ খোমেইনী, ইসতিফতায়াত, ২য় খণ্ড, মাকাসেবে মুহাররামাহ, পৃ. ৪৫। আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী, আযবেবাতুল ইসতিফতায়াত, মাসআলা ১১৬১। আয়াতুল্লাহ ফাজেল লানকারানী, জামেউল মাসায়েল, ১ম মাসআলা খণ্ড, পৃ. ৯৮৮ এবং ২১৭৬।

৫৬৭. আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজী, ইসতিফতায়াত, ১ম খণ্ড, মাসআলা ৫১৬ এবং ৫২১। আয়াতুল্লাহ নূরী হামাদানী, ইসতিফতায়াত, ২য় খণ্ড, মাসআলা ৫৭১। আয়াতুল্লাহ জাওয়াদ তাবরিযি, ইসতিফতায়াত, মাসআলা ২০১৯। আয়াতুল্লাহ সিসতানী, sistan.org, মাসআলা ২৪। আয়াতুল্লাহ ওয়াহিদ খোরাসানীর দফতর।

৫৬৮. আয়াতুল্লাহ সাফী গুলপাইগানী, তাওজিহুল মাসায়েল, মাসআলা- ২৮৩৩ এবং আয়াতুল্লাহ বাহজাতের দফতর।

৫৬৯. আয়াতুল্লাহ খোমেইনী, ইসতিফতায়াত, ২য় খণ্ড, মাকাসেবে মুহাররামাহ, পৃ. ২৭ এবং ৩৬। আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী, আযবেবাতুল ইসতিফতায়াত, মাসআলা ১৪৪১। আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজী, ইসতিফতায়াত, ১ম খণ্ড, মাসআলা ৫১৬। আয়াতুল্লাহ নূরী হামাদানী, ইসতিফতায়াত, ২য় খণ্ড, মাসআলা ৫৯৬ ও ৬০৪ এবং ১ম খণ্ড, মাসআলা ৪৪৮। আয়াতুল্লাহ জাওয়াদ তাবরিযি, ইসতিফতায়াত, মাসআলা ২০০9 এবং সিরাতুন নাজাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, মাসআলা ৪৭৭। আয়াতুল্লাহ ফাজেল লানকারানী, জামেউল মাসায়েল, ১ম খণ্ড, মাসআলা ২১৭৪।

৫৭০. আয়াতুল্লাহ খোমেইনী, ইসতিফতায়াত, ৩য় খণ্ড, মাসআলা ৩৭। আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী, আযবেবাতুল ইসতিফতায়াত, মাসআলা ১৪৬১। আয়াতুল্লাহ ফাজেল লানকারানী, জামেউল আহকাম, ৩য় খণ্ড, মাসআলা ১২১৭।

৫৭১. আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজী, makaremshirazi.org কামাযানি।

৫৭২. আয়াতুল্লাহ নূরী হামাদানী, ইসতিফতায়াত, ২য় খণ্ড, মাসআলা ৫৯৭।

৫৭৩. আয়াতুল্লাহ জাওয়াদ তাবরিযি, ইসতিফতায়াত, মাসআলা ২০০৩, ২০১২, ২০১৪।

৫৭৪. আয়াতুল্লাহ সাফী গুলপাইগানীর দফতর।

৫৭৫. আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী, আজবেবাতুল ইসতিফতায়াত, মাসআলা ১৪৬১।

৫৭৬. আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী, আজবেবাতুল ইসতিফতায়াত, মাসআলা ১৪৬৩।

৫৭৭. আয়াতুল্লাহ খোমেইনী, ইসতিফতায়াত, ৩য় খণ্ড, প্রশ্ন ৩৪ ও ৩৭। আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী, আজবেবাতুল ইসতিফতায়াত, মাসআলা ১৪৪১। আয়াতুল্লাহ জাওয়াদ তাবরিযি, ইসতিফতায়াত, মাসআলা ২০০৩ ও ২০১২। আয়াতুল্লাহ ফাজেল লানকারানী, জামেউল মাসায়েল, ১ম খণ্ড, মাসআলা ২১৬২, ২১৬৬, ২১৭৩।

৫৭৮. আয়াতুল্লাহ সাফী গুলপাইগানী, জামেউল আহকাম, ২য় খণ্ড, মাসআলা ১৫৯৪।

৫৭৯. আয়াতুল্লাহ নূরী হামাদানী, ইসতিফতায়াত, ১ম খণ্ড, মাসআলা ১০৬৩।

৫৮০. আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজী, makaremshirazi.org ।

৫৮১. আয়াতুল্লাহ খোমেইনী, ইসতিফতায়াত, ৩য় খণ্ড, মাসআলা ৪৬। আয়াতুল্লাহ ফাজেল লানকারানী, জামেউল মাসায়েল, ১ম খণ্ড, মাসআলা ২১৬৩, ২১৬৫।

৫৮২. আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজী, ইসতিফতায়াত, ২য় খণ্ড, মাসআলা ৭৬৫।

৫৮৩. আয়াতুল্লাহ জাওয়াদ তাবরিযি, ইসতিফতায়াত, মাসআলা ২০০৩, tabrizi.org

৫৮৪. আয়াতুল্লাহ সাফী গুলপাইগানী, জামেউল আহকাম, ২য় খণ্ড, মাসআলা ১৫৯৭।

৫৮৫. আয়াতুল্লাহ বাহজাত, তাওযিহুল মাসায়েল, মাসআলা ১৫৯৭।

৫৮৬. ইসতিফতায়াত দাফতারে আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী।

৫৮৭. আয়াতুল্লাহ ফজেল লানকারানী, জামেউল মাসায়েল, ১ম খণ্ড, মাসআলা ২১৮২। আয়াতূল্লাহ সাফী গুলপাইগানী, জামেউল আহকাম, ২য় খণ্ড, মাসআলা ১৫৮১। আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী, আজবেবাতুল ইসতিফতায়াত, পৃ. ১১৪৫, আয়াতুল্লাহ নূরী হামাদানী, ইসতিফতায়াত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৫। আয়াতুল্লাহ

খোমেইনী, ইসতিফতায়াত, ৩য় খণ্ড, আহকামে নাযর, ৫৭৬৫৫। আয়াতুল্লাহ তাবরিজি, ইসতিফতায়াত, পৃ. ১০৫৮। আয়াতুল্লাহ ওয়াহিদ খোরাসানির দফতর, আয়াতুল্লাহ বাহজাত, আয়াতুল্লাহ সিসতানি।

৫৮৮. আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজী, ইসতিফতায়াত, ২য় খণ্ড, মাসআলা ৭৬৪৫ ও ১ম খণ্ড, মাসআলা ৭৮৫।

৫৮৯. আয়াতুল্লাহ ফজেল লানকারানী, জামেউল মাসায়েল, ১ম খণ্ড, মাসআলা ২১৭৬, ২১৭৭। আয়াতুল্লাহ নূরী হামাদানী, ইসতিফতায়াত, ২য় খণ্ড, মাসআলা ৫৯৯। মারজাদের দপ্তরসমূহ।

৫৯০. আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী, আজবেবাতুল ইসতিফতায়াত, মাসআলা ১৪৪৭ ও সকল মারজা।

৫৯১. ইমাম খোমেইনী, ইসতিফতায়াত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০ ও ২৬। আয়াতুল্লাহ বাহজাত, তাওযিহুল মাসায়েল, পৃ. ২১৩৫। আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজী, ইসতিফতায়াত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫৫। আয়াতুল্লাহ ফজেল লানকারানী, জমেউল মাসায়েল, ১ম খণ্ড, মাসআলা ৮৩২৬। আয়াতুল্লাহ নূরী হামাদানী, ইসতিফতায়াত, ২য় খণ্ড, মাসআলা ৭২৫। আয়াতুল্লাহ জাওয়াদ তাবরিজি, ইসতিফতায়াত, প্রশ্ন ১৭৩৪। দপ্তরে আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী, আয়াতুল্লাহ ওয়াহিদ খোরাসানী ও আয়াতুল্লাহ সাফী গুলপাইগানী।

সূচীপত্র: